বিদ্যাপতি-বিচার*

সতীশচন্দ্র রায়

(ভূমিকা)

বৈষ্ণব পদকর্তাদিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া যে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস সর্বত্র সমাদৃত, তাঁহাদের মধ্যে বিদ্যাপতি যখন মৈথিল-কবি বলিয়া নিশ্চিত প্রমাণিত হইয়া গিয়াছেন, তখন দুইজন সর্বশ্রেষ্ঠ পদকর্তার জন্মভূমি বলিয়া বঙ্গদেশের আর সে গৌরব করা সাজে না। বিদ্যাপতির শুধু জন্মভূমি হইলে বঙ্গদেশের যে গৌরব হইত, বিদ্যাপতির প্রধান আবিষ্কারক ও অনন্যসাধারণ রক্ষা-কারক বলিয়া বঙ্গদেশের উহা অপেক্ষা অনেক অধিক গৌরব ন্যায্য প্রাপ্য বটে। কথাটা একটু খুলিয়া বলা আবশ্যক। বর্তমান সময়ের আন্দাজ ৫৫০ বৎসর পূর্বে মিথিলার অন্তর্গত বিস্‌ফি নামক গ্রামে ব্রাহ্মণ বংশে বিদ্যাপতি ঠাকুরের জন্ম হয়। বিদ্যাপতি অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া ২৯৩ লক্ষ্মণ সংবত অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ১৪০০ সালে মিথিলার রাজা শিবসিংহের নিকট হইতে উক্ত বিস্‌ফী গ্রাম দান-প্রাপ্ত হন। ঐ দানপত্রে বিদ্যাপতিকে "নব-জয়দেব-মহারাজ-পণ্ডিত ঠাকুর" উপাধি দ্বারা অভিহিত করা হইয়াছে। বিদ্যাপতি ঠাকুর বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন; তন্মধ্যে সংস্কৃত ও 'অবহট্‌ঠ' (প্রাকৃত-জাত অপভ্রংশ ভাষাবিশেষ) মিশ্রিত 'কীর্ত্তিলতা', সংস্কৃত ভাষায়

---

* "বিদ্যাপতি-বিচার" প্রবন্ধটি শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশিত অধুনালুপ্ত 'সোনার গৌরাঙ্গ' নামক মাসিক পত্রিকাতে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। আমার পিতার মৃত্যুর ফলে তিনি ইহা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। অনুসন্ধিৎসু পাঠক কলিকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ হইতে প্রকাশিত 'পদকল্পতরু'র পঞ্চম খণ্ডে বিদ্যাপতির উপর তাঁহার লেখা অন্যান্য প্রবন্ধের সন্ধান পাইবেন।

'সাহিত্য পত্রিকা'র সুযোগ্য সম্পাদক মুহম্মদ আবদুল হাই সাহেবের উৎসাহের ফলে "বিদ্যাপতি-বিচার" প্রবন্ধটি একসঙ্গে প্রকাশিত হইল। বাঙ্গালা সাহিত্যের পাঠক মাত্রেই এজন্য অধ্যাপক হাই সাহেবের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবেন। —শ্রী ভবানীচরণ রায়, ইংরেজী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ইং ১.৭.৬০।

'পুরুষ-পরীক্ষা', 'লিখনাবলী', 'শৈবসর্ব্বস্ব-সার', 'গঙ্গাবাক্যাবলী', 'বিভাগসার' 'গয়াপতন' ও 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী' নামক গ্রন্থগুলিই প্রসিদ্ধ বটে। ইহা ব্যতীত তিনি মৈথিল ভাষায় যে কত পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন, তাহা বলা অসাধ্য। প্রকৃত কথা এই যে তিনি তাঁহার পূর্বোক্ত গ্রন্থের জন্যেই মিথিলায় পূর্বাবধি সমাদৃত হইয়া আসিয়াছেন। যে পদাবলীর জন্য পরবর্তী সময়ে তিনি বঙ্গদেশে অমর ও শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন দুঃখ ও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সেই পদাবলী তাঁহার স্বদেশে বিগত পাঁচশত বৎসর পর্যন্ত এক প্রকার অজ্ঞাত ও অনাদৃত অবস্থায় দুই চারি খানা প্রাচীন হস্তলিখিত পুথির মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। গত ১৮৮১ ইংরেজী সালে মনীষী গ্রিয়ারসন সাহেব মহোদয় দারভাঙ্গার মধুবাণী মহকুমার এস, ডি, ও, থাকা কালে সেই প্রদেশের ভিক্ষুকদিগের মুখে বিদ্যাপতির কতক পদ গীত হইতে শুনিয়া তিনি ঐরূপ মাত্র ৮২টী পদ সংগ্রহ করিয়া, ভূমিকা, টীকা, শব্দ-কোষ ও ইংরেজী অনুবাদ সহ উহা কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকার একটা অতিরিক্ত সংখ্যায় Maithili Chrestomathy নামে সর্বপ্রথমে মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন এবং সত্য কথা বলিতে হইলে তখন হইতেই বিদ্যাপতির পদাবলীর উপর তাঁহার স্বদেশবাসীদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এদিকে কিন্তু বঙ্গদেশে অন্ততঃ সাড়ে চারিশত বৎসর যাবৎ বিদ্যাপতির পদাবলী বঙ্গীয় বৈষ্ণব-সমাজে পরমাদরে সর্বত্র গীত এবং বিদ্যাপতি ঠিক চণ্ডীদাসের মতই অন্যতর শ্রেষ্ঠ পদকর্তা বলিয়া পূজিত হইয়া আসিতেছেন। বাঙ্গালার পদাবলী-সাহিত্যে বিদ্যাপতি ও তাঁহার বৈষ্ণব-পদাবলী এতই সুপরিচিত যে, উহার বিশেষ ও বিস্তৃত পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করা যে কেবল অনাবশ্যক, তাহা নহে; আমাদিগের বিবেচনায় উহা দ্বারা বৈষ্ণব পাঠক সম্প্রদায়ের অজ্ঞতার ইঙ্গিত করিয়া তাঁহাদিগের প্রতি অবমাননাও প্রদর্শিত করা হয়। অতএব আমরা এখানে বঙ্গীয় বৈষ্ণব-সমাজে বিদ্যাপতির পদাবলীর অসাধারণ প্রসিদ্ধি ও প্রসারের বিস্তৃত আলোচনা করিব না, তবে বিদ্যাপতির পদাবলী যে কিরূপ সুদীর্ঘকাল হইতে বঙ্গদেশে বঙ্গবাসীরই যত্ন ও চেষ্টায় প্রচারিত হইয়াছে, এখানে সে সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিব। শ্রীমহাপ্রভুর আন্দাজ এক শতক পূর্বেই বিদ্যাপতি তাঁহার সমসাময়িক বঙ্গীয় কবি চণ্ডীদাসের নিকট রস-তত্ত্বজ্ঞ প্রসিদ্ধ কবি বলিয়া সুপরিচিত হইয়াছিলেন; "চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি দুহুঁজন পিরিতি" ইত্যাদি 'পদকল্পতরু'র ৪র্থ শাখার ২৬ পল্লবের ভণিতা-হীন একটী সুপ্রাচীন পদে উল্লিখিত আছে —

দুহু গুণ শুনি চিত দুহুঁ উতকণ্ঠিত
দুহুঁ দোহাঁ দরশন লাগি।
দোহাঁর রসিকপন শুনি শুনি দুহুঁ-জন
দুহুঁ-হিয়ে দুহুঁ রহু জাগি॥
নিজ নিজ গীত লেখি বহু ভেজল
তাহে আতি আরতি ভেল।
রাধা-কানুক প্রেম রস-কৌতুক
তাহে মগন ভৈ গেল॥
ইত্যাদি।

ইহারই পরবর্তী "চণ্ডীদাস শুনি বিদ্যাপতি-গুণ, দরশনে ভেল অনুরাগ" এবং "সময় বসন্ত যাম দিন মাঝহি" ইত্যাদি পদে পরস্পর সম্মিলনোৎসুক বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস মহাকবি-দ্বয়ের গন্তব্য পথের মধ্যবর্তী কোনও স্থলে বসন্ত-কালে মধ্যাহ্ন বেলায় বটবৃক্ষ-তলে মিলন সংঘটিত হইয়াছিল, এরূপ বর্ণিত হইয়াছে। "সময় বসন্ত" ইত্যাদি পদের ভণিতা আছে —

পুছত চণ্ডীদাস কবিরঞ্জনে
শুনতহি রূপনারাণ।
কহ বিদ্যাপতি ইহ রস-কারণ
লছিমা-পদ করি ধ্যান॥

যদিও বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের 'বিদ্যাপতির পদাবলী'র সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় উদ্ধৃত পদের বর্ণিত চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির সম্মিলনকে অমূলক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, কিন্তু অনেক প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ বৈষ্ণব কিংবদন্তীমূলক এই ঘটনাটী অলীক বলিয়া মনে করেন না। যাহা হউক শ্রীমহাপ্রভুর অপেক্ষা অনেক বয়োবৃদ্ধ শ্রীমৎ অদ্বৈত প্রভুর সম্বন্ধেও কথিত আছে যে, তিনি একবার তীর্থ গমন-প্রসঙ্গে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করার সময়ে বিদ্যাপতির অসাধারণ প্রসিদ্ধিহেতু বিদ্যাপতির বাসস্থলী মিথিলার বিসফী গ্রামে যাইয়া বৃদ্ধ কবির দর্শন লাভ করেন এবং তাঁহার কতকগুলি পদও সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসেন। বিদ্যাপতি যে শতাধিক বৎসর জীবিত ছিলেন, তাহা পরবর্তী গবেষণাদ্বারা নিশ্চিতরূপেই জানা গিয়াছে; সুতরাং শ্রীমৎ অদ্বৈত আচার্যের আন্দাজ ২০।২৫ বৎসর বয়সের সময় এই ঘটনা হইয়াছিল, এরূপ মনে করিলে ইহাও কোনরূপেই অসম্ভব বোধ হয় না।

'বিদ্যাপতির পদাবলী'র সম্পাদক নগেন্দ্রবাবু তাঁহার সংস্করণে তাঁহার মতে খুব প্রাচীন ও প্রামাণিক মিথিলার তালপত্রের পুথি হইতে যে সকল পদ সংগ্রহ করিয়াছেন, উহার মধ্যে বহুসংখ্যক উৎকৃষ্ট পদই দৃষ্ট হয় না ; সেগুলি কেবল 'পদামৃতসমুদ্র', 'পদকল্পতরু' ও 'কীর্তনানন্দ' প্রভৃতি বঙ্গদেশের প্রাচীন পদ-সংগ্রহেই পাওয়া যায় ; সুতরাং সেই সকল পদ বহুকাল পূর্বেই মিথিলা হইতে সংগৃহীত হইয়া বাঙ্গালায় সযত্নে রক্ষিত হওয়ায় নষ্ট হইতে পারে নাই ; কিন্তু মিথিলায় সেরূপ না হওয়ায়, সেখানে বিদ্যাপতির উক্ত উৎকৃষ্ট পদগুলি অযত্ন ও অনাদরে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এরূপ অনুমান অপরিহার্য বটে। বস্তুতঃ শ্রীমহাপ্রভুর পূর্ববর্তী কাল হইতেই যে বিদ্যাপতির পদাবলী বঙ্গে সুপ্রচারিত হইয়াছিল, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই ; কেননা, 'চরিতামৃত'-গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে, শ্রীমহাপ্রভু নীলাচলে অবস্থান-কালে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদাবলী, রামানন্দ রায়ের নাটক, 'কর্ণামৃত' ও 'গীতগোবিন্দে'র দিবারাত্র অনুশীলন করিতেন। মহাকবি গোবিন্দ কবিরাজের সময়ে অর্থাৎ আন্দাজ তিনশত বৎসর পূর্বে যে বিদ্যাপতির পদাবলীর বঙ্গদেশে অসাধারণ সমাদর হইয়াছিল, উহার প্রমাণস্থলে কেবল ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, মহাকবি গোবিন্দদাস এরূপ প্রৌঢ় বয়সেই বৈষ্ণব-ধর্মে দীক্ষিত ও ব্রজ-লীলার পদাবলী-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া বঙ্গদেশের প্রচলিত ভাষায় পদ-রচনা না করিয়া বিদ্যাপতির মৈথিল ভাষার অনুকরণে "ব্রজ-বুলি" নামক কল্পিত ভাষায় বহু-পরিমাণে বিদ্যাপতিরই পদের ভাষা ও ভাবের অনুসরণ করিয়া পদ-রচনা করিয়াছেন। তাঁহার প্রায় সমসাময়িক অপর শ্রেষ্ঠ পদকর্তা জ্ঞানদাস, রায় শেখর প্রভৃতি বাঙ্গালা ভাষায় অনেক পদ রচনা করিয়া থাকিলেও এই ব্রজবুলির অপূর্ব প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই ; ফলতঃ তাঁহারাও গোবিন্দদাসের মতই বিদ্যাপতির ভাষা ও ভাবের অনুকরণে ব্রজবুলি পদ-রচনায় অসাধারণ কৃতিত্বই প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। আন্দাজ ২৫০ বৎসরের প্রাচীন পদসংগ্রহ 'ক্ষণদা গীত-চিন্তামণি' ও প্রায় দুই শত বৎসরের প্রাচীন 'পদামৃতসমুদ্র' ও প্রায় পৌনে দুইশত বৎসরের প্রাচীন 'পদকল্পতরু' গ্রন্থে যে বিদ্যাপতির কত উৎকৃষ্ট পদাবলী সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহা পদাবলীর পাঠক-বর্গের অজ্ঞাত নহে ; সুতরাং এ অবস্থায়ও যদি বঙ্গবাসীরা বিদ্যাপতির পদাবলীর প্রথম ও প্রধান আবিষ্কারক এবং সংরক্ষক বলিয়া গৌরব না করিবেন, তাহা হইলে সেই গৌরব আর কাহার প্রাপ্য হইতে পারে ? তবে অনেকদিন হইতেই আমাদের একটা

অপবাদ রটিয়াছে যে, আমরা বিদ্যাপতির পদগুলিকে রক্ষা করিতে যাইয়া আমাদিগের অজ্ঞতা ও অসতর্কতার জন্য আমরা সেগুলিকে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছি। বিদ্যাপতির পদের ভাষা প্রায় পাঁচশত বৎসরের প্রাচীন মৈথিল বটে। মনীষী গ্রিয়ারসন মহোদয়ের পূর্বে আর কেহই মৈথিল ভাষার ব্যাকরণ কিংবা অভিধান সঙ্কলনের যত্ন চেষ্টা করেন নাই। স্বাভাবিক কারণবশতঃ বিদ্যাপতির পদের প্রাচীন ভাষার সহিত বর্তমানকালের মৈথিল ভাষার অনেক পার্থক্য ঘটায়, বর্তমান সময়ের মৈথিল পণ্ডিতেরাও বিদ্যাপতির অনেক পদের অনেক শব্দ ও উহার অর্থ সম্বন্ধে সন্দিহান না হইয়া পারেন নাই। গ্রিয়ারসন সাহেবের পূর্বোক্ত গ্রন্থ-প্রণয়নে সাহায্যকারী মৈথিল-পণ্ডিতগণ যে বিদ্যাপতির পদের ছন্দ ও অর্থ-নির্ণয়ে অনেক স্থলেই আশ্চর্যরকম ভুল করিয়াছেন এবং গ্রিয়ারসন মহোদয় ভারতীয় ভাষাতত্ত্বে তাঁহার নিজের বহু দিনের পরিশ্রমে অর্জিত জ্ঞানের সাহায্যে মৈথিল পণ্ডিতদিগের কতকগুলি ভ্রম-সংশোধনে সমর্থ হইয়াছেন, ইহা তাঁহার উক্ত গ্রন্থে স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে।

গ্রিয়ারসন সাহেবের সংগ্রহে বিদ্যাপতির মাত্র ৮২টী পদ আছে; উহাতেও যখন ভারতীয় ভাষাতত্ত্বে অসাধারণ অভিজ্ঞ গ্রিয়ারসন সাহেবের জ্ঞাত কিম্বা অজ্ঞাতসারে বহু ভ্রম-প্রমাদ রহিয়া গিয়াছে, তখন অশিক্ষিত কীর্তন-গায়ক ও প্রাচীন পুথির লেখকদিগের অজ্ঞতা ও অসতর্কতার জন্য যে বঙ্গদেশে প্রচলিত বিদ্যাপতির পদাবলীতে অনেক বিকৃতি ও অশুদ্ধি প্রবেশ না করিয়াই পারে না, ইহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। কিন্তু আনন্দ ও সৌভাগ্যের বিষয় এই যে আমাদের দেশের প্রাচীন পুথির অধিকাংশ লেখকই আধুনিক প্রাচীন পুথির সম্পাদকদিগের ন্যায় সংশোধনের উদ্দেশ্যে প্রাচীন পুথির দুর্বোধ্য বা অবোধ্য পাঠের পরিবর্জন ও পরিবর্তন করিয়া স্বীয় বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হন নাই। তাঁহাদিগের লিপিকার্যের সনাতন রীতিই ছিল—"যৎ দৃষ্টং তৎ লিখিতং"; এরূপ লিপিকারগণকে "মাছি মারা কেরানী" বলিয়া সুপণ্ডিত ব্যক্তিরা যতই বিদ্রূপ করুন না কেন, ইহারা নিজেদের জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে প্রাচীন পুথির পাঠের বিন্দু বিসর্গেরও ব্যতিক্রম না করিয়া, যেমনটা দেখিয়াছেন, ঠিক তেমনটাই লিখার জন্য চেষ্টা করায় প্রাচীন পুথির পাঠ বিশুদ্ধি যে অনেক স্থলেই আশাতীতরূপে রক্ষিত হইয়াছে ইহা আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি। যাহা হউক, যখন হইতে প্রাচীন পুথির

মুদ্রাঙ্কন ও আধুনিক ধরণের সটীক সংস্করণ হওয়া আরম্ভ হইল তখন হইতেই কতকগুলি সুবিধার সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি গুরুতর অসুবিধারও সূত্রপাত হইল। সে সকল অসুবিধা যে কি, বিদ্যাপতির পদাবলীর পাঠ ও অর্থের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়া আমাদিগকে পদে পদেই উহার আলোচনা করিতে হইবে।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে বিদ্যাপতির প্রধান আবিষ্কারক ও সংরক্ষক বলিয়া গৌরব করিতে গেলে সে গৌরব বঙ্গবাসীর প্রাপ্য; এখন আবার বলিব যে বিদ্যাপতির পদাবলীর শ্রেষ্ঠ সংস্করণ-কার বলিয়া গৌরব করাও শুধু বাঙ্গালীদেরই সাজে। বাঙ্গালায় বিগত পঞ্চাশ বৎসর কালের মধ্যে বিদ্যাপতির পদের কৃতিত্ব, পাঠ ও অর্থ-নির্ণয়ের জন্য বহু সংখ্যক সুপণ্ডিত ব্যক্তি যেরূপ অসাধারণ পরিশ্রম ও চেষ্টা করিয়াছেন, এবং উহার ফলে বিদ্যাপতির পদাবলীর যতগুলি উল্লেখযোগ্য সংস্করণ বঙ্গদেশে প্রকাশিত হইয়াছে, উহার তুলনায় প্রতীচ্য পণ্ডিত গ্রিয়ারসন মহোদয়ের কথা বাদ দিলে, মিথিলায় এ পর্যন্ত এজন্য শতাংশের এক অংশ চেষ্টাও করা হইয়াছে কিনা, সন্দেহের বিষয় বটে।

যখন গত ১৮৮১ সালে গ্রিয়ারসন মহোদয় কর্তৃক পূর্বোক্ত Maithili Chrestomathy গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, উহারই প্রায় সমকালে বঙ্গদেশে স্বর্গগত জগবন্ধু ভদ্র মহাশয় কর্তৃক 'মহাজন পদাবলী' নাম দিয়া সর্বপ্রথমে বিদ্যাপতির পদাবলী বিস্তৃত ভূমিকা, সংক্ষিপ্ত পাদ-টীকা, পাঠান্তর ও শব্দকোষসহ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। জগবন্ধুবাবু শেষ জীবনে 'গৌরপদ-তরঙ্গিণী' গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া ও অন্যতম সুপণ্ডিত রসজ্ঞ বৈষ্ণব বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিলেও এই 'মহাজন পদাবলীই' তাঁহার সর্বপ্রধান অবিনশ্বর কীর্তিস্তম্ভ। জগবন্ধুবাবু তখন গ্রিয়ারসনের উক্ত গ্রন্থ হইতে কোনও সাহায্য পান নাই। রাজকীয় ইংরেজী স্কুলের শিক্ষকতার কার্য করিয়া তাঁহার যে অধিককাল ধরিয়া বিদ্যাপতি বা অন্যান্য বৈষ্ণব কবিদিগের পদাবলীর অনুসরণ করার তেমন সুবিধা ঘটিয়াছিল এমনটাও জানা যায় নাই; সর্বোপরি এখন যেমন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে বহু চেষ্টায় নানা স্থান হইতে বহু সংখ্যক প্রাচীন পুথি সংগৃহীত হওয়ায়, উহাদের পূর্ব প্রকাশিত সংস্করণগুলির সাহায্যে বিশেষ জিজ্ঞাসু গবেষক ব্যক্তিদিগের পক্ষে প্রাচীন পদাবলীর সম্বন্ধে গবেষণা করার অনেক সুযোগ ঘটিয়াছে, তখন সে সকল সুবিধা ও বিশেষ কিছু ছিল না; এ অবস্থায়ও যে নিজের অদ্ভুত উদ্যম ও অনুসন্ধান এবং বৈষ্ণব সাহিত্যে

অভিজ্ঞ কতিপয় বন্ধু ব্যক্তির উদার সাহায্যের ফলে জগবন্ধুবাবু এরূপ একটা মহৎ কার্য্যের সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার সংস্করণের শত ত্রুটি ও ভ্রম প্রমাদ থাকা সত্ত্বেও ইহা তাঁহার পক্ষে অল্প প্রশংসার বিষয় নহে। প্রায় এই সময়েই স্বর্গগত প্রসিদ্ধ লেখক সাহিত্যাচার্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় 'প্রাচীন কাব্য-সংগ্রহ' নাম দিয়া বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও গোবিন্দদাসের পদাবলী প্রকাশিত করেন। সরকার মহাশয়ও সংক্ষিপ্ত পাদটীকার সংযোজন ব্যতীত বিদ্যাপতির পদাবলীর রীতিমত ব্যাখ্যা করার প্রয়াস করেন নাই; পাঠ ও পাঠের অর্থ সম্বন্ধেও তিনি অধিকাংশ স্থলেই মহাজন পদাবলীর অনুসরণ অথবা জগবন্ধুবাবু অক্ষয়বাবুর অনুসরণ করিয়াছেন। জগবন্ধুবাবু ও অক্ষয় বাবুর প্রকাশিত প্রথম সংস্করণগুলি এখন আমাদের হাতে না থাকায় আমরা তাঁহাদের পৌর্বাপর্য স্থির করিতে পারিলাম না; ভরসা করি বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস লেখক উভয়ের মধ্যে কে কাহার নিকট কি পরিমাণ ঋণী, এই জ্ঞাতব্য তত্ত্বটার নির্ণয় করিয়া পাঠকবর্গের কৌতূহলের পরিতৃপ্তি করিবেন। অতঃপর কলিকাতা হাইকোর্টের তদানীন্তন সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী ও পরবর্তীকালের অন্যতম বিচারপতি স্বর্গগত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের সংস্করণ প্রকাশিত হয়। মিত্র মহাশয়ের প্রশংসনীয় গবেষণার ফলে ঐ সংস্করণে বিদ্যাপতির জীবন বৃত্তান্ত সম্বন্ধে একটা সংক্ষিপ্ত কিন্তু সারগর্ভ ভূমিকা সংযোজিত হইয়াছিল। পদ-পাঠ ও পাদটীকা সম্বন্ধে তিনি প্রায় সর্বত্র অক্ষয়বাবুরই মতানুসরণ এবং ভূমিকায় উহা স্পষ্ট স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ইহার কিছুদিন পরেই 'হিতবাদী' পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক ও প্রসিদ্ধ লেখক স্বর্গগত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয়ের ভূমিকা, পাঠান্তর ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা সম্বলিত সংস্করণটী প্রকাশিত হয়। কাব্যবিশারদ বিদ্যাপতির পদের প্রকৃত পাঠ ও অর্থ নির্ণয়ের জন্যে তাঁহার পূর্ববর্তী বঙ্গীয় সম্পাদকদিগের অপেক্ষা অধিক যত্ন ও চেষ্টা করেন এবং উহারই সুফলে তিনি পূর্ব সংস্করণগুলির অনেক ভ্রম প্রমাদ দেখাইতেও সমর্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু উহা সত্ত্বেও তাঁহার সংস্করণে পাঠ ও অর্থ নির্ণয়ে প্রায় শতাবধি ভুল রহিয়া গিয়াছে।

তিনি পূর্ববর্তী সম্পাদকদিগের প্রশংসনীয় গবেষণার সুফলগুলি অনায়াসে নিজে প্রাপ্ত হইয়াও তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ দূরে থাকুক, অনেক স্থলেই তাঁহাদিগের ভ্রম প্রমাদগুলির উপলক্ষে তাঁহাদিগের প্রতি যেরূপ অসংযত

বিদ্রূপপূর্ণ তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা নিশ্চিতই তাঁহার প্রাপ্য ন্যায্য যশের খর্বতা বিধান করিবে। কাব্যবিশারদ মহাশয়ের সংস্করণের কিঞ্চিৎ পূর্বে বা পরে কলিকাতার বঙ্গবাসী যন্ত্র হইতে ভাটপাড়ার সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের সংস্করণটী প্রকাশিত হয়। তর্করত্ন মহাশয় দর্শন স্মৃতি প্রভৃতি নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়াও যে কাব্যশাস্ত্রে অসাধারণ পারদর্শী এ সংবাদটা বোধ হয় অনেকেই রাখেন না। যাঁহারা তাঁহার রচিত উৎকৃষ্ট শ্লেষপূর্ণ সংস্কৃত শ্লোকাবলী এবং তাঁহার কৃত 'রত্নাবলী' নাটিকার উৎকৃষ্ট বঙ্গানুবাদ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট তর্করত্ন মহাশয়ের কাব্য-রসজ্ঞতার অন্য পরিচয় দিতে হইবে না। কাব্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রে কৃতবিদ্য তর্করত্ন মহাশয় যে বিদ্যাপতির পদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া বিদ্যাপতির কবিতার অলঙ্কারাদি বিলক্ষণ পাণ্ডিত্য ও রসজ্ঞতার সহিত প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, ইহা বলাই বাহুল্য। তথাপি আমরা সত্যের অনুরোধে বলিতে বাধ্য যে, তর্করত্ন মহাশয়ের বিদ্যাপতির প্রতি অসাধারণ শ্রদ্ধা ও পক্ষপাত থাকিলেও তিনি এভাবে একার্যে হস্তক্ষেপ না করিলেই ভাল করিতেন। কেননা, বিদ্যাপতির পদাবলীর একটা প্রামাণিক সংস্করণ করিতে হইলে, সেখানে কেবল সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্যে অধিকারই যথেষ্ট নহে; উহার সঙ্গে সঙ্গে মৈথিল, হিন্দী প্রভৃতি ভাষায়ও বিশেষ জ্ঞান এবং বঙ্গীয় ও মৈথিল প্রাচীন হস্তলিখিত পদাবলীর পুথির বিশেষ অনুশীলনের আবশ্যক; দুঃখের বিষয়, তর্করত্ন মহাশয় তাঁহার সংস্করণে এ সকল নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ে অভিজ্ঞতার কোনও পরিচয় দিতে পারেন নাই; তিনি উৎকট কল্পনার সাহায্যে অনেক সোজা হিন্দী ও মৈথিল শব্দের পাণ্ডিত্য-সূচক অর্থ করিতে যাইয়া অকৃতকার্যই হইয়াছেন। যাহা হউক, তথাপি আমরা তর্করত্ন মহাশয়ের এই সাধু উদ্দেশ্য ও সৎ দৃষ্টান্তের জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি এবং আশা করি যে আমাদের দেশের অন্যান্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণও তাঁহার এই সদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণে প্রাচীন ভাষা কাব্যের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়া এ ক্ষেত্রেও তাঁহাদিগের পাণ্ডিত্যের অনুরূপ কৃতিত্বের পরিচয় দিবেন।

সকলের শেষ ও সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপতির সংস্করণ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের সম্পাদকতায় বাঙ্গালা ১৩১৬ সালে প্রকাশিত হইয়াছে। নগেন্দ্রবাবুর এই সংস্করণে

মিথিলার প্রাচীন তালপত্রের ও নেপাল রাজদরবারের পুথি হইতে বহু সংখ্যক প্রকাশিত পদ সংগৃহীত হইয়াছে। তিনি বঙ্গীয় প্রাচীন পুথি হইতে ও বিদ্যাপতির অনেক পদ গ্রহণ করিয়াছেন। কাব্যবিশারদের সংস্করণের পদ সংখ্যা ১৯৯টীর স্থলে নগেন্দ্রবাবুর সংস্করণে মোটে ৯৬৫টী পদ আছে। যদিও ইহার মধ্যে প্রায় শতাধিক পদ বিদ্যাপতির নহে, নগেন্দ্র বাবু ভ্রম বশতঃ তাঁহার সংস্করণে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তথাপি সংস্করণটী যে সমৃদ্ধ তাহা স্বীকার করিতে হইবে। ইহার উপর আবার নগেন্দ্রবাবু বিশেষ পাণ্ডিত্য ও গবেষণাপূর্ণ বিস্তৃত ভূমিকা, অকারাদিক্রমে পদ-সূচী, পাঠান্তর ও বিস্তৃত টীকা সংযোজিত করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন শ্রেষ্ঠ মৈথিল পণ্ডিত কবীশ্বর চণ্ডা ঝা মহাশয়ের অধিকাংশ ভ্রম-প্রমাদগুলিরই সংশোধন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তিনি তাঁহার গ্রন্থের প্রারম্ভেই বিজ্ঞাপনে জানাইয়াছেন—"কবীশ্বর চণ্ডা ঝা (চন্দ্র কবি) বিদ্যাপতির পদাবলী সম্বন্ধে অদ্বিতীয় তত্ত্ববিৎ এবং অর্থ-পারদর্শী, ও মিথিলা ভাষায় সুকবি ছিলেন। যখন আমি পদাবলীর সম্পাদন আরম্ভ করি তখন তাঁহার বয়স ৭৫ বৎসর, তথাপি তিনি অসীম উৎসাহের সহিত এই কার্যে যোগদান করেন। পদাবলী সংগ্রহ করা, কঠিন শব্দাদির অর্থ প্রভৃতি সকলই তিনি করেন। বিদ্যাপতির ভাষায় তিনি আমার শিক্ষাগুরু।" এরূপ অবস্থায় নগেন্দ্রবাবুর সংস্করণটী যে পূর্ববর্তী সংস্করণগুলি হইতে অনেক পূর্ণাঙ্গ ও উৎকৃষ্ট তাহা সহজেই অনুমেয় বটে। কিন্তু বিদ্যাপতির প্রাচীন মৈথিল ভাষার উপর আধুনিক শ্রেষ্ঠ মৈথিল পণ্ডিতেরও প্রভুত্ব খাটেনা বলিয়াই হউক, কিংবা ভাগের কাজ সুসম্পন্ন হওয়ার সম্বন্ধে কতকগুলি স্বাভাবিক অন্তরায় থাকার জন্যেই হউক স্বর্গীয় চণ্ডা ঝা মহাশয়ের এরূপ সাহায্যলাভ সত্ত্বেও এই সুবৃহৎ ও উৎকৃষ্ট সংস্করণখানায়ও এত অধিক ভ্রম প্রমাদ রহিয়া গিয়াছে যে, বিদ্যাপতির আর একখানা প্রামাণিক সংস্করণের নিতান্ত প্রয়োজন বোধ হইতেছে। সেইরূপ সংস্করণ প্রকাশিত করার উপযুক্ত বিদ্যা, বুদ্ধি ও গবেষণা বর্তমানে কাহারও আছে কিনা সন্দেহ। যে দেশে এরূপ একটী সুবৃহৎ আকারের প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠার বহির প্রকৃত মূল্যে ঐ বহিখানি বিক্রয় করিয়াও নিঃশেষ করিতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রায় ১৬ বৎসর কাল গত হইয়াছে; এবং যেখানে উক্ত পরিষৎ অর্থাভাবে মুদ্রিত পুস্তকের পুনর্মুদ্রাঙ্কন তো দূরের কথা, বহুদিন ধরিয়া

প্রারব্ধ নূতন গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কনই শেষ করিতে পারিতেছেন না, সেখানে অন্য প্রকারে সামর্থ্য থাকিলেও কেবল অর্থভাবেই এরূপ ব্যয়সাধ্য কার্যে কেহ অগ্রসর হইবেন, এরূপ বোধ হয় না। আমরা বিদ্যাপতির পদাবলীর একজন বিশেষজ্ঞ বলিয়া দাবী করি না। চণ্ডা ঝা ও গ্রিয়ারসনের মত বিশেষজ্ঞ এবং নগেন্দ্রবাবুর মত পণ্ডিত ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিও যখন এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ কৃতকার্য হইতে পারেন নাই, তখন আরও গবেষণা এবং আরও অনুশীলন ব্যতীত এখন আবার বিদ্যাপতির আর একটা নূতন সংস্করণ করার প্রয়াস আমরা বাতুলতা বলিয়াই মনে করি। তথাপি প্রায় চল্লিশ বৎসর কাল যাবত অন্যান্য বৈষ্ণব কবির পদাবলীর সহিত আমরা সযত্নে বিদ্যাপতির পদাবলী অনুশীলন করিয়া আসিতেছি বলিয়া, আমরা পুনঃ পুনঃ আলোচনার ফলে নগেন্দ্রবাবুর পাণ্ডিত্যপূর্ণ সংস্করণটীতে যে সকল ত্রুটী ও ভ্রম-প্রমাদ লক্ষ্য করিয়াছি, বিদ্যাপতির পদাবলীর পাঠকদিগের হিতার্থে উহা প্রকাশ করিলে, আমাদিগের মন্তব্য যদি প্রকৃত হয়, তাহা পাঠকবর্গের উপকারে আসিবে, আর যদি আমাদিগের মন্তব্য ভ্রমাত্মক হয়, তাহা হইলে সেই ভ্রম হইতেও ভবিষ্যত-সমালোচক সতর্কতা শিক্ষা করিবেন, এই উদ্দেশ্যেই আমরা বিশেষ কুণ্ঠিতচিত্তে অন্যের ত্রুটী ও ভ্রমের আলোচনারূপ অপ্রীতিকর কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। নগেন্দ্রবাবুর সংস্করণ সুবৃহৎ ও সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়াই আমরা তাঁহার সংস্করণ অবলম্বনেই বিদ্যাপতির আলোচনা করিব।

নগেন্দ্রবাবুর সংস্করণেরই প্রায় সমকালে বিহারের অন্তর্গত আরা জেলার নাগরী প্রচারিণী সভা দ্বারা আরানিবাসী বাবু ব্রজনন্দন সহায় (ব্রজবল্লভ) কর্তৃক সম্পাদিত 'মৈথিল কোকিল বিদ্যাপতি' নামক একখানা নাগরী সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই সংস্করণের অধিকাংশ পদই বঙ্গীয় সংস্করণগুলি হইতে গৃহীত হইয়া থাকিলেও সম্পাদক মহাশয় বিদ্যাপতির পাঠ ও অর্থ নির্ণয়ে বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন; সুতরাং প্রয়োজনীয় স্থলে আমরা এই নাগরী সংস্করণ ও বহু স্থলেই গ্রিয়ারসন মহোদয়ের পূর্বোক্ত "Maithili Chrestomathy" নামক গ্রন্থের লিখিত পাঠ ও অর্থের উল্লেখ ও আলোচনা করিতে বাধ্য হইব।

পরিশেষে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রবাবুর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও পূর্ববর্তী সম্পাদক দিগের প্রতি তিনি যে কোন তীব্র ও অসংগত মন্তব্য না করিয়া, সমীচীনতার পরিচয় দিয়াছেন, সেজন্য তাঁহার প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া আমরা তাঁহার সংস্করণের নানা গুণের সম্বন্ধে কোন কথা না বলিয়া প্রয়োজনবশতঃ

এখানে কেবল তাঁহার ত্রুটি ও ভ্রম-প্রমাদগুলিই প্রদর্শিত করিতেই প্রবৃত্ত হইয়াছি বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আমাদিগেরও এ বিষয়ে অনেক ভ্রম প্রমাদ ঘটিতে পারে, সেরূপ ভ্রম প্রমাদ লক্ষ্য করিলে নগেন্দ্রবাবু কিংবা অপর কেহ অনুগ্রহপূর্বক উহা প্রদর্শন করিলে, আমরা অসঙ্কোচে আমাদের ভ্রম প্রমাদ স্বীকার করিয়া লইব। আর যদি আমাদিগের প্রদর্শিত ত্রুটি ও ভ্রম প্রমাদগুলি যথার্থ হয়, তাহা হইলে আমরা আশা করি, বিদ্যাপতির পদাবলীর পাঠক ও ভবিষ্যতে সম্পাদকগণ সেই ত্রুটি ও ভ্রম প্রমাদগুলি স্বীকার করিয়া গুণিজন-সুলভ গুণগ্রাহিতার পরিচয় প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

পদ-বিন্যাসে ত্রুটি

অলঙ্কারশাস্ত্রের সনাতন নিয়ম "আদৌ নমস্ক্রিয়াশীর্ব্বা বস্তুনির্দ্দেশ এব বা। "ক্বচিন্নিন্দা খলাদীনাং সতাং চ গুণকীর্ত্তনম্॥" অর্থাৎ কাব্যরচনা করিতে যাইয়া, প্রথমেই দেবতার বন্দনা, দেবতার আশীর্ব্বাদ-প্রার্থনা কিংবা বর্ণনীয় বস্তুর উল্লেখ দ্বারা কাব্য আরম্ভ করিতে হইবে। ক্বচিৎ কোন কোন কবি এসকলের পরিবর্তে দুর্জনের নিন্দা কিংবা সজ্জনের প্রশংসা দ্বারাও কাব্য আরম্ভ করিয়া থাকেন। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পরবর্তী বাঙ্গালী বৈষ্ণব পদকর্তারা সকলেই পদাবলীর পালা করিতে যাইয়া প্রথমে শ্রীগৌরচন্দ্রের পদ দিয়াছেন। বিদ্যাপতি শ্রীমহাপ্রভুর পূর্ববর্তী কবি সুতরাং তাঁহার কাব্যে শ্রীগৌরাঙ্গের বন্দনা থাকা অসম্ভব। তিনি বৈষ্ণব হইলে শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা থাকা সম্ভব ছিল; কিন্তু জানা গিয়াছে যে, তিনি শৈব বা শাক্ত ছিলেন। তাঁহার রচিত শিব ও পার্ব্বতীর বন্দনা কয়েকটী পাওয়া গিয়াছে। নগেন্দ্রবাবু তাঁহার সংস্করণে ঐ পদগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাঁহার পদাবলীর সম্পাদকেরা কোন্ পদ দিয়া গ্রন্থ আরম্ভ করিবেন, ঠিক করিতে না পারিয়া খুব গোলে পড়িয়ছেন। 'মহাজন-পদাবলী'-সম্পাদক জগবন্ধুবাবু শ্রীকৃষ্ণের আপ্তদূতীর বর্ণিত "শৈশব যৌবন দুহু মিলি গেল" ইত্যাদি শ্রীরাধার বয়ঃসন্ধির পদ দ্বারা গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন। অক্ষয়বাবু ও সারদা বাবুও তাহাই করিয়াছেন। কাব্যবিশারদ মহাশয় সেরূপ না করিয়া, "গেলি কামিনী গজহু গামিনী" ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগের পদ প্রথমে দিয়াছেন। নগেন্দ্রবাবুর সংস্করণে "বন্দনা" নাম দিয়া দূতীর উক্তি একটা মৈথিল পদ ও 'রাধা-বন্দনা" নামে "দেখ দেখ রাধা রূপ অপার" ইত্যাদি 'পদকল্পতরু'র ১৪৭১

সংখ্যক পদটি প্রথমে দিয়া, তারপরে "বয়ঃসন্ধি" বিষয়ক পদগুলি সন্নিবেশিত করিয়াছেন। নগেন্দ্রবাবুর উদ্ধৃত মৈথিল পদটী এই যথা—

(১)

(দূতীর উক্তি)

নন্দক নন্দন কদম্বেরি তরু তরে
ধিরে ধিরে মুরলি বলাব।
সময় সঙ্কেত নিকেতন বইসল
বেরি বেরি বোলি পঠাব ॥২।
সামরী তোরা লাগি
অনুখনে বিকল মুরারি ॥ ৩।
জমুনাক তির উপবন উদবেগল
ফিরি ফিরি ততহি নিহারি।
গোরস বিকে অবইতে জাইতে
জনি জনি পুছ বনমারি ॥ ৫।
তোঁহে মতিমান সুমতি মধুসূদন
বচন শুনহ কিছু মোরা।
ভনই বিদ্যাপতি শুন বর যৌবতি
বন্দহ নন্দ কিসোরা ॥ ৭।

বলা বাহুল্য যে, এই পদটীও বয়ঃসন্ধির পদের মত শ্রীকৃষ্ণের আপ্ত-দূতীর উক্তি। আগে শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগ-সঞ্চারের বর্ণনা না দিলে তাঁহার দ্বারা আপ্ত-দূতীর প্রেরণ বা আপ্ত-দূতীর এসকল উক্তির তাৎপর্য কিছুই ভাল করিয়া বুঝা যায় না; সুতরাং এই "নন্দক নন্দন" ইত্যাদি পদ দ্বারা গ্রন্থ আরম্ভ করা কোনমতেই সঙ্গত বলা যাইতে পারে না। কবি ভণিতায় দূতীর পক্ষ হইয়া শ্রীরাধাকে "বন্দহ নন্দ কিসোরা" বলাতেই ইহাকে বন্দনার পদ বলা যায় না। কবির ঐ কথার অর্থ—"শ্রীরাধে! তুমি বুদ্ধিমতী, মধুসূদনও বুদ্ধিমান; তোমাদের দুইজনের সংযোগ বেশ উপযুক্ত হইবে— তাই বলি, তুমি নন্দকিশোরকে ভজ।" 'পদকল্পতরু'র ২৪৭১ সংখ্যক "দেখ দেখ রাধা-রূপ অপার" ইত্যাদি পদটী কোন একজন অজ্ঞাত পদকর্তার পদ। উপযুক্ত মঙ্গলাচরণ-পদের অভাবে কবির বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীরাধার রূপবর্ণনার পদের দ্বারা গ্রন্থ আরম্ভ করিলে, উহা অবশ্যই নিন্দনীয় হয় না; কিন্তু বিদ্যাপতির সংস্করণে অন্য কবির রচিত

এরূপ রূপবর্ণনার পদ দেওয়ার কোন সার্থকতা দেখা যায় না। নগেন্দ্রবাবু ভণিতাহীন অনেক পদই অকারণে বিদ্যাপতির পদ বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন, আমরা যথাস্থানে সে সম্বন্ধে আলোচনা করিব। এই ভণিতা-হীন পদটিও তিনি বিদ্যাপতির বলিয়া অনুমান করেন কি? সেরূপ করিলে উহার অনুকূল যুক্তি দেখাইয়া সেকথা স্পষ্ট বলা উচিত ছিল।

আমরা পূর্বে যাহা বলিয়াছি, তাহাতেই বুঝা যাইবে যে জগবন্ধুবাবু অক্ষয়বাবু ও সারদাবাবু যে আপ্ত দূতীর উক্তি বয়ঃসন্ধির পদ দ্বারা পালা আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাও ঠিক হয় নাই। কাব্যবিশারদ মহাশয় বোধহয় ইহা বুঝিতে পারিয়াই "গেলি কামিনী গজহু গামিনী" ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগের পদ দ্বারা পালা আরম্ভ করিয়াছেন, আপাততঃ ইহা অসঙ্গত মনে না হইলেও, ইহাও যে প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক ও রসশাস্ত্রকারগণের মতবিরুদ্ধ ও সহৃদয়দিগের প্রীতিকর নহে, — শ্রীরাধার পূর্বরাগের পদ দ্বারাই পালা আরম্ভ করা উচিত ছিল, ইহা না বলিলে চলে না। এ সম্বন্ধে অলঙ্কার শাস্ত্রের নিয়ম কি, এবং ঐ নিয়মের অনুকূলেই বা কি যুক্তি আছে, এখানে আমাদিগকে উহার একটু আলোচনা করিতে হইবে।

অলঙ্কারশাস্ত্রে উক্ত আছে—"আদৌ বাচ্যস্ত্রিয়া রাগঃ পশ্চাৎ পুংসস্তদিঙ্গিতৈঃ" অর্থাৎ আদৌ নায়িকার পূর্বরাগ বর্ণিত করিয়া পরে সেই নায়িকার অনুরাগ চিহ্ন দর্শনে সঞ্জাত নায়কের পূর্বরাগের বর্ণনা করিতে হইবে। এইরূপ নিয়ম কেন করা হইল, সে সম্বন্ধে অলঙ্কারশাস্ত্রে স্পষ্টভাবে কিছু বলা হয় নাই। একজন রসশাস্ত্রকার শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগের সম্বন্ধে কেবল ইহাই বলিয়াছেন যে, ব্রজাঙ্গনাদিগের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগই পূর্বে জন্মিয়াছিল, ইহা বলিলে যদিও কিছু অসম্ভব বলা হয় না, কিন্তু ব্রজাঙ্গনাদিগের পূর্বরাগ আগে বর্ণিত করিলেই, তাহা অধিক চমৎকার হইয়া থাকে। এখানেও এইরূপ বলার তাৎপর্য সুগম নহে। 'রসমঞ্জরী' গ্রন্থের প্রণেতা ভানু দত্ত উজ্জ্বল রসের আলম্বন বিভাব অর্থাৎ আশ্রয় নায়ক-নায়িকার প্রকার ভেদের বর্ণনা করিতে যাইয়া, আগে নায়িকারই বিবরণ দিয়াছেন; তাঁহার উক্তি — "তত্র রসেষু শৃঙ্গারস্যা ভ্যর্হিতত্বের তদালম্বন-বিভাবত্বেন নায়িকা তাবৎ নিরূপাতে।" প্রসিদ্ধ টীকাকার নাগেশ ভট্ট শৃঙ্গার রসের "অভ্যর্হিতত্ব" অর্থাৎ সমধিক আদরের কারণ লিখিয়াছেন— "পুরুষোত্তমাশ্রয়ত্বাৎ কৃষ্ণদৈবত্যাচ্চ"; অর্থাৎ

যেহেতু শৃঙ্গার রসের আশ্রয় ও অধিষ্ঠাত্রী দেবতা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ, সেই পুরুষোত্তমের যে শৃঙ্গার রস উহার আবার আশ্রয় নায়িকা ; সুতরাং নায়িকাই আগে বর্ণনীয় বটে। "পুরুষোত্তম" শব্দটী এখানে উপলক্ষ মাত্র ; সুতরাং এই যুক্তি অনুসারে সাধারণ নায়ক নায়িকার পক্ষেও এই কথা প্রযোজ্য বটে। নাগেশ ভট্টের প্রদর্শিত এ যুক্তিটী নব্য যুক্তিবাদী না মানিতে পারেন, কিন্তু তিনিও তাঁহার অর্ধাঙ্গিনীকে প্রতীচ্য নজির অনুসারে Better half অর্থাৎ উৎকৃষ্টতর অর্ধাঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিয়া তাঁহাকে অগ্রগণ্য না করিলে হাল ফ্যাসনমতে অসভ্যতারই পরিচয় দেওয়া হইবে ; সুতরাং নায়িকার প্রাধান্য সম্বন্ধে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, প্রাচীন ও নব্য মতের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য না থাকায় আমাদের বোধ হয় বাগ্‌বাহুল্য না করিলেও চলিবে! তবে তর্ক হইতে পারে যে প্রতীচ্য সভ্য সমাজে নায়িকারা নানাকারণে নায়কদিগের অপেক্ষা অধিক সম্মানর্হ হইলেও প্রতীচ্য সাহিত্যে সর্বত্রই নায়িকার পূর্বরাগ আগে বর্ণিত হওয়ার নিয়ম নাই— প্রতীচ্য সাহিত্যের অনুকরণে বাঙ্গালা সাহিত্য হইতেও ঐ মামুলী নিয়মটী উঠিয়া যাইতেছে ; সুতরাং এখানে প্রতীচ্যের দৃষ্টান্ত খাটে না ; ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রে নায়িকার পূর্বরাগ কেন পূর্বে বর্ণনীয় বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে, উহার প্রকৃত সমাজতত্ত্ব-অনুযায়ী কারণ নির্ণয় করিতে হইবে।

বস্তুতঃ নায়িকার পূর্বরাগই যে প্রথমে ঘটিবে, এমন কোন কথা নাই ; প্রণয়ের দেবতাটি প্রথমে যাহার স্কন্ধে ভর করিবেন, তাহাকেই তাঁহার বাধ্য হইতে হইবে। এ অবস্থায় এ রকম একটা অযৌক্তিক বাঁধা নিয়ম করিয়া ফল কি—এ কথা আমাদের মনে হওয়া স্বাভাবিক বটে। তথাপি বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের এই নিয়ম শুধু কাল্পনিক নহে ; ইহার মূলে একটা সত্য নিহিত আছে। আজকালের কাব্যে আমরা তথাকথিত অশ্লীলতা কম দেখিতে পাইলেও, তাহাতে অধিকতর দুর্নীতির পোষক পরকীয়া প্রেমের নিতান্তই ছড়াছড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের আলঙ্কারিকগণ কাব্যে পরকীয়া প্রেমের বর্ণনা "রসাভাস" সুতরাং সহৃদয় ব্যক্তির পক্ষে নিতান্ত অপ্রীতিকর বলিয়া বর্জনীয় বলিয়া গিয়াছেন। নিখিল সাহিত্যে কেবল ব্রজাঙ্গনাদিগের পক্ষেই এ কথা খাটে না ; কেন না, তাঁহারা দ্রষ্টব্যে পরকীয়া হইলেও অন্ততঃ স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া ব্যতীত

আর কিছুই নহেন। শুধু প্রেমলীলার রসপুষ্টির জন্য তাঁহারা স্বকীয়া হইয়াও যোগমায়ার প্রভাবে আপনাদিগকে পরকীয়া মনে করিয়াছেন মাত্র। আমাদের ভারতীয় হিন্দু সমাজে কারণবশতঃ বহুপত্নীত্ব দূষনীয় বিবেচিত হয় নাই, কিন্তু পরকীয়ার প্রতি অনুরাগ সর্বদাই অত্যন্ত ঘৃণিত বলিয়া গণ্য হইয়াছে। আমাদিগের নায়িকারা সীতা-সাবিত্রীর আদর্শ-চরিত্রে গঠিত।

তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কোন নায়কের প্রতি অনুরক্তা হইয়া, অনুরাগের চিহ্ন বাহ্যে প্রকাশ করিলে তিনি যে শাস্ত্রের বিধি অনুসারে সেই নায়কের ধর্মপত্নী হওয়ার যোগ্য—এইরূপ অনুমান করিয়া এ নায়কও তাঁহার প্রতি আসক্ত হইলে উহাতে কোন দোষ বা রসাভাসের কারণ ঘটে না; কিন্তু প্রথম দর্শনমাত্রেই যদি নায়ক অনুরক্ত হইয়া পড়ে ও পরে জানা যায় যে, তাহার অনুরাগের পাত্রী তাহার ধর্মপত্নী হওয়ার অযোগ্যা অনূঢ়া কিংবা পরকীয়া বটে, তাহা হইলে সহৃদয়গণের নিতান্ত অপ্রীতিকর রসাভাস দোষ অপরিহার্য হইয়া উঠে। বস্তুতঃ জগতে সেরূপ নিন্দিত নায়ক বা নায়িকার অভাব না থাকিলেও, আমাদের অলঙ্কারশাস্ত্রের বিধান অনুসারে, তাহাদের চরিত্র সৎকাব্যে সুকবিদিগের দ্বারা বর্ণনীয় নহে। এজন্যই পাছে সেইরূপ কোন রসাভাসের আশঙ্কা না ঘটে, সেজন্যই আলঙ্কারিকেরা "আদৌ বাচ্য-স্ত্রিয়া রাগঃ পশ্চাৎ পুংসস্তদিঙ্গিতৈঃ" এই সমীচীন নিয়মটী বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ এজন্য বা অন্য যে কারণেই ঐ নিয়ম হইয়া থাকুক না কেন, সংস্কৃত কবিরা ও তাঁহাদিগের অনুসরণে বৈষ্ণব পদকর্তারা প্রথমে শ্রীরাধা প্রভৃতির পূর্বরাগই বর্ণিত ও পদাবলী গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। 'পদকল্পতরু' প্রভৃতি প্রাচীন ও প্রামাণিক পদ-সংগ্রহে তাই আমরা প্রথমে শ্রীরাধার পূর্ব-রাগের পদাবলীই দেখিতে পাই। আমাদের বিবেচনায় বিদ্যাপতির পূর্বোক্ত সংস্করণগুলিতেও সেই সমীচীন প্রথা অনুসারে শ্রীরাধার পূর্বরাগের "কি কহব হে সখি কানুক রূপ" ইত্যাদি পদগুলিই প্রথমে সন্নিবেশিত করা কর্তব্য ছিল; তাহা না করায় রসের স্বাভাবিক পর্যায় ও আস্বাদনের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

(১ সংখ্যক পদ)

এখন আমরা নগেন্দ্রবাবুর উদ্ধৃত ১ সংখ্যক পদের পাঠ-বিচারে প্রবৃত্ত হইব। প্রথমেই বক্তব্য যে, এই পদটী বঙ্গদেশে প্রচলিত নাই; নগেন্দ্রবাবু 'রাগ-তরঙ্গিণী' নামক মিথিলার একখানা অমুদ্রিত পদাবলীর পুথি হইতে

সংগৃহীত করিয়াছেন। নগেন্দ্রবাবু অনেক স্থলেই বলিয়াছেন যে, বিদ্যাপতির পদাবলী বঙ্গদেশের পুথিতে বাঙ্গালী লিপিকরদিগের অজ্ঞতাহেতু নিতান্ত বিকৃত হইয়াছে। এই ধারণায় তিনি 'পদকল্পতরু' প্রভৃতি গ্রন্থের পদাবলীর পাঠ কোথাও মৈথিল পুথির নজিরে, কোথাও বা শুধু নিজের কল্পনার বলে সংশোধিত ও পরিবর্তিত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। সে সকল অসংখ্য সংশোধন ও পরিবর্তন কতদূর প্রামাণিক ও সঙ্গত আমরা ক্রমে উহার আলোচনা করিব। নগেন্দ্রবাবুর এই ১ সংখ্যক পদটী এ যাবৎ মৈথিল হস্তলিপির গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া নিজের বিশুদ্ধি রক্ষা করায় ইহা ও এই জাতীয় অন্যান্য মৈথিল পদগুলি পাঠক বিশেষ মন দিয়া পাঠ করিবেন; কেননা, উহা হইতে বিদ্যাপতির খাঁটি রচনার অনেক নমুনা পাওয়া যাইবে।

নগেন্দ্রবাবু তাই পদের টীকায় লিখিয়াছেন—"ভাটিয়াল বরাড়ী ছন্দ। ২৫ হইতে ২৭ মাত্রা।" "ভাটিয়াল" ও "বরাড়ী" দুইটী প্রসিদ্ধ রাগিণী; উহাদের মিশ্রণে "ভাটিয়াল-বরাড়ী" মিশ্র-রাগিণীর সৃষ্টি হইতে পারে ইহাই আমাদের জানা ছিল; উহা যে একটা ছন্দেরও নাম হইতে পারে আমরা এই প্রথম শুনিলাম। ছন্দটা আবার একরকম স্বাধীন, কেন না উহার মাত্রার কোন ঠিকানা নিশ্চিত নাই; ২৫ মাত্রা হইতে ২৭ মাত্রা পর্যন্ত সবরকমই হইতে পারে। আমাদিগের কিন্তু বিশ্বাস যে, নগেন্দ্রবাবু নিজের জ্ঞান অনুসারে এ তথ্যটা লিখেন নাই। যে সকল মৈথিল পণ্ডিতদিগের ছন্দোজ্ঞানের সাহায্য লইতে যাইয়া স্যার গ্রীয়ারসন মহোদয়কে হতাশ হইয়া স্বাবলম্বনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, ইহা বোধহয় তাঁহাদিগের মত কোন পণ্ডিতের বিদ্যার পরিচয় বটে। যাঁহাদিগের বিদ্যাপতির পদাবলীর ছন্দে একটু অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারা মৈথিল ভাষার অনুযায়ী অক্ষরের লঘু-গুরু মাত্রা-অনুসারে এই পদের কলিগুলির মাত্রাবিভাগ (scanning) করিলেই দেখিতে পাইবেন যে, ৩ সংখ্যক ধুয়ার কলিটী ছাড়া উহার অন্যান্য সমস্ত অর্ধ কলিতেই

৪ + ৪ + ৪ + ৪

৪ + ৪ + ৪ = ২৮ মাত্রা

রহিয়াছে; ইহাকে মাত্রা-ত্রিপদী ছন্দ বলা হয়; জয়দেবের গীতগোবিন্দের "ললিত-লবঙ্গ-লতা" ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙ্গালার বৈষ্ণব-কবিগণের ব্রজবুলি পদে এই ২৮ মাত্রার ত্রিপদী ছন্দের শত শত দৃষ্টান্ত আছে। সংস্কৃত

২৮ মাত্রার ত্রিপদী হইতে এই ত্রিপদীর পার্থক্য শুধু এই যে, সংস্কৃতে "আ" "ঈ" "ঊ" "এ" "ঐ" প্রভৃতি দীর্ঘ স্বরগুলি এবং সংযুক্তবর্ণের আগের অক্ষর ও অনুস্বার-বিসর্গ-যুক্ত অক্ষর সর্বদা গুরু গণ্য হয়; কিন্তু মৈথিল ও ব্রজবুলিতে সেগুলি প্রয়োজনমত কচিৎ লঘু গণ্য করা হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্থলে প্রথম কলিটাই ধরা যাউক। এই কলির প্রথমার্ধের অক্ষরগুলির মধ্যে সংস্কৃত ছন্দোশাস্ত্রের নিয়মমতে "কদম্বেরি" শব্দের "দ" ও "ম্বে" ও "তরে" শব্দের "রে" গুরু অর্থাৎ দুই মাত্রা পরিমিত হইলেও এখানে ঐ সকল অক্ষর এবং ২য় চরণের "রে" "রে" অক্ষর দুইটিকেও লঘু ধরিতে হইবে; সুতরাং ঐ দুই চরণে

২১'১।২১১।১১১১।' ১১১১।

১১১১।১১১১।২২ = ২৮ মাত্রা

ঠিক পাওয়া যাইতেছে। ধুয়ার কলিটী শুধু এ নিয়মের বহির্ভূত বটে, উহাতে—

৪ + ৪ + ৪

৪ + ৪ + ৪ = ২৪ মাত্রা

আছে; "সামরী' শব্দের "রী" লঘু ও "লাগি" শব্দের "গি" ছন্দের অনুরোধে দীর্ঘ উচ্চারণ করা আবশ্যক সুতরাং যথাক্রমে "রি" ও "গী" লেখাই উচিত ছিল। লিপিকরের অনভিজ্ঞতায় সেরূপ লিখিত হয় নাই।

এইরূপ ছন্দের ও নামের মাত্রা-পরিমাণ-নির্দেশের ভুল অধিকাংশ স্থলেই দেখা যাইবে। আমরা যথাস্থলে উহার আলোচনা করিব। তাম্রশাসন বা শিলালেখের সন্দিগ্ধ পাঠের ন্যায় প্রাচীন হস্তলিপি পুথির সন্দিগ্ধ পাঠ-নির্ণয়েও ছন্দের পরিজ্ঞান অনেক স্থলেই যথেষ্ট কাজে লাগিয়া থাকে; এজন্য আমাদিগকে বাধ্য হইয়াই বিদ্যাপতির ছন্দ সম্বন্ধে একটু বিশেষভাবেই আলোচনা করিতে হইবে।

যদিও আমরা মৈথিল হস্তলিপি পুথি দেখি নাই, কিন্তু পূর্ব-প্রদর্শিত ছন্দের আলোচনা দ্বারা বুঝিতে পারিতেছি যে উদ্ধৃত পদের "জমুনাক" স্থলে শুদ্ধ পাঠ "যমুনক" বা "জমুনক্" হইবে। শব্দের আদ্যে "য"-কারের উচ্চারণ হিন্দী ও মৈথিল ভাষায় "জ"-কারের মত, সুতরাং "যমুনক" বা "জমুনক" উভয় শব্দের উচ্চারণে কোন প্রভেদ নাই। সেইরূপ ৯ ছত্রের "বিকে" স্থলে "বীকে" শুদ্ধ পাঠ হইবে; "বীকে" চারি মাত্রার শব্দ না ধরিলে ছন্দোপতন অনিবার্য হইয়া পড়ে। "বীকে"—"বিক্রী" শব্দের অপভ্রংশ; সংযুক্ত

"ক্র" অক্ষরের লোপে পূর্ব "বি" অক্ষর গুরু হওয়া ভাষাতত্ত্বের নিয়মানুযায়ী বটে। বিদ্যাপতিতে অনেক "বীক" ও "বীকে" পাওয়া যায়; যথা ঃ

কেও দে হাস সুধা সম নীক।
জইসন পরহোঁক তইসন বীক॥

(নগেন্দ্রবাবুর সংস্করণ ১২৯ সং পদ)

নগেন্দ্রবাবু "বীকে" শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—"বিক্রয় করিতে"। ভাবার্থ হইলেও শব্দার্থ তাহা নহে; সংস্কৃত "বিক্রয়" হইতে অপভ্রংশ "বিক্রী", "বীকি" ও "বীক" শব্দগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে। "বীক" বা "বীকি" শব্দের উত্তর সপ্তমী বিভক্তির "এ" যোগে "বীকে" হইয়াছে, উহার অর্থ—বিক্রয়ে বা বিক্রীতে; "বীকে" কৃদন্ত পদ নহে—উহা সুবন্ত পদ।

নগেন্দ্রবাবু "জনি জনি" শব্দের টীকা করিয়াছেন—"জনি জনি"—প্রত্যেক রমণী। (পুং জন—পুরুষ; স্ত্রী জনি—রমণী)। যদিও সংস্কৃত অভিধানে স্ত্রী অর্থে "জান্" ও "জনী" শব্দ দেখা যায়, কিন্তু হিন্দী বা বিদ্যাপতির মৈথিল ভাষায় ঐ অর্থে "জনি" শব্দের প্রয়োগ নাই। এখানে "জনি জনি" শব্দের অর্থ জনে জনে অর্থাৎ বনমালী জনে জনের কাছে তোমার কথা জিজ্ঞাসা করে। "জনি" শব্দের এরূপ একটা অপ্রচলিত অর্থ স্বীকার প্রয়োজন কি?

(২য় সংখ্যক পদ)

নগেন্দ্রবাবুর ২ সংখ্যার পদের তৃতীয় কলিটি এইরূপ, যথা—

কত কত লখিমী চরণতলে নেউছয়
. রঙ্গিনী হেরি বিভোরি।
করু অভিলাষ মনহি পদপঙ্কজ
অহোনিশ কোরে অগোরি॥

উহার প্রকৃত পাঠ 'পদকল্পতরু'তে আছে —

কত শত লখমী চরণতলে নীছয়ে
কত সুর-রঙ্গিনি হেরি বিভোরি।
করু অভিলাষ মনহি পদপঙ্কজ
সেবনি অহনিশ কোরে আগোরি॥

নগেন্দ্রবাবু বোধহয় "নীছয়ে" শব্দটি মৈথিল নহে মনে করিয়াই —উহার একটা কাল্পনিক মৈথিল রূপ "নেউছয়" বসাইয়া দিয়াছেন; কিন্তু

স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে ইহা মৈথিল বিদ্যাপতির পদ নহে; বাঙ্গালী কবির ব্রজবুলি পদ বটে। ব্রজবুলিতে "নিছয়ে" বা "নীছয়ে" শব্দের অসংখ্য প্রয়োগ আছে, সুতরাং উহা অশুদ্ধ মনে করার কোন কারণ নাই। তারপরে তিনি যে "কত সুর-রঙ্গিনি" স্থলে শুধু 'রঙ্গিনি' পাঠ ধরিয়াছেন এবং অন্ত্য চরণের "সেবনি" শব্দটি পরিত্যাগ করিয়াছেন—সেরূপ পাঠ 'পদকল্পতরু'র কোন সংস্করণ বা হস্তলিপি পুথিতেই পাওয়া যায় না। সেরূপ পাঠ ভাল অর্থ করা যায় না; কেননা কত শত লক্ষ্মী শ্রীরাধার চরণতলে নির্মঞ্ছন অর্থাৎ নিছনিরূপে থাকে, ইহা বলিয়া, পরে রঙ্গিনী (বিলাসিনী) উহা দেখিয়া বিভোর হয় বলিলে— অলঙ্কারশাস্ত্রের মতে "পতৎ-প্রকর্ষ" নামক রচনার দোষ ঘটে। "কত সুর-রঙ্গিনি" বাক্যের দ্বারা শচী, শিবানী প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ সুরনারীগণ ব্যঞ্জিত হওয়ায় ভাবের যথেষ্ট উৎকর্ষ হইয়াছে। অন্ত্য চরণে "সেবনি" অর্থাৎ সেবন শব্দটি না থাকিলে বাক্যের শুদ্ধ অন্বয়ই হয় না। নগেন্দ্রবাবু উহার ভাবার্থ লিখিয়াছেন — "মনে অভিলাষ (হয়) পদপঙ্কজ অহর্নিশ কোলে আগলাইয়া রাখি।" উহার প্রকৃত অর্থ — (পূর্বোক্ত সুরাঙ্গনারা) দিবারাত্র ক্রোড়ে আগ্‌লাইয়া (শ্রীরাধার) পাদপদ্মের সেবা অভিলাষ করেন!

এই পদের দ্বিতীয় কলিতে ১ সংখ্যক পদের মত ২৮ মাত্রা আছে, কিন্তু তৃতীয় কলিতে তৎস্থলে ৪+৪+৪+৪

৪+৪+৪+৪ = ৩২ মাত্রা

দৃষ্ট হয়; একটি পদেরই বিভিন্ন কলিতে এরূপ মাত্রার বৈষম্য থাকা অসম্ভব বিবেচনায়ই বোধহয় নগেন্দ্রবাবু তৃতীয় কলিটীকে ঐরূপে ছাঁটিয়া দিয়া মাত্রা বজায় রাখিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমাদের শুধু ইহাই বক্তব্য যে, বিনা-নজিরে এভাবে পাঠ-পরিবর্তন সম্পাদকের পক্ষে অতি গর্হিত কার্য। নগেন্দ্রবাবু ও তাঁহার মতাবলম্বী ব্যক্তিদিগের সন্তোষের জন্যে আমরা বৈষ্ণব কবির পদাবলী হইতে এইরূপ ছন্দের বৈষম্য বা বৈচিত্র্যের দুইটি উদাহরণ দেখাইয়াই আমাদের আজিকার বক্তব্য শেষ করিব।

কি হেরিলুঁ নাগর নবিন কিশোর।
শারদ-শশধর বয়ন মনোহর
রঙ্গিনি-নয়নহি লুবধ চকোর॥
নীলেন্দীবর সুন্দর লোচন
অঞ্জন-অরুণ তরুণি-চিত-চোর।

মাণিক অধর মনোহর বংশী
রসের তরঙ্গিম মোহিত মোর ॥
অমিয়া বচন শ্রবণ-অনুরঞ্জন
গঞ্জন-নীরদ-ভাস ॥
এক আর অনুপম জগ-মনমোহন
হাসি যেন বিজুরি প্রকাশ ॥

বসন্ত রায় ('পদকল্পতরু' ২৪৪৬ সংখ্যক)

নব-ঘন-পুঞ্জ-পুঞ্জ জিতি সুন্দর
অনুপম শ্যামর শোভা
পীত বসন জনু বিজুরি বিরাজিত
তাহে কুলবতি-চাতক-মন-লোভা ॥

ধরণী ('পদকল্পতরু' ২৪৫৪ সংখ্যক)

বসন্ত রায়ের পদের দ্বিতীয় কলির অর্ধাংশে ৩২ মাত্রা ও তৃতীয় কলির অর্ধাংশে ২৮ মাত্রা আছে। ধরণীর উদ্ধৃত কলিটির প্রথমার্ধে ২৮ মাত্রা ও দ্বিতীয়ার্ধে ৩২ মাত্রা আছে। খুঁজিলে এরূপ দৃষ্টান্ত আরও অনেক মিলিবে। ইহাকে ছন্দোপতন না বলিয়া ছন্দোবৈচিত্র্যের উদাহরণ মনে করাই সঙ্গত। কেননা—ছন্দোপতনে অভিজ্ঞ পাঠকের যেরূপ বৈরস্য জন্মে, ইহাতে সেরূপ হয় না; তথাপি ইহা পরিহার্য বটে; ভাল কবির রচনায় এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। বসন্ত রায় শ্রেষ্ঠ কবি হইলেও, তিনি ভাবের প্রতি অধিক লক্ষ্য রাখায়ই ছন্দের আদ্যোপান্তের সমতা রক্ষিত হয় নাই, বলিতে হইবে।

(৫ সংখ্যক পদ)

নগেন্দ্রবাবুর ২য় ও ৪র্থ পদের সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু বক্তব্য নাই।

তাঁহার ৫ম পদটী 'পদকল্পতরু' হইতে উদ্ধৃত হইলেও উহাতে অনেক পাঠাশুদ্ধি ও তজ্জনিত অর্থের ব্যতিক্রম দেখা যায়; পাঠকদিগের সুবিধার জন্য আমরা প্রামাণিক পাঠানুযায়ী পদটী নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া, নগেন্দ্রবাবুর ধৃত অশুদ্ধ পাঠগুলির বিচার করিব।

শৈশব যৌবন দরশন ভেল।
দুহুঁ পথ হেরইতে মনসিজ গেল ॥
মদন কি তাব পহিল পরচার।
ভিন জনে দেখয়ল ভিন অধিকার ॥

কটিকে গৌরব পাওল নিতম্ব।
ইনকে ক্ষীণ উনহি অবলম্ব॥
প্রকট হাস অব গোপত ভেল।
বরণ প্রকট ফের উহুকে নেল॥
চরণ চপল গতি লোচন পাব।
লোচনক ধৈরজ পদতলে যাব॥
নব কবিশেখর কি কহিতে পার।
ভিন ভিন রাজ ভীন বেবহার॥

(সা-প, 'পদকল্পতরু' ১০৬ সং)

নগেন্দ্রবাবু "মদনকি তাব" স্থলে "মদনক ভাব" পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদিগের আলোচিত 'পদকল্পতরু'র ক, খ, গ, ঘ ও চ—এই পাঁচখানা প্রাচীন হস্তলিখিত পুথি এবং 'পদরত্নাকর' ও 'পদরসসার' পুথির মধ্যে কোথায়ও "মদনক ভাব" পাঠ নাই, ক ও গ পুথিতে "মদনকি তার", খ ও গ পুথিতে "মদনকিতাব" ঘ পুথিতে "পদন কিতাবত", প-র পুথিতে "মদনকি ভাব" এবং প-র-সা পুথিতে "মদনকি রাজ" পাঠ আছে। বস্তুতঃ "মদনের রাজত্ব প্রথম প্রচার হইল" পংক্তিটীর যে ইহাই একমাত্র অর্থ তাহাতে মতভেদ নাই। হিন্দী ও মৈথিলী ভাষায় "রাজত্ব" অর্থে "রাজ" শব্দের বহুলব্যবহার আছে; সুতরাং প-র-সা পুথির পাঠ গ্রহণ করিলে কোনই গোলযোগ থাকে না; কিন্তু 'পদকল্পতরু'র পাঠের প্রামাণিকতার বিচারে 'পদরসসারে'র প্রমাণ অগ্রগণ্য হইতে পারে না। উহার "মদনকি রাজ" পাঠ পরবর্তী সংশোধন মনে করারও যথেষ্ট কারণ আছে; সুতরাং উহার ঐ পাঠ সুন্দর হইলেও আমরা উহা প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। "রাজ" বলিলে যে সঙ্গত অর্থ হয় "ভাব" বলিলে তাহা হয় না; সুতরাং 'পদরত্নাকর' ও তদনুযায়ী নগেন্দ্রবাবুর পাঠ যে অপ্রামাণিক অধিকন্তু অসঙ্গত তাহা না বলিয়া পারা যায় না। আমাদের আলোচিত খ পুথির "ত" ও "র" অক্ষর যথাক্রমে "ভ" ও "ব" বলিয়া পঠিত হইতে পারে; কেননা, উহাতে অনেক স্থলেই "ভ" ও "ত" অক্ষরে প্রভেদ দুর্লক্ষ্য এবং "র" অক্ষরের পরিবর্তে কেবল পেটকাটা "র" নহে, অনেক স্থলেই শূন্যহীন "র" ব্যবহৃত হইয়াছে; সুতরাং খ পুথির "মদন কিতাব" পাঠই ক, গ প্রভৃতি পুথিতে পাঠোদ্ধারের ভুলে "মদনকি তার" পঠিত ও লিখিত হইয়াছে, তাহা একটু প্রণিধান করিলেই বুঝা যাইবে। বলা বাহুল্য যে, "মদনকি তার" পাঠের কোনও সঙ্গত অর্থ হয়

না। এখন বাকি রহিল খ, ঘ ও চ পুথির পাঠ-বিচার। আমরা প্রায় দশ বৎসর পূর্বে সাহিত্য-পরিষদের সংস্করণের পাঠ-বিচারে "কিতাব" বা "কিতাবত" পারশী শব্দ ও উহার অর্থ কার্যকাল অর্থাৎ অধিকার (incumbency) মনে করিয়া সেইরূপ অর্থ লিখিয়াছি; কিন্তু এরূপ পাঠ ও অর্থই সুসঙ্গত কিনা সে সম্বন্ধে পরে আমাদের মনে সন্দেহ জন্মিয়াছে। আমাদিগের প্রাপ্ত ও আলোচিত সকলগুলি পুথির মধ্যে শ্রীবৃন্দাবনের খ পুথি ও মুরশিদাবাদের ঘ পুথি অধিক প্রাচীন ও শুদ্ধ বটে; যখন খ, ঘ ও চ—তিনখানি পুথিতেই প্রায় একরূপ পাঠ পাওয়া গিয়াছে, তখন "মদনকিতাব"ই যে প্রামাণিক ও সঙ্গত পাঠ, তাহাতে সন্দেহ নাই; তবে পদচ্ছেদ কিরূপ হইবে, অর্থাৎ "মদন-কিতাব" অথবা "মদনকি তাব" শুদ্ধ পাঠ, তাহাই চিন্তনীয় বটে; আমাদের মনে হইতেছে যে, "মদনকি তাব"ই অধিকতর সঙ্গত। আরবী "কিতাব" বা "কিতাবত" শব্দ হইতে অধিকার বা রাজত্ব অর্থ করিতে হইলে, একটু টানিয়া করিতে হয়; কেননা কোন কর্মচারীর কিতাবত যেমন বলা যায়, সেভাবে রাজার কিতাবত বা রাজার কিতাব শব্দের ব্যবহার আছে কিংবা ছিল বলিয়া জানা যায় নাই, কিন্তু "মদনকি তাব" পাঠ করিলে অর্থে সেরূপ কোন সন্দেহ থাকে না। আরবী "তাবে" বা "তাব" শব্দের অর্থ অধীনতা, বাঙ্গালায় ও হিন্দিতে "তাবে" "তাবেদার" প্রভৃত শব্দের খুব প্রচলন আছে, যেমন "মহারাজের তাবে আমরা পরম সুখে আছি" "আমি মহারাজের তাবেদার" ইত্যাদি। সুতরাং "মদনকি তাব পাহিল পরচার" এই বাক্যের অর্থ, মদনের অধীনতা প্রথম প্রচারিত হইল। নগেন্দ্র বাবু "দেয়ল" ও "কটিকে" শব্দের স্থলে যথাক্রমে "দেল" ও "কটিক" পাঠ করিয়াছেন। উভয় পাঠেই ছন্দোপতন অনিবার্য।

নগেন্দ্রবাবু "ইন্‌কে" ও "উন্‌হি" স্থলে যথাক্রমে "একক" ও "অওকে" পাঠ ধরিয়াছেন; উভয় পাঠই অপ্রামাণিক ও হিন্দী মৈথিলী ভাষায় অপ্রযুক্ত বটে। মৈথিলীতে "অওকে" অর্থাৎ "অব্‌কে" শব্দ "এখানকার" অর্থেই ব্যবহৃত দেখা যায়, যথা—

বিদ্যাপতি কহ কি বলব তোয়।
অব্‌কে মিলন সমুচিত হোয়॥

(সা-প সং ১৩৪ সং)

এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে বলা আবশ্যক যে, "অব্‌কে" স্থলে 'গীত-চিন্তামণি'তে "আজুক" পাঠ আছে; নগেন্দ্রবাবু সাহিত্য-পরিষদের সংস্করণে

"আজুক" পাঠই লইয়াছেন। 'পদকল্পতরু'র সকল পুথিতেই "অব্‌কে" পাঠ আছে; উহা স্বর্গীয় কাব্যবিশারদ মহাশয়েরও অনুমোদিত। সখী-স্থানীয় বিদ্যাপতি শ্রীরাধাকে অবিলম্বে অভিসারের জন্য অনুরোধ না করিয়া অনিশ্চিত সময়বাচক "আজুক" শব্দ ব্যবহার করিবেন, ইহা তাদৃশ সঙ্গত মনে হয় না; সে যাহা হউক, "অব্‌কে" শব্দের অর্থ "এখানকার" না হইয়া উহার অর্থ — "অপরে (কটি)" হইতে পারে না।

"বরণ" শব্দের স্থলে নগেন্দ্রবাবুর গৃহীত "উরজ" পাঠও আমরা কোন পুথিতে পাই নাই; 'পদরত্নাকর' ও 'কীর্ত্তনানন্দ' পুথিতে "বক্ষক" পাঠ আছে; "বক্ষ" ও "উরজ" এখানে সমানার্থক; নগেন্দ্রবাবু কোন পুথিতে "উরজ" পাঠ পাইয়া থাকিলেও, আমরা ঐ পাঠ এস্থলে সঙ্গত বোধ করি না; 'পদকল্পতরু'র ও 'পদরসসারে'র "বরণ" পাঠই সমীচীন মনে হয়, কেননা নায়িকার বয়ঃসন্ধি অবস্থায় "উরজ" অর্থাৎ স্তন শুধু "মুকুলিত" বা "অঙ্কুরিত" হইতে আরম্ভ করে; বিদ্যাপতিও সেজন্যই "হৃদয়জ মুকুলিত" (সা-প ৯ সং), "উরজ উদয় থল লালিম দেল" (ঐ ৪ সং), "কিছু কিছু উতপতি অঙ্কুর ভেল" (ঐ, ৬ সং) ইত্যাদি বর্ণিত করিয়াছেন। আলোচ্য পদে আছে—

*প্রকট হাস অব গোপত ভেল।
বরণ প্রকট ফের উহ্‌কে নেল॥

অর্থাৎ বালিকাসুলভ অট্টহাস্য এখন গুপ্ত হইল আর (নায়িকার) বর্ণ উহার অট্টহাস্যের প্রকটতা গ্রহণ করিল। বালিকারা স্বভাবতঃ অঙ্গ-সংস্কারে উদাসীন সর্বদা ধূলিক্রীড়ার অনুরক্ত বলিয়া, বিশেষতঃ বয়োধর্মে কিঞ্চিৎ মলিনাঙ্গী থাকে, যৌবনের উদ্‌গমের সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের রঙ্গের বাহার খুলিয়া যায়, ইহা সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন। বর্ণিতব্য নায়িকা শ্রীরাধার হাস্যকান্তি ও অঙ্গকান্তি উভয়ই শুভ্র এবং কান্তির হিসাবে এক জাতীয় পদার্থ; সুতরাং একটি গুপ্ত হইয়া অন্যটীতে যাইয়া প্রকট হইল, কিন্তু সেই প্রকটতা তাঁহার বর্ণকে আশ্রয় করিল, ইহা বলিলেই, অর্থ ও ভাব সুসঙ্গত হয়। নগেন্দ্রবাবুর ন্যায় "উরজ প্রকট" ইত্যাদি পাঠ ধরিয়া "প্রকট হাস্য এখন গুপ্ত হইল, উহার (হাস্যের) প্রকটতা উরজ লইল" অর্থ করিলে নানারূপ অসঙ্গতি ঘটে। প্রথমতঃ বয়ঃসন্ধি-কালে উরজের প্রকটতা অস্বাভাবিক; দ্বিতীয়তঃ উরজ অঙ্কুরিত হইলেও, তাহা কাঁচুলী ও ওড়নী দ্বারা সযত্নে আচ্ছাদিত হয়

বলিয়া "প্রকটিত" শব্দদ্বারা বাচ্য নহে; তৃতীয়তঃ "উরজ" ও হাস্যকান্তি বা হাস্যের প্রকটতা কি উপাদান, কি বর্ণ কোনরূপেই সজাতীয় বস্তু নহে; সুতরাং উহার একতর অন্যতরকে আশ্রয় করা সম্ভব; যদি কেহ বলেন যে, অন্য সাদৃশ্য না থাকিলেও এখানে শুধু "প্রকটত্ব" বিষয়েই সাদৃশ্য স্বীকার করিতে হইবে। উহার উত্তরে বলিব যে, কবিতা ন্যায়শাস্ত্র নহে; কবির দৃষ্টি নায়িকার সৌন্দর্যেই আবদ্ধ বটে; সুতরাং তাঁহার পক্ষে শুধু "ঘটত্ব" "পটত্ব" লইয়া বিচার করা সাজে না। বালিকার স্বাভাবিক অহৈতুক অট্টহাস্য ও তরুণীর স্বাভাবিক দেহ-কান্তির প্রকটতার বর্ণন কত সুন্দর ও স্বাভাবিক, তাহা সহৃদয় পাঠকই বিচার করিবেন। বলা বাহুল্য যে নগেন্দ্রবাবুর গৃহীত পাঠ ও অর্থে পূর্ব-প্রদর্শিত কতকগুলি অসঙ্গতি ছাড়া অর্থের কোন চমৎকারিত্ব নাই।

নগেন্দ্রবাবু "কহিতে" ও "ভীন" শব্দে যথাক্রমে "কহইত" ও "ভিন" পাঠ ধরিয়াছেন; উভয় পাঠেই ছন্দোপতন ঘটে।

এই পদটীর সম্বন্ধেও নগেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন—"পার্বতীয় বড়ারী ছন্দ"। "বড়ারী" সমতলীয়ই হউক আর পার্বতীয়ই হউক, কোন ছন্দের নাম নহে; উহা একটা রাগিণীর নাম,—আমরা ইতিপূর্বেই তাহা বলিয়াছি, সুতরাং উহার পুনরালোচনা অনাবশ্যক। এখানে আবার বলিতে চাই যে, পাঠ ও অর্থের অসঙ্গতির বিচারের জন্য আমরা বিদ্যাপতির উদ্ধৃত পদগুলির কোন কোন পংক্তির ব্যাখ্যা করিতে বাধ্য হইলেও, সকল দুরূহ পঙ্‌ক্তি বা শব্দের অর্থ স্থানাভাবে লিখিতে পারি নাই; সুতরাং যে সকল পাঠক কৃপা করিয়া "বিদ্যাপতি-বিচার" পাঠ করিবেন, তাঁহারা সমস্ত পদের অর্থ জানিতে ইচ্ছা করিলে নগেন্দ্রবাবুর সম্পাদিত বিদ্যাপতির সংস্করণ কিংবা উহা এখন বাজারে অপ্রাপ্য হওয়ায় কাব্যবিশারদের সংস্করণ কিংবা সাহিত্য-পরিষদের প্রকাশিত 'পদকল্পতরু' পাঠ করিবেন। পাঠকদিগের সুবিধার জন্যই উদ্ধৃত আলোচ্য পদাবলীর শেষে সাহিত্য-পরিষদের সংস্করণের পদসংখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

(নব কবিশেখর)

আলোচ্য পদটীর ভণিতায় "নব কবিশেখর" নাম আছে। কাব্যবিশারদ মহাশয় তাঁহার সংস্করণে শুধু "বিদ্যাপতি" ভণিতা-যুক্ত বঙ্গদেশের প্রচলিত পদাবলীই সন্নিবেশিত করিয়াছেন; তাঁহার হয়ত ধারণা ছিল যে, "কবিশেখর" বা "নব কবিশেখর" বিদ্যাপতি নহেন, অন্য পদকর্তা; সেজন্য তিনি "কবিশেখর"

বা "নব কবিশেখর" ভণিতার কোন পদই তাঁহার সংস্করণে দেন নাই। 'পদকল্পতরু' গ্রন্থে "নব কবিশেখর" ভণিতার মোটে চারিটী পদ আছে; উহাতে "কবিশেখর" ভণিতার পদসংখ্যা ৪২টী; নগেন্দ্রবাবু উহার মধ্য হইতে তাঁহার সংস্করণে কবিশেখরের ৩টী পদ গ্রহণ করিয়াছেন; একটি পদ গ্রহণ করেন নাই; কেন করেন নাই উহারও কারণ নির্দেশ করেন নাই; সুতরাং অনুমান হয় যে উহা তাঁহার অপ্রণিধানেই পরিত্যক্ত হইয়াছে; কেননা, তিনি আলোচ্য পদটীর টীকায় লিখিয়াছেন, — "কবিশেখর বিদ্যাপতির উপাধি। তাঁহার পূর্বে জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুর কবিশেখরাচার্য্য নামে মিথিলার সংস্কৃত কবি ছিলেন, এই কারণে কিছুদিন বিদ্যাপতিকে নব কবিশেখর কহিত।"

বস্তুতঃ "কবিশেখর" ভণিতাটা নিশ্চয়াত্মক নহে; ইহাদ্বারা "কবিশেখর" উপাধিধারী কোন পদকর্তা অথবা "শেখর" নামক কোন কবি — উভয়ই বুঝা যাইতে পারে। সংস্কৃত "শেখর" শব্দের অর্থ—মস্তক, মস্তকভূষণ ইত্যাদি; সুতরাং "কবিশেখর" শব্দটা কোন পদকর্তার উপাধি না হইতে পারে, এমন নহে। মিথিলায় বিদ্যাপতির পূর্বে অন্য কেহ "কবিশেখর" উপাধিধারী প্রসিদ্ধ কবি থাকিলেও বিদ্যাপতিকে তাঁহার ভূম-দান-পত্রের "অভিনব জয়দেব" শব্দবৎ "নব কবিশেখর" শব্দে বিশেষিত করা খুব সম্ভবপর মনে হয়। নগেন্দ্রবাবুর লিখিত এই বিবরণ কতদূর সত্য, তাহা আমরা জানিনা; কিন্তু "নব কবিশেখর" নামক পদকর্তা যে বাঙ্গালী কবি নহেন, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই। বাঙ্গালায় "রায়শেখর" বা "কবিশেখর" নামে একজন অতি প্রসিদ্ধ পদকর্তা প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন; তাঁহার পরে "শেখর" নামে পরিচিত একাধিক পদকর্তা হইয়া থাকিলেও, তাঁহারা কেহই "কবিশেখর" বা "কবি-শেখর" ভণিতা দিয়া পদরচনা করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না; সুতরাং বাঙ্গালায় পার্থক্য সূচক "নব কবিশেখর" নামসৃষ্টিরও কোন কারণ ঘটে নাই। এতদ্‌ভিন্ন "নব কবিশেখরভূম" ভণিতার উক্ত চারিটি পদই বিদ্যাপতির রচনার সৌসাদৃশ্য যুক্ত বটে; সুতরাং নগেন্দ্রবাবুর উল্লিখিত কিংবদন্তী সত্য হউক বা না হউক, আমরা বর্ণিত উভয় কারণেই "নব শেখর" ভণিতার উক্ত পদচতুষ্টয় বিদ্যাপতির রচিত বলিয়াই স্বীকার করি। "কবিশেখর" ভণিতার সকল পদের সম্বন্ধে কিন্তু এই কথা বলা যাইতে পারে না। উহার মধ্যে বিদ্যাপতির পদ ও পূর্বোক্ত বঙ্গীয় কবি রায়শেখরের পদ মিশিয়া গিয়াছে; সেগুলিকে বাছিয়া পৃথক করার

উপায় যে না আছে তাহা নহে ; কিন্তু যেজন্যই হউক নগেন্দ্রবাবু শুধু ভাষার সাদৃশ্য দর্শনে ভ্রান্ত হইয়া রায়শেখরের "কবি-শেখর" ভণিতার বহু সংখ্যক পদ তাঁহার বিদ্যাপতির সংস্করণে সন্নিবেশিত করিয়াছেন ; আমরা যথা স্থানে সে সম্বন্ধে আলোচনা করিব ; এখানে "নব কবিশেখর" সম্বন্ধে আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে তিনি বাঙ্গালী কবি নহেন ; বিদ্যাপতির রচনার সহিত সৌসাদৃশ্য দর্শনে এই পদগুলি বিদ্যাপতির রচিত বলিয়া অনুমান করা অসঙ্গত নহে। নগেন্দ্রবাবুর অপ্রণিধানে নব কবিশেখরের যে পদটী পরিত্যক্ত হইয়াছে, আমরা পাঠকদিগকে এখানে উহা উপহার দিয়াই বক্তব্য শেষ করিব। পদটী মাথুর লীলার বটে ; দূতী মথুরায় যাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধার বিরহ-সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া বলিতেছেন ঃ

সুহই

(যব) ঋতু পতি (১) নব পরবেশ (২)।
তব্ তুহুঁ ছোড়লি দেশ।।
তাহে যত বিবিধ বিলাপ।
কহইতে হৃদি মাহা (৩) তাপ॥
তব্ ধরি (৪) বাউরি (৫) ভেল।
গিরিষ-সময় বহি গেল॥
বরিষা ভেল চারি মাস।
না ছিল জিবন অভিলাস॥
তাহে যত পাওল দুখ।
কহইতে বিদরয়ে বুক॥
শারদে নিরমল চন্দ।
তাক (৬) জিবন সেই (৭) দন্দ (৮)॥
পুরবক (৯) রাস বিলাস।
সোঙরিতে (১০) না বহয়ে শ্বাস॥
হীম (১১) শিশিরে (১২) বহু শীত।
দিনে দিনে উনমত চীত॥
অব ভেল বহুত নিদান (১৩)।
নব কবিশেখর ভাণ (১৪)॥

(সা. প পদকল্পতরু ১৮৩২ সং)

---

(১) ঋতুরাজ বসন্ত (২) প্রবেশ (৩) মধ্যে (৪) "তব ধরি"-সেই সময় হইতে (৫) বাউলী, উন্মত্তা (৬) তাহার (৭) লইয়া (৮) বিবাদ (৯) পূর্বের (১০) স্মরণ করিতে (১১) হেমন্তে (১২) শীত ঋতুতে (১৩) অন্তিম অবস্থা (১৪) ভণে, কহে।

(৬ সংখ্যক পদ)

নগেন্দ্রবাবুর "কিছু কিছু উতপতি" ইত্যাদি ৬ সং পদটী কাব্যবিশারদের বয়ঃসন্ধির ৭ সং পদ বটে। ইহা 'পদকল্পতরু'তে নাই। নগেন্দ্রবাবুর এই পদের পাঠ ও অর্থ প্রায় কাব্যবিশারদের অনুরূপ, তবে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে; আমরা নিম্নে সে সম্বন্ধে আলোচনা করিব ঃ

(ক) কাব্যবিশারদের পাঠ—

কি কহব মাধব বয়স কি সন্ধি।

নগেন্দ্রবাবুর পাঠ "বয়স কি" স্থলে "বয়সক।" ইহাই শুদ্ধ পাঠ বটে; কারণ মৈথিল ভাষায় "ক" বা "কর"ই ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন, আধুনিক হিন্দীর ন্যায় "কা" বা "কী" নহে। আধুনিক হিন্দীতে সম্বন্ধ সূচিত বিশেষ্য পদ পুংলিঙ্গ বা স্ত্রীলিঙ্গ হইলে ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন যথাক্রমে "কা" বা "কী" হইয়া থাকে, যথা "রাজা কা বেটা" "রাজা কী বেটী" ইত্যাদি; মৈথিল বা প্রাচীন হিন্দী ভাষায় এইরূপ পার্থক্য দেখা যায় না।

(খ) কাব্যবিশারদের পাঠ—

তইও কাম হৃদয়ে অনুপাম।
রোয়ল ঘট উচল করি ঠাম॥

নগেন্দ্রবাবুর পাঠ—

তইঅও কাম হৃদয় অনুপাম।
রোয়ল ঘট উচল কয় ঠাম॥

ভূমিকায় উল্লিখিত 'মৈথিল-কোকিল-বিদ্যাপতি' গ্রন্থের পাঠ—

তৈও কাম হৃদয় অনুপাম।
রোপল ঘট উচল করি ঠাম॥

এই পদটী ষোল বা পনের মাত্রার "মাত্রা চতুষ্পদী" বা "চৌপাই" ছন্দে রচিত, "তইও" বা "তৈও" পাঠে ঐ মাত্রা বজায় থাকে কিন্তু নগেন্দ্রবাবুর "তইঅও" পাঠে মাত্রা-ভঙ্গ অনিবার্য হইয়া পড়ে। শব্দটী মৈথিল "তৈও" (=তবু) বটে; উহাকে "তইঅও" শব্দের ন্যায় অপ্রচলিত ও দুরুচ্চার্য একটা কল্পিত রূপ প্রদান করিয়া ছন্দোভঙ্গ করার কোনই কারণ দেখা যায় না। সার গ্রীয়ারসনের বিদ্যাপতিতে "তইও" শব্দেরই প্রয়োগ আছে, যথা—"তইও চললি

ধনি" ইত্যাদি (Maithili Chrestomathy, ৪৪ পৃষ্ঠা)। কাব্যবিশারদ ও নগেন্দ্রবাবুর "রোয়ল" পাঠ স্পষ্টই অশুদ্ধ প্রতীতি হয়। "রোয়ল" শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ "রোদন করিল"; উহার অর্থ "রোপন করিল" হয় না; আধুনিক বাঙ্গালায় "রুইল" শব্দের অর্থ "রোপণ করিল" হয় বটে, কিন্তু প্রাচীন পদাবলীতে বা মৈথিল-ভাষায় সর্বত্র "রোপল" শব্দেরই প্রয়োগ দেখা যায়। কাব্যবিশারদ ও নগেন্দ্রবাবুর "উচল" পাঠও ছন্দোদুষ্ট; "উচল" পাঠই সমীচীন বটে। বিদ্যাপতির পদে বহু স্থলেই "করি" শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়—

জীবন যৌবন সফল করি মানল।
(নগেন্দ্রবাবুর ৮২১ সং)

কাতর দিঠি করি চৌদিশ হেরি হেরি
নয়নে গলয়ে জল-ধারা॥
(নগেন্দ্রবাবুর ৭২৬ সং)

এখন তখন করি দিবস গমাওল
দিবস দিবস করি মাসা।
মাস মাস করি বরস গমাওল
ছোড়লুঁ জীবনক আশা॥
(নগেন্দ্রবাবুর ৭৩৩ সং)

চলু চলু সুন্দরি শুভ করি আজ।
(গ্রীয়ারসনের বিদ্যাপতি ৫৩ পৃষ্ঠা)

'মৈথিল-কোকিল-বিদ্যাপতি'-সম্পাদক বিহারের আরা জেলানিবাসী শ্রীযুক্ত ব্রজনন্দন সহায় মহাশয় "উচল করি ঠাম" পাঠই গ্রহণ করিয়াছেন। মৈথিলভাষার বিশেষজ্ঞ মনীষী সার গ্রীয়ারসন মহোদয় তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ Maithili Chrestomathy গ্রন্থের শব্দকোষে (Vocabulary) "কর" ধাতুর অসমাপিকা ক্রিয়ার পদে করি, করী, করিএ, কৈ, কয়, কঁ, কৈকঁ ইত্যাদি রূপগুলি প্রদর্শিত করিয়াছেন। এই পদটী মৈথিল কোন পুথিতে পাওয়া যায় নাই। বঙ্গীয় সকল পুথিতেই "করি" পাঠ আছে; দেখা যাইতেছে যে "করি" রূপটীই অপেক্ষাকৃত প্রাচীন অথচ মৈথিল ব্যাকরণ-সিদ্ধ বটে; সুতরাং উহার পরিবর্তে তদপেক্ষা আধুনিক "কৈ" বা "কয়" পাঠ কল্পনা করা কোনমতেই সমীচীন নহে।

নগেন্দ্রবাবু উদ্ধৃত পংক্তিদ্বয়ের অর্থ লিখিয়াছেন — "তথাপি (বন্দী হইয়াও) কন্দর্প (কিশোরীর) হৃদয়ে উচ্চ স্থান দেখিয়া (উচল করি) অনুপম

ঘট রোপণ করিল।" এইরূপ অর্থও সংলগ্ন হয় না ; কেননা, "উচল করি ঠাম" বাক্যের অর্থ কোনমতেই "উচ্চ স্থান দেখিয়া" করা যাইতে পারে না। কাব্যবিশারদ মহাশয় "ঠাম" শব্দের অর্থ "গঠন" ধরিয়া টীকা করিয়াছেন "গঠন উন্নতি করিয়া ঘট স্থাপন করিয়াছেন"। আমাদিগের বিবেচনায় কাব্য-বিশারদ মহাশয়ের ব্যাখ্যাই সঙ্গত বটে। যৌবনারম্ভে কিশোরীর স্তনোদ্গমের বর্ণন করিতে যাইয়া কবি স্তনের অনুল্লেখ ও তৎপরিবর্তে মাঙ্গলিক সুবর্ণ-ঘট স্থাপনের উল্লেখরূপ অতিশয়োক্তিমূলক প্রতীয়মান উৎপ্রেক্ষালঙ্কারের সাহায্যে বলিয়াছেন যে বোধ হয় যেন, কিশোরীর বক্ষঃস্থলে সেই স্থলটীকে উন্নত করিয়া কন্দর্পনৃপতি কিশোরীর অঙ্গ রাজ্যের অধিকাররূপ শুভ কার্যের মঙ্গলাচরণ স্বরূপ সুবর্ণ ঘট স্থাপন করিয়াছেন।

নগেন্দ্রবাবু ও তাঁহার অনুবর্তী 'মৈথিল-কোকিল-বিদ্যাপতি'-সম্পাদকের ব্যাখ্যার প্রথম অসঙ্গতি শব্দার্থে ; দ্বিতীয় অসঙ্গতি ভাবে। শব্দার্থের অসঙ্গতি এই যে, "উচল করি ঠাম" বাক্যের দ্বারা— "উচ্চ স্থান দেখিয়া" অর্থ পাওয়া যায় না। তারপর কথা হইতেছে এই যে, কন্দর্প কর্তৃক কুচরূপ স্বর্ণঘট-স্থাপনের পূর্বে কিশোরীর বক্ষঃ উচ্চ হইবে কি প্রকারে? বক্ষের উচ্চতার কারণ কুচোদ্গম ; সুতরাং কুচ-রূপ ঘট-স্থাপন দ্বারা বক্ষঃস্থলকে কন্দর্প উন্নত করিলেন এরূপ না বলিয়া, বক্ষঃ উন্নত দেখিয়া কুচ-রূপ ঘট স্থাপিত করিলেন,—এরূপ বলিলে অর্থের নিতান্ত অসঙ্গতি ঘটে। যদি বলেন যে, কন্দর্পের ঘট-স্থাপন কার্য হইল কবির কল্পিত একটা উৎপ্রেক্ষা ; প্রকৃতপক্ষে বক্ষের উচ্চতা-বিধান কার্যে কন্দর্পের কোনও কর্তৃত্ব নাই,—সুতরাং "কন্দর্প বক্ষঃস্থল উচ্চ করিয়া কুচ-ঘট স্থাপন করিল"—না বলিয়া "কুচ-ঘট স্থাপন করিয়া বক্ষ উচ্চ করিল" এরূপ বলাই সঙ্গত ছিল ; সেরূপ না বলায় দোষের কারণ হইয়াছে। আমরা এই আপত্তির উত্তরে বলিব যে প্রকৃত ঘটনার প্রকৃত কারণ নির্দেশ করিলে শুধু তাহা লইয়া কবিতা হয় না ; প্রকৃত ঘটনা'ও চমৎকারিত্বপূর্ণ কাল্পনিক কারণ নির্দেশ দ্বারাই কবিরা রচনার চমৎকারিত্বের পরিচয় দিয়া থাকেন। স্তনোদ্গম দ্বারা কিশোরীর বক্ষের উচ্চতা-বিধান যদিও প্রকৃত পক্ষে যৌবনারম্ভেরই কার্য বটে, উহাতে কন্দর্পের বাস্তবিক কোনও কর্তৃত্ব নাই, কিন্তু বিদ্যাপতি তরুণীর অঙ্গ-রাজ্যে কন্দর্পের নব অধিকার ও তাঁহার রাজকার্যের বর্ণনা করিতে যাইয়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্বাভাবিক হ্রাস-বৃদ্ধি-রূপ কার্যগুলিও যৌবনের অধিপতি কন্দর্পের উপরই আরোপ করিয়াছেন ; যথা,—

মদন কি তাব পহিল পয়চার।
ভিন জনে দেয়ল ভিন অধিকার ॥
কটিক গোরব পাওল নিতম্ব।
ইনকে খীন উনহি অবলম্ব ॥
ইত্যাদি ৫ সং পদ।

সুতরাং কবিতার হিসাবে কন্দর্প কুচ-রূপ ঘট স্থাপন করিলেন, বলিলে যেমন দোষের কারণ হয় না, তেমনি যৌবন লক্ষণ স্তনোদ্‌গমের দ্বারা বক্ষঃ উন্নত করিলেন, বলিলেও কোন দোষ হয় না; প্রকৃতপক্ষে স্তনোদগমে কন্দর্পের কোনও কর্তৃত্ব না থাকিলেও কবি এ স্থলে "অসম্বন্ধে সম্বন্ধ"-রূপ অন্যতম অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের সাহায্যে বক্ষের উচ্চতা বিধান কার্যটিও কন্দর্পেরই কর্তৃত্বের একটা অপূর্ব কার্য বলিয়াই বর্ণিত করিয়াছেন। কন্দর্প (স্তনোদ্‌গম দ্বারা) কিশোর বক্ষঃ উচ্চ করিয়াছেন, ইহা আগে না বলিলে উহার সহিত ঘট-স্থাপন কার্য উৎপ্রেক্ষিত হইতে পারে না। বস্তুতঃ স্তনোস্থাপন ও ঘট্ট-স্থাপন উভয় কার্য কবির কল্পনায় অভিন্ন ও কন্দর্পের অপূর্ব কৃতিত্ব বলিয়া, কবি বলিয়াছেন যে, কন্দর্প (কিশোরীর) বক্ষঃস্থলকে উচ্চ করিয়া (যেমন) ঘট স্থাপন করিলেন।

(৭ সংখ্যক পদ)

নগেন্দ্রবাবুর "দিনে দিনে উন্নত" ইত্যাদি ৭ সং পদটী কাব্যবিশারদের বয়ঃসন্ধির ২ সং পদ বটে। কিন্তু উভয় পদে গুরুতর পাঠবৈষম্য দেখা যায়। নগেন্দ্রবাবু ঐ পাঠবৈষম্যের কোনও উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু করা উচিত ছিল। কাব্যবিশারদের টীকায় এই পদের 'পদামৃত-সমুদ্র' অনুযায়ী যে রূপান্তর উদ্ধৃত হইয়াছে, নগেন্দ্রবাবু তাঁহার সংস্করণে উহাই গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু কাব্যবিশারদের সংস্করণে "দিনে দিনে উন্নত" ইত্যাদি চারিটি পংক্তির পরেই নগেন্দ্রবাবুর গৃহীত "শৈশব ছোড়ল শশিমুখি দেহ" ইত্যাদি বাকি পংক্তিগুলির পবিবর্তে নগেন্দ্রবাবুর ৮ সংখ্যক "পহিল বদরি কুচ পুন নবরঙ্গ" ইত্যাদি সম্পূর্ণ পদটা উক্ত পদের শেষাংশ-রূপে লিখিত হইয়াছে। কাব্য-বিশারদ কোন পুথিতে এরূপ পাঠ-বিন্যাস পাইয়াছেন এবং প্রামাণিক গ্রন্থ 'পদামৃত সমুদ্রে'র প্রমাণের বিরুদ্ধে সেইরূপ পাঠবিন্যাস গ্রহণ করার কি বিশিষ্ট কারণ আছে, সে সম্বন্ধে কিছু লিখেন নাই। অপর কোন অপ্রসিদ্ধ পুথিতে সেরূপ

পদবিন্যাস থাকিলেও আমরা এস্থলে নগেন্দ্রবাবুর গৃহীত 'পদামৃতসমুদ্রে'র পাঠই সমীচীন মনে করি।

নগেন্দ্রবাবু তাঁহার এই পদের ৩য় ছত্রে যে "আবে" পাঠ আছে, উহার স্থলে 'পদামৃতসমুদ্রে' "অবকে" পাঠ দেখা যায়। "আবে" ও "অব" অভিন্নার্থক; হিন্দী বা মৈথিল ভাষায় ছন্দের অনুরোধে দুইটি লঘু মাত্রাবিশিষ্ট "অব" শব্দ দুইটি গুরুমাত্রাত্মক "আবে" রূপে ব্যবহারের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় নাই, সুতরাং এখানে "অবকে" পাঠ করিলে যদিও অর্থ একটু টানিয়া করিতে হয়, তথাপি অগত্যা সেরূপই করিতে হইবে। কাব্যবিশারদের গৃহীত "অবহি" পাঠ অপ্রামাণিক ও ছন্দোদুষ্ট। এখানে চারি মাত্রার প্রয়োজন; "অবহি" তিন মাত্রাত্মক বটে, চারি মাত্রা পূরণের জন্যই নগেন্দ্রবাবুর ঐ অপ্রামাণিক "আবে" পাঠের কল্পনা। যাহা হউক, "অবকে" শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ "এখানকার" অর্থাৎ "এ সময়ের"; এ সময়ের অর্থাৎ এই বয়ঃসন্ধিকালের মদন কিনা এই যৌবন-উদ্‌গম কালের অধিপতি মদন।

নগেন্দ্রবাবুর ১১—১২ পংক্তিদ্বয়ের পাঠ ঃ

তকর আগে তোহর পরসঙ্গ।
বুঝি করব জে নহ কাজ ভঙ্গ॥

'পদামৃতসমুদ্রে' "তকর" "তোহর" "জে" স্থলে যথাক্রমে "তাকর" "তুয়া" ও "যৈছে" পাঠ আছে; আমরা উহাই সঙ্গত মনে করি; কেননা, "তকর" প্রভৃতি পাঠ অপ্রামাণিক ও উহাতে ছন্দোভঙ্গ ও অর্থহানি ঘটে। "তোহর" স্থলে "তুহর" পাঠ কল্পনা করিলেও মাত্রা ও যতি রক্ষিত হয় না; পক্ষান্তরে "তুয়া" (উচ্চারণ—"তুঅ") পাঠ মৈথিল "তুঅ" শব্দের পরিবর্তে বাঙ্গালা পদাবলীতে প্রায় সর্বত্র দৃষ্ট হয়। "জে" পাঠে ছন্দোভঙ্গ না হইলেও অর্থহানি ঘটে; কেননা "যৈছে" অর্থে "জে" (যে) শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় না। এখানে "যৈছে" শব্দের গুরু অক্ষর "যৈ" অন্যান্য বহু স্থলের গুরু অক্ষরের ন্যায় লঘু পড়িতে হইবে; সুতরাং অপ্রামাণিক "জে" পাঠ কল্পনা নিষ্প্রয়োজন। গুরু অক্ষরের লঘু প্রয়োগ যথা ঃ

হরি বড় গরবী গোপ মাঝে বসই।
ঐসে করব যৈসে বৈরি না হসই॥

(নগেন্দ্রবাবুর ৪৬২ সংখ্যক পদ)

এখানে "ঐসে" শব্দের "ঐ" অক্ষর গুরু ও "যৈসে" শব্দের দুইটি অক্ষরই লঘু বটে।

কেবল যে বঙ্গীয় পুথিতে এরূপ তাহা নহে; নগেন্দ্রবাবুর পরম সমাদৃত মৈথিল তালপত্রের পুথিতেও এরূপ বহু প্রয়োগ আছে, যথা—

সুন্দরি বচনে করহ সমধানে।
তোহ সনি নারি দিবস দস অছলিহু
ঐছন উপজু মোহি ভানে॥

(নগেন্দ্রবাবুর ৯১ সংখ্যক পদ)

এখানে "তোহ", "ঐসন" ও "মোহি" শব্দের "তো", "ঐ" ও "মা গুরু অক্ষরগুলি এক মাত্রা পরিমিত লঘু অক্ষররূপে পাঠ না করিয়া গত্যন্তর নাই; সুতরাং পূর্বোক্ত "যৈছে" পাঠের "যৈ" অক্ষর ও শব্দের অন্ত্যস্থিত অধিকাংশ "এ" কারের ন্যায় "যৈছে" শব্দের "ছে" অক্ষর লঘু গণ্য করিয়া "যৈছে" শব্দটীকে দুইটী লঘু মাত্রাত্মকরূপে পড়িবার পক্ষে কোন বাধা দেখা যায় না। সুতরাং ছন্দোভঙ্গের অমূলক আশঙ্কায় নগেন্দ্রবাবু বিদ্যাপতির—

তুহু যৈছে নাগরি কানু রসবন্ত।

(কাব্যবিশারদ ৪৯ পৃঃ)

ইত্যাদি স্থলে যে "তুহু সে নাগরি" ইত্যাদি পাঠ কল্পিত করিয়াছেন, তাহাও এরূপই অপ্রামাণিক ও অসঙ্গত হইয়াছে।

নগেন্দ্রবাবু পূর্বোদ্ধৃত "তকর আগে" ইত্যাদি পংক্তিদ্বয়ের অর্থ লিখিয়াছেন— "তাহার সাক্ষাতে তোমারই কথা (প্রসঙ্গ) হয় (যাহাতে তোমার প্রতি তাহার অনুরাগ জন্মে); বিবেচনা করিয়া (এরূপ) করিব যাহাতে কাজ না ভঙ্গ হয়।" এরূপভাবে টানিয়া অর্থ করিতে যাইয়া নগেন্দ্রবাবুকে "পরসঙ্গ এই কর্তৃপদের ক্রিয়াপদ "হয়" এবং "করব" ক্রিয়ার কর্ম "এরূপ" (?) শব্দ দুইটীর অধ্যাহার করিতে হইয়াছে; কিন্তু তাহাতেও অর্থের অসঙ্গতি ঘটিয়াছে। "পরসঙ্গ" (প্রসঙ্গ) শব্দকে "করব ক্রিয়ার কর্মপদ ধরিলেই সহজে এরূপ অর্থ হয় যে— "তাহার সাক্ষাতে বিবেচনা করিয়া তোমার প্রসঙ্গ করিব— যাহাতে কার্য ভঙ্গ না হয়।" নগেন্দ্রবাবুর প্রতিপাদিত অর্থে প্রথমতঃ তাহার সাক্ষাতে তোমার প্রসঙ্গ করিব, এই অর্থ না বুঝাইয়া সর্বদাই প্রসঙ্গ হয় এই অস্বাভাবিক ও অসঙ্গত অর্থের প্রতীতি হয়; দ্বিতীয়তঃ "করব"

ক্রিয়ার কর্মপদ ধরিলে অন্বয়ে বা অর্থের এরূপ কোন অসঙ্গতি ঘটে না; সুতরাং আমরা সেইরূপ অর্থ করাই সমীচীন মনে করি। পণ্ডিত সমাজে "শিরোবেষ্টনপূর্বক নাসিকাস্পর্শ" বলিয়া যে ব্যর্থ প্রযত্নের একটা উদাহরণ শোনা যায়, এরূপ ব্যাখ্যাও উহারই অন্যতম দৃষ্টান্ত নহে কি?

(৮ সংখ্যক পদ)

নগেন্দ্রবাবুর ৮ সংখ্যক পদের ৪র্থ কলি—

তনু শুক বসন হিরদয় লাগি।
যে পুরুষ দেখব তাকর ভাগি।

নগেন্দ্রবাবু "শুক" শব্দের অর্থ সুকুমার লিখিয়াছেন; কিন্তু এরূপ অর্থ কোনমতেই সিদ্ধ হয় না। কাব্যবিশারদ মহাশয়ের "তনু—সূক্ষ্ম। শুক—বস্ত্রাঞ্চল, অাঁচল" সমর্থনযোগ্য নহে। 'পদরত্নাকর' পুথিতে পাঠ আছে—"তনসুখ বসন তনু হিয় লাগি" ইত্যাদি। 'আইন আকবরী' গ্রন্থে "তন্‌সুক" নামক অতিসূক্ষ্ম এক-প্রকার বস্ত্রের উল্লেখ আছে। এখানে কবি সেই সূক্ষ্ম বসন অর্থেই "তন্‌সুখ" বা "তনসুক" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন বলিয়া অনুমান হয়। তন্‌সুক শব্দের ঠিক ব্যুৎপত্তি অজ্ঞাত "তনু সুখ" বা "তনু (সূক্ষ্ম) অংশুক" শব্দ হইতে সম্ভবতঃ উহার উৎপত্তি হইয়াছে।

(৯ সংখ্যক পদ)

নগেন্দ্রবাবুর সংস্করণের ৯ সংখ্যক "খনে খনে নয়ন কোণ অনুসরই" ইত্যাদি পদের পাঠে ও ব্যাখ্যায় কতকগুলি ভুল আছে; সে সকলের সম্বন্ধে আলোচনা করার পূর্বে আমরা পাঠকবর্গের সুবিধার জন্য 'পদকল্পতরু'র অনুযায়ী সম্পূর্ণ পদটি এখানে অর্থসহ উদ্ধৃত করিব ঃ

"খনে খনে নয়ন-কোণে অনুসরই (১)।
খনে খনে বসন-ধূলি তনু ভরই (২)॥
খনে খনে দশন ছটাছটি (৩) হাস।
খনে খনে অধর আগে করু বাস॥
চৌঙকি (৪) চলয়ে খনে খনে চলু মন্দ (৬)।
মনমথ-পাট পহিল অনুবন্ধ (৭)॥
হৃদয়জ (৮) মকুলিত (৯) হেরি হেরি থোর (১০)।
খনে অাঁচর (১১) দেই খনে হোই ভোর (১২)॥

বালা শৈশবে তারুণ ভেট (১৩)।
লখই না পরিয়ে জেঠ কনেঠ (১৪)॥
বিদ্যাপতি কহ শুন বর কান।
তরুণিম শৈশব চিহ্নই ন জান (১)॥

(১) ক্ষণে ক্ষণে নয়ন-প্রান্ত দ্বারা অনুসরণ করে অর্থাৎ দর্শনীয় ব্যক্তির প্রতি সোজাভাবে না চাহিয়া, সেই ব্যক্তি সম্মুখ হইতে একটু দূরে গেলে পশ্চাদভাগ হইতে তাহার প্রতি বক্রভাবে দৃষ্টিপাত করে। (২) ভরে। (৩) ছড়াছড়ি। (৪) বস্ত্র। (৫) সচকিত ভাবে। (৬) ধীরে। (৭) মন্মথের পাঠ অর্থাৎ শিক্ষা প্রথম আরম্ভ হইল। (৮) স্তন। (৯) মুকুলিত, অঙ্কুরিত। (১০) (হিন্দী 'থোড়া') অল্প। (১১) অঞ্চল। (১২) হোই ভোর—ভুল হয়। (১৩) বালিকা (শ্রীরাধা) শৈশবে তারুণ্য অর্থাৎ যৌবনের সাক্ষাত পাইল। (১৪) (শৈশব ও যৌবনের মধ্যে) জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ লক্ষ্য।

আমরা "বিদ্যাপতি-বিচারের" ভূমিকায় বলিতে ভুলিয়াছি যে, দারভাঙ্গার লাহোরিয়া সরাইর "হিন্দী-পুস্তক-ভাণ্ডার" হইতে কিছুদিন আগে বিদ্যাপতির পদাবলীর একখানা সচিত্র ও সটীক সংক্ষিপ্ত হিন্দী সংস্করণ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামবৃক্ষ শর্মা বেনীপুরী মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। বেনীপুরী মহাশয় তাঁহার ভূমিকায় একস্থলে লিখিয়াছেন—

> বিদ্যাপতি কী ভাষা কী দুর্দশা ভী খুব হুঈ হৈ। বংগালিয়োঁ নে উসে ঠেট্ বঁগলা রূপ দিয়া হৈ, মোরঁগ বাসোঁ নে মোরঁগ কা রং চঢ়ায়া হৈ, বাবু ব্রজনন্দন সহায় জী নে উস্ পর ভোজপুরী কলঈ কী হৈ ঔর আজকল কে মৈথিল উস্ পর মৈথিলী কা রোঁগন্ চঢ়া রহে হৈ! ভগবান্ বিদ্যাপতি কী কোমলকান্ত পদাবলী কী রক্ষা করেঁ।

বেনীপুরী মহাশয়ের এই উক্তি হইতে বুঝা যায় যে, বঙ্গীয় সংস্করণগুলিতে, এমন কি আমাদিগের ভূমিকার উল্লিখিত 'মৈথিল-কোকিল-বিদ্যাপতি' গ্রন্থের সম্পাদক বাবু ব্রজনন্দন সহায় মহাশয়ের হিন্দী সংস্করণেও বিদ্যাপতির পদাবলীর প্রাচীন মৈথিল ভাষার যে দুর্দশা অর্থাৎ বিকৃতি ঘটিয়াছে, তাহা তিনি সাধ্য অনুসারে বিদূরিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বেনীপুরী মহাশয় নিজে বিদ্যাপতির একজন বিশেষজ্ঞ মিথিলাবাসী এবং তাঁহার এই সংস্করণটাও সর্বাপেক্ষা পরবর্তী; সুতরাং বিদ্যাপতির শুদ্ধ পাঠ ও অর্থ বিচারের প্রসঙ্গে তাঁহার মতামতসমূহেরও বিশেষ আলোচনা করা আবশ্যক। তবে কথা এই

যে, বেনীপুরী মহাশয় তাঁহার সংস্করণের প্রারম্ভেই "ধন্যবাদ" হেডিং দিয়া লিখিয়াছেন—

> ইন্ পুস্তক কে পদোঁ কে সংকলন মেঁ মুঝে নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত দ্বারা সম্পাদিত ঔর জষ্টিস্ সারদাচরণ মিত্র দ্বারা প্রকাশিত বঁগ্লা "বিদ্যাপতির পদাবলী" সে অধিক সহায়তা মিলি হৈ, অতঃ ইন সজ্জনোঁ কা মৈঁ অত্যন্ত অনুগ্রহীত হুঁ।

বস্তুতঃ, বেনীপুরী মহাশয় তাঁহার সংস্করণে অধিকাংশ স্থলেই নগেন্দ্রবাবুর ধৃত পাঠ ও অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন; এরূপ স্থলে তাঁহার স্বীকৃত পাঠাদির স্বতন্ত্র উল্লেখ অনাবশ্যক বলিয়া, যেখানে তাহার ধৃত পাঠাদির কোন বিশেষত্ব আছে, কেবল সেখানেই তাহার উল্লেখ করা যাইবে। বেনীপুরী মহাশয়ের সংস্করণে কেবল বিদ্যাপতির ২৯৫টা পদ গৃহীত হইয়াছে। নগেন্দ্রবাবুর বিদ্যাপতির পদসংখ্যা নয় শতের উপরে; সুতরাং বেনীপুরী মহাশয়ের এই সংস্করণ দ্বারা বিদ্যাপতির পদাবলীর বিশুদ্ধ পাঠ ও অর্থাদির মীমাংসার যে বিশেষ সাহায্যের প্রত্যাশা করা যায় না, ইহা বলাই বাহুল্য।

এখন প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক। নগেন্দ্রবাবু ও বেনীপুরীজী —উভয়েই "খনে খনে" স্থলে পাঠ ধরিয়াছেন—"খনে খন"; ব্রজনন্দনবাবুর 'মৈথিল-কোকিল-বিদ্যাপতি' গ্রন্থে আছে—"ছন ছন"। সংস্কৃত "ক্ষ" অক্ষরের অপভ্রংশ হিন্দীতে "ছ" বা "খ" উভয়ই হইতে পারে। সংস্কৃত "লক্ষ্মণ" শব্দের "লছমন" বা "লখন" উভয় রূপান্তরই হিন্দীতে দেখা যায়। "ক্ষণ ক্ষণ" শব্দের "খন খন" বা "ছন ছন" উভয়রূপই সমান শুদ্ধ বটে; সুতরাং বাঙ্গালার প্রাচীন পুথির "খন খন" পাঠ অশুদ্ধ মনে করিয়া "ছন ছন" লিখার সঙ্গত কারণ দেখা যায় না। মৈথিল ভাষায় অনেক স্থলেই "এ"কার হ্রস্বস্বর গণ্য হয়; সুতরাং "খনে খনে" "খেনে খেনে" পাঠ করিলেও "খে" বা "নে" অক্ষর দ্বিমাত্রাত্মক দীর্ঘস্বর না হইয়া, একমাত্রাত্মক হ্রস্বস্বর গণ্য হওয়ায় ছন্দোভঙ্গের আশঙ্কা নাই; সেরূপ আশঙ্কা নিবারণের জন্য পাঠ পরিবর্তন করিতে হইলে, "খনে খন" পাঠ না লিখিয়া, ব্রজনন্দন বাবুর অনুকরণে "খন খন"ই লিখা উচিত ছিল। বস্তুতঃ কালবাচক "বৎসর" "মাস" "দিন" "ক্ষণ" প্রভৃতির বীপ্সা বা বহুত্ব বুঝাইতে অনেক সময়েই বক্তার ইচ্ছা অনুসারে অধিকরণ কারকের বিভক্তির চিহ্ন উহ্য অর্থাৎ অনুক্ত থাকে।

এজন্য "বৎসরে বৎসরে" "দিনে দিনে" "ক্ষণে ক্ষণে" ইত্যাদির পরিবর্তে, "বৎসর বৎসর" "মাস মাস" "দিন দিন" "ক্ষণ ক্ষণ" প্রভৃতির ন্যায় প্রয়োগ সর্বদাই দৃষ্ট হয়। "খনে খন"—এইরূপ প্রয়োগ সম্পূর্ণ নূতন ও অসঙ্গত বটে। হয় "খনে খনে" না হয় "খন খন" লিখুন; কিন্তু মুরারির তৃতীয় পন্থার মত—একটা "খনে খন" রূপান্তরের সৃষ্টি করিয়া কোন ফল দেখা যায় না। "এ"কার যদি হ্রস্বস্বর হইতে পারে, তবে চারিটী হ্রস্বমাত্রাযুক্ত "খেনে খেনে" বা "খনে খনে" পাঠ অশুদ্ধ নহে; আর যদি "এ"কার হ্রস্ব হওয়া সম্ভবপর না হয়, তাহা হইলে "খনে খন" পাঠেও "নে" দীর্ঘ বলিয়া "খনে খন" ১+২+১+১=৫ মাত্রাবিশিষ্ট হওয়ায় ছন্দোভঙ্গ অপরিহার্য হইয়া পড়ে। কাল্পনিক ছন্দোভঙ্গ নিবারণের জন্য এরূপ ব্যর্থ ও অনাবশ্যক প্রয়াসের অসংখ্য উদাহরণ নগেন্দ্রবাবুর সংস্করণে বিদ্যমান; আমরা এখানে ইহার আর একটা বিশেষ প্রসিদ্ধ উদাহরণ দেখাইয়াই ক্ষান্ত হইব। সকল উদাহরণ দেখাইতে হইলে, কেবল উহাতেই এক একটা বড় প্রবন্ধ পূর্ণ করা যাইতে পারে।

মহাকবি বিদ্যাপতির রচিত শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগের একটা বিখ্যাত পদ

যাহাঁ যাহাঁ পদ-যুগ ধরই।
তহিঁ তহিঁ সরুহ ভরই।। ইত্যাদি

সংস্কৃত "যত্র" ও "তত্র" শব্দের রূপ প্রাকৃত ভাষায় "যৎথ" ও "তৎথ" হইয়া থাকে; উহা হইতেই হিন্দী ও মৈথিল ভাষার "জহাঁ" ও "তহাঁ" শব্দের উদ্ভব হইয়াছে। "জহাঁ" ও "তহাঁ" ১+২+৩ মাত্রাবিশিষ্ট বটে; কিন্তু বিদ্যাপতির এই পদে ও অন্যান্য পদে "যাহাঁ" (জাহাঁ) ও "তাহাঁ"—শব্দ দুইটি লঘুমাত্রাবিশিষ্ট গণ্য না করিলে ছন্দ বজায় থাকে না। বাঙ্গালা "অ"কারের উচ্চারণ হিন্দী ও মৈথিলীর "অ"কারের মত নহে। হিন্দী ও মৈথিলী ভাষায় "জহ" ও "তহ" অনেকটা বাঙ্গালা "জাহা" "তাহা" শব্দের মতই শুনায়; কেননা, বাঙ্গালায় "আ" স্বরযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ প্রায় সর্বত্রই হ্রস্ববর্ণরূপে উচ্চারিত হয়। পক্ষান্তরে বাঙ্গালায় "জহ" ও "তহ" লিখিলে, কতকটা ইংরেজী Joho ও Toho শব্দের মতই পঠিত হয়। এজন্য হিন্দী ও মৈথিলীর "জহঁ" ও "তহঁ" শব্দের কাছাকাছি ঠিক উচ্চারণটা বুঝাইতে হইলে বাঙ্গালায় "জাহাঁ" ও "তাহাঁ" না লিখিয়া গত্যন্তর নাই। তাই বাঙ্গালার সকল প্রাচীন হস্তলিখিত পুথিতেই এ স্থলে—

যাহাঁ যাহাঁ পদ-যুগ ধরই।
তাহাঁ তাহাঁ সররুহ ভরই ॥

ইত্যাদি পাঠ গৃহীত হইয়াছে। নগেন্দ্রবাবু অথবা তাঁহার উপদেষ্টা মৈথিল পণ্ডিত কিন্তু এস্থলে মহা সমস্যায় পড়িয়া গিয়াছেন। তাঁহারা জানেন যে, "জাহাঁ" "তাহাঁ" শব্দ দুইটী বিশুদ্ধ হিন্দী বা মৈথিল শব্দ নহে,—"যহাঁ" ও "তহাঁ"ই শুদ্ধ বটে; সুতরাং তাঁহারা ছন্দের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত না করিয়া, পাঠ ধরিয়াছেন —

যহাঁ যহাঁ পদযুগ ধরই।
তহিঁ তহিঁ সররুহ ভরই ॥ ইত্যাদি

বলা বাহুল্য হিন্দীর রীতি অনুসারে লিখিত হইলে, এখানে লিখিতে হইবে "জহঁ জহঁ পদযুগ ধরই" ইত্যাদি; আর বাঙ্গালার রীতি অনুসারে লিখিত হইবে— "যাহাঁ যাহাঁ (কিম্বা "জাহাঁ জাহাঁ") পদযুগ ধরই"; কিন্তু মুরারির তৃতীয় পন্থা অবলম্বন করিয়া, "যহাঁ যহাঁ" ইত্যাদি পাঠ গ্রহণ করা কোন প্রকারেই সঙ্গত হইতে পারে না। কেননা, সেরূপ করিলে অভীষ্ট চারি মাত্রার স্থলে "যহাঁ যহাঁ" শব্দ দুইটি ছয় মাত্রাবিশিষ্ট হইয়া পড়ে। সুখের বিষয় যে, ব্রজনন্দনবাবু এখানে "জহঁ জহঁ পদযুগ ধরই" ইত্যাদি পাঠই গ্রহণ করিয়াছেন। আধুনিক প্রয়োগের অনুরোধে "জহাঁ তহাঁ" লিখিয়া ছন্দোভঙ্গ ঘটান নাই।

"খনে খনে দশন ছটাছুটি হাস"—'পদকল্পতরু'র এই পাঠের পরিবর্তে 'পদরসসার' পুথিতে "খনে খনে দশন ছুটি অটহাস" পাঠ আছে; 'পদামৃত সমুদ্রে'র মুদ্রিত গ্রন্থে "দশন ছটাছুটি হাস" পাঠ থাকিলেও আমাদের অনুমান হয় যে, "খনে খনে দশন ছুটী অটহাস" পাঠই ঐ গ্রন্থের সঙ্কলয়িতা রাধামোহন ঠাকুর মহোদয়ের স্বীকৃত; কেননা, তিনি "খনে খনে" ইত্যাদি পংক্তি দুইটীর অর্থ লিখিয়াছেন "দ্বিতীয় শ্লোকস্য প্রথমার্দ্ধে অট্টহাসাদিনা বাল্যস্য প্রাবল্যং পরার্দ্ধে বস্ত্রেণ মুখাবরণেন কৈশোরস্য প্রাবল্যং সূচিতং।" অর্থাৎ দ্বিতীয় শ্লোকের প্রথমার্দ্ধে "অট্টহাস" ইত্যাদি দ্বারা বাল্যভাবের প্রবলতা এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধে বস্ত্রে মুখাবরণদ্বারা কৈশোরভাবের প্রবলতা ব্যঞ্জিত হইয়াছে। কাব্যবিশারদ মহাশয় 'পদকল্পতরু'র পাঠ গ্রহণ করিয়া "দশন ছটাছট" শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন— "দশন ছটার (সমূহের) ছটা (দীপ্তি) আছে" যাহাতে নগেন্দ্রবাবু

খনে খন দশন ছটা ছুট হাস।
খনে খন অধর আগে গহ বাস ॥

এইরূপ পাঠ গ্রহণ করিয়া উহার টীকায় লিখিয়াছেন — "৩। ছুট—ছোটে, যুক্ত হয় (প্রকাশ পায়)। বঙ্গদেশের বিকৃত পাঠ — ছটাছট। ।৪। গহু-গ্রহণ করে। অধরের আগে (সম্মুখে) বাস গ্রহণ করে (মুখে কাপড় দেয়)।" বেনীপুরী মহাশয় নগেন্দ্রবাবুর ধৃত পাঠই গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু টীকায় যে জন্যই হউক "গহু" এই দুর্বোধ্য ও সন্দিগ্ধ শব্দটার অর্থ লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। ব্রজনন্দনবাবুর "দশন ছটাছুট হাস" পাঠ ধরিলেও "গহু" স্থলে 'পদকল্পতরু'র "করু" পাঠের অনুযায়ী "কর" পাঠই গ্রহণ করিয়াছেন। কাব্যবিশারদ মহাশয় টীকায় লিখিয়াছেন—"আচা করু বাস", "আগে গহু বাস" এরূপ পাঠও দৃষ্ট হয়। তাহা হইলে, গহু—গেল ; আচা—আচ্ছাদন, বাস—বস্ত্র।"

এই সকল পাঠভেদ ও উহাদের পূর্বোক্ত অর্থ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আমাদের ধারণা জন্মিয়াছে যে, নগেন্দ্রবাবুর ধৃত "দশন ছটাছুট হাস" পাঠ অমূলক ও কল্পিত বটে। ঐরূপ পাঠ বঙ্গীয় কোন পুথিতেই দেখা যায় না। মিথিলার কোন পুথিতে এই পদটী পাওয়া যায় নাই ; সুতরাং বঙ্গীয় পুথির পাঠই এখানে মান্য করিতে হইবে। আমরা স্বীকার করি যে, কাব্য বিশারদের প্রতিপাদিত অর্থ কষ্টকল্পিত বটে—কিন্তু 'পদরসসার' ও 'পদামৃত-সমুদ্রের' "দশন ছুটী (অথবা "ছুটে") অটহাস" পাঠ গ্রহণ করিলে ছন্দ কিংবা অর্থের কোন অসঙ্গতি ঘটে না ; সুতরাং আমাদিগের বিবেচনায় যদি 'পদ-কল্পতরু'র পাঠ বিকৃত বলিয়াও তর্কস্থলে স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি ও আচার্য রাধামোহন ঠাকুরের সমাদৃত পূর্বোক্ত পাঠ ও অর্থ তুচ্ছ করা যায় না। 'পদকল্পতরু'র "খনে খনে দশন ছটাছটি হাস" পাঠের সোজা অর্থ—ক্ষণে ক্ষণে (শ্রীরাধার) দন্তরাজিতে ছড়াছড়ি হাসি (দেখা যায়)। সংস্কৃত "অট্টহাস্য" বা উহার অপভ্রংশ "অটহাস" শব্দের ব্যবহার চলিত হিন্দী, মৈথিলী বা বাঙ্গালায় আছে বলিয়া জানা যায় না ; কিন্তু হাসির ছড়াছড়ি কথাটা বাঙ্গালায় অতি প্রসিদ্ধ বটে। এই পদটা আদৌ বিদ্যাপতির রচিত কিনা, সে বিষয়েও আমাদের বিশেষ সন্দেহ আছে। রাধামোহন ঠাকুরের অপেক্ষাও বহু প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি ও আচার্য বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ওরফে পদকর্তা হরিবল্লভ মহোদয়ের সংকলিত 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি' নামক প্রসিদ্ধ পদ-সংগ্রহ গ্রন্থে উদ্ধৃত পদটীর ভণিতার কলির পরিবর্তে নিম্নলিখিত কলিগুলি দৃষ্ট হয়, যথা—

দূতি সেয়ানি করহ সোই ঠাট।
পণ্ডিত হাম পঢ়ায়ব পাঠ ।।
চেতন মঝু ঋষ-কেতন-তন্ত্র ।
অবগহি লেঙ শিখাঙ রস-মন্ত্র ।।
আপন তন-কাঞ্চন হমে দেই ।
যতনহি প্রেমরতন ভরি লেই ।।
বিদ্যাবল্লভ ইহ আজীব ।
ইহ বিনু দুহুক জীউ ন জীব ।।

"বিদ্যাবল্লভ" ভণিতার অন্য কোন পদ পাওয়া যায় নাই। এই বিদ্যা-বল্লভ আর যিনিই হউন না কেন, তিনি যে বিদ্যাপতি নহেন, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। উপরে উদ্ধৃত পংক্তিগুলিতে সংস্কৃত শব্দের ও অলঙ্কারের বাহুল্য হরিবল্লভ অর্থাৎ চক্রবর্তীপাদের রচনার সহিত সৌসাদৃশ্যযুক্ত; আমাদের অনুমান হয় যে হরিবল্লভ পাঠে ছন্দোপতন অনিবার্য বলিয়া এবং বক্ষ্যমাণ বিশেষ কারণবশতঃ পদকর্তা এখানে "হরিবল্লভ" বা "বল্লভ" নামের পরিবর্তে "বিদ্যা-বল্লভ" নাম প্রয়োগ করিয়াছেন; "হরিবল্লভ" যিনি হইবেন, তিনি "অবিদ্যা-বিদ্বেষী" এবং "বিদ্যাবল্লভ" না হইয়া পারেন না; সুতরাং এই হিসাবে "হরিবল্লভ" নামের পরিবর্তে "বিদ্যাবল্লভ" নাম অপ্রযোজ্য নহে; তদ্‌ভিন্ন "ঋষ-কেতন-তন্ত্র" ইত্যাদি দ্বারা পদকর্তা যে কামশাস্ত্রবিদ্যার উল্লেখ করিয়াছেন, উহা সখীস্থানীয় পদকর্তার যে "আজীব" অর্থাৎ জীবন উপায় সে বিষয়েও একটা প্রমাণ দেওয়া আবশ্যক; পদকর্তা নিজকে "বিদ্যাবল্লভ" নামে অভিহিত করিয়া "কাব্যলিঙ্গ"-অলঙ্কারের সাহায্যেই বুঝাইতেছেন যে, যেহেতু তিনি বিদ্যাবল্লভ সেই জন্য নিতান্ত প্রীতিজনক বর্ণিত কামশাস্ত্রবিদ্যা তাঁহার প্রিয় উপজীব্য অর্থাৎ জীবনাবলম্বন বটে; কেননা ইহা ব্যতীত শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়ের জীবনরক্ষা হয় না, সুতরাং ঐ বিদ্যার অভ্যাস না করিলে সখীস্থানীয় পদকর্তা এই বিদ্যাবল্লভের ও তাহার প্রিয় কর্তব্য যুগলের সেবাকার্য সুসম্পন্ন হইতে পারে না। এখন বিচার্য এই যে এ কলিগুলি "খনে খনে" ইত্যাদি পদের রচয়িতারই রচিত কিনা অথবা অন্য কাহারও দ্বারা পরে সংযোজিত হইয়াছে? একটু প্রণিধান করিলেই বুঝা যাইবে যে, কি ভাষা, কি ভাব, কোন দিক দিয়া দেখিলেই এই পংক্তিগুলির সহিত পূর্বোদ্ধৃত পদের সামঞ্জস্য দেখা যায় না।

পূর্বোদ্ধৃত পদ শ্রীকৃষ্ণের আপ্ত-দূতীর উক্তি ; কিন্তু এই শেষোক্ত পংক্তিগুলি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি বলিয়া স্বীকার না করিলে, অর্থের সুসঙ্গতি হয় না। দেবকী-নন্দন যন্ত্রালয় হইতে প্রকাশিত 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি' গ্রন্থের সটীক সুবৃহৎ সংস্করণের সুবিজ্ঞ সম্পাদক মহাশয় এই পংক্তিগুলি দূতীরই সপরিহাস বাক্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন ; কিন্তু "দূতী সেয়ানি করহ সোই ঠাট। পণ্ডিত হাম পঢ়ায়ব পাঠ ॥" অর্থাৎ হে চতুরে দূতি! সেই আয়োজন কর, পণ্ডিত আমি (শ্রীরাধাকে) মীনকেতনতন্ত্র অর্থাৎ কামশাস্ত্রের পাঠ পড়াইব, এই উক্তির অক্ষর কিংবা অর্থ, কিছুতেই ইহা দূতীর বাক্য বলিয়া মনে করা যায় না। উক্ত সম্পাদক মহাশয় এই পদের মন্তব্যে লিখিয়াছেন—"কোন লিপিকারকের অনবধানতা কি অন্য কোন কারণে দুইটা স্বতন্ত্র পদ একত্র হইয়া গিয়াছে কিনা বিবেচ্য।" আমরা তাঁহার এই মন্তব্যের সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। আমাদেরও অনুমান হয়, "খনে খনে" ইত্যাদি 'পদকল্পতরু'র পদে পূর্বে কোন ভণিতা না থাকায় "বিদ্যাবল্লভ" বা "হরিবল্লভ" যিনিই হউন শেষোক্ত পংক্তিগুলির যোগ করিয়া এই পদটা সম্পূর্ণ করিয়া থাকিবেন। বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত কলিটা কোন পুথিতে পাইলে, তাহা লুপ্ত করিয়া এভাবে স্বীয় নামাঙ্কিত ভণিতার সংযোগ পরস্বাপহরণেরই প্রকারান্তর বটে। কোন বৈষ্ণব পদকর্তাই সেরূপ অপকার্য করিতে পারেন না। সুতরাং 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি' গ্রন্থের সঙ্কলন সময়ে অর্থাৎ 'পদকল্পতরু'রও প্রায় একশত বৎসর পূর্বে এই পদে যে বিদ্যাপতির ভণিতা ছিল না, ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। ভণিতা না পাওয়া গেলেও পদটা যে অন্যের রচিত, তাহাতে তো সন্দেহ নাই ; এরূপ অবস্থায় বিদ্যাপতির পদের লুপ্ত অংশের পূরণ করিতে যাইয়া গোবিন্দদাস স্বরচিত ভণিতায় বিদ্যাপতির নামের পরে নিজের নাম সংযুক্ত করিয়াছেন। এই পদটা বিদ্যাপতির বলিয়া জানিতে পারিলে 'গীতচিন্তামণি'র পদকর্তাও বোধ হয় সেরূপ করিতেন, কিন্তু পদের রচয়িতার স্থিরতা না থাকায়, তাঁহার নাম উল্লেখ করিতে পারেন নাই ; অথচ স্বরচিত পংক্তিগুলি অপরের রচিত পদের সহিত মিশাইয়া দিয়া শেষে নিজের নাম যোগ করিলে, তাহাও পরস্বগ্রহণ বলিয়া গর্হিত কার্য হইবে বিবেচনায়, নিজের প্রকৃত নাম "হরিবল্লভ" "রাধাবল্লভ" যাহাই থাকুক না কেন, উহা না লিখিয়া, পূর্ব-ব্যাখ্যাত তাৎপর্য বুঝাইবার ও নিজকে পরস্বাপহরণ পাপ হইতে রক্ষা করার অভিপ্রায়েই ভণিতায় এই

কল্পিত ধ্বনিগর্ভ নামের ব্যবহার করিয়াছেন, এরূপ প্রতীতি হয়। সে যাহা হউক, সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি ও পদকর্তা চক্রবর্তীপাদ যে পদটাকে বিদ্যাপতির ভণিতাহীন অবস্থায় পাইয়াছেন, উহা প্রকৃতপক্ষেই বিদ্যাপতির রচনা কিনা, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ আছে, ইহা বলাই বাহুল্য।

নগেন্দ্রবাবু পদটীকায় 'গীতচিন্তামণি'র উক্ত কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতে যাইয়া, "ঋষকেতন তন্ত্র", "লেং" ও "শিখাং" স্থলে যথাক্রমে "ঋষকেতন মন্দ" "লেই" ও "শিখাও"—এই অর্থহীন অপ্রামাণিক পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন এবং "আজীব"—এই সংস্কৃত শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—"আজীব-কহে।" তিনি একখানা ভাল অভিধান দেখিলেই জানিতে পারিতেন যে, "আজীব" শব্দ কোন ক্রিয়াপদ নহে; ইহা একটী সংজ্ঞা; ইহার অর্থ—জীবনোপায় বা জীবনের অবলম্বন।

নগেন্দ্রবাবুর সংস্করণে "চৌংকি" ও "হৃদয়জ মকুলিত" স্থলে যথাক্রমে "চউকি" ও "হৃদয় মুকুলি" পাঠ গৃহীত হইয়াছে। "চউকি" পাঠ অপ্রামাণিক ও অর্থশূন্য। "চেঁংকি" বা "চেঁকি" শুদ্ধ পাঠ বটে।

"হৃদয় মুকুলি" পাঠ ছন্দোভঙ্গদুষ্ট ও অর্থশূন্য। নগেন্দ্রবাবু উহার কাল্পনিক অর্থ লিখিয়াছেন—"হৃদয়জাত মুকুল (পয়োধর)।" বস্তুতঃ "হৃদয়জ" "উরোজ" "বক্ষোজ" প্রভৃতি শব্দ স্তন অর্থে প্রসিদ্ধ। "মকুলিত" বা "মুকুলিত" শব্দের অর্থ—"অঙ্কুরিত"। সুতরাং "হৃদয়জ মুকুলিত" ইত্যাদি বাক্যের অর্থ বক্ষে স্তন অঙ্কুরিত দেখিয়া কখনও উহা অঞ্চল দ্বারা আবৃত করেন, আর কখনও (উহাতে) ভুল হয় অর্থাৎ স্তন আবৃত করিতে ভুলিয়া যান।

নগেন্দ্রবাবু "বালা শৈশব তারুণ ভেট" পাঠ ধরিয়া অর্থ লিখিয়াছেন—"বালিকায় শৈশব (ও) যৌবনের সাক্ষাৎ হইয়াছে।" এরূপ অর্থ করিলে "বাল" শব্দের পরে অধিকরণ কারকে সপ্তমী বিভক্তির চিহ্ন, "ও" শব্দ এবং "হইয়াছে" ক্রিয়াপদ এই তিনটী উহ্য করিতে হয়। আমাদের উদ্ধৃত পাঠে কোন উহ্য না করিলেও চলে। "ভেট" শব্দটা সাক্ষাৎ করা অর্থে ক্রিয়াপদ রূপেও ব্যবহৃত দেখা যায়, যথা—"ভেটিল" "ভেটিলাম" ইত্যাদি। সুতরাং "শৈশবে" বা "শৈশব" যাহাই পাঠ হউক না কেন, এই বাক্যের সহজ ও সরল অর্থ—বালা (শ্রীরাধা) শৈশব অবস্থায় যৌবনের সাক্ষাৎ পাইলেন। বলা বাহুল্য যে "শৈশবে" পাঠই অপেক্ষাকৃত সমীচীন বটে; কেননা বালা শ্রীরাধার শৈশব অবস্থা তো পূর্ব হইতেই চলিতেছে; সুতরাং যৌবনের সঙ্গে

সঙ্গে শৈশবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল, একথা বলা সঙ্গত হইতে পারে না ; এজন্য 'পদকল্পতরু'র পাঁচখানা হস্তলিখিত পুথিতে "শৈশব" পাঠ থাকিলেও আমরা 'পদরসসার' ও 'পদরত্নাকর' পুথি অনুসারে আমাদিগের সম্পাদিত সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণে "শৈশবে" পাঠই গ্রহণ করিয়াছি ; উহাই নির্দোষ মনে হয় ।

(১০ সংখ্যক পদ)

নগেন্দ্রবাবু "না রহে গুরুজন মাঝে" ইত্যাদি পদটীর যে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহাতেও অনেক ভুল আছে ; সে সম্বন্ধে আলোচনা করার পূর্বে আমরা ঐ পদটীর শুদ্ধ পাঠ নিম্নে উদ্ধৃত করিব । এই পদটী 'পদামৃত-সমুদ্র' ও 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি' উভয় গ্রন্থেই আছে । মুদ্রিত 'পদামৃতসমুদ্রে'র মূলের ধৃত পাঠের সহিত স্থানে স্থানে রাধামোহন ঠাকুর মহোদয়ের সংস্কৃত টীকার অনৈক্য দেখা যায় । বলা বাহুল্য যে, এরূপ স্থলে টীকানুযায়ী পাঠই নির্ভরযোগ্য বটে । 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি'র পাঠও প্রায় 'পদামৃতসমুদ্রে'র অনুরূপ ; যেখানে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে, আমরা পরে উহার উল্লেখ করিব । এখানে 'পদামৃতসমুদ্রে'র সমাদৃত পাঠই উদ্ধৃত হইল ।

না রহে গুরুজন মাঝে ।
বেকত (১) অঙ্গ ন ছাপাওই (২) লাজে ॥
বালিক (৩) সঙ্গে যব রহই (৪) ।
তরুণি (৫) পাই পরিহাস তহিঁ (৬) করই ॥
মাধব !—তুঅ লাগি (৭) ভেটলুঁ (৮) রমণী ।
কো কহু (৯) বালা কো কহু তরুণী ॥ ধ্রু ॥
কেলি-রভস যব শুনে ।
আনত (১০) হেরি ততহিঁ (১১) দেই কাণে ॥
ইথে কোই করু (১২) পরচারি (১৩) ।
কাঁদন মাখি (১৪) হাসি দেই গারি (১৫) ॥
সুকবি বিদ্যাপতি ভাণে (১৬) ।
বালা-চরিত রসিক পুন জানে ॥

---

(১) ব্যক্ত, অনাচ্ছাদিত । (২) অনাচ্ছাদিত করে । (৩) বালিকা । (৪) রহে । (৫) তরুণী, যুবতী । (৬) সেখানে । (৭) তোমার লাগিয়া । (৮) সাক্ষাৎ করিলাম । (৯) কহে । (১০) অন্যত্র । (১১) সেই স্থানে । (১২) করে । (১৩) প্রচার, প্রকাশ । (১৪) মিশাইয়া । (১৫) গালি । (১৬) কহে ।

'গীতচিন্তামণি'তে "বালিক সঙ্গে" ইত্যাদি কলির পরিবর্তে পাঠ আছে—

বালা-জন সঞে বাসে।
তরুণী পাই তাহি পরিহাসে॥

"রহই" বা "বসই" ক্রিয়াপদের অর্থে "বাসে" ক্রিয়াপদের প্রয়োগ পদাবলী-সাহিত্যে দেখা যায় না; সুতরাং "বাসে" পাঠ লইলে, উহার অর্থ "গৃহে" ধরিয়া "রহই" ক্রিয়াপদটি উহ্য করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। তদপেক্ষা 'পদামৃতসমুদ্রে'র পাঠই ভাল মনে হয়। যাহা হউক, প্রথমেই পদটির ছন্দ লক্ষ্য করার যোগ্য, কেননা ইহার অযুগ্ম চরণগুলি (কেবল ধ্রুব-কলি ব্যতীত) বারো মাত্রায় এবং যুগ্ম চরণগুলি ষোল মাত্রায় গঠিত বটে। ধ্রুব-কলির উভয় চরণেই ষোল মাত্রা আছে। নগেন্দ্রবাবুর কেবল ভণিতার কলিতে এই মাত্রা-বিভাগ বজায় আছে, কিন্তু অন্যান্য কলিতে জানি না কি জন্য তিনি ষোল মাত্রার পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন, যথা—

খন ভরি নহি রহ গুরুজন মাঝ। (১ম চরণ)
বালা জন সঙ্গে সব রহই। (৩য় চরণ)
কেলিক রভস যব শুনে আনে। (৭ম চরণ)
ইথে যদি কেও করএ পরচারী। (৯ম চরণ)

অধিকাংশ পদেই ধ্রুব-কলির গঠনে অন্যান্য কলি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্রতা দেখা যায়; সুতরাং আলোচ্য পদেরও ৫ম চরণে "মাধব"—এই প্রয়োজনী সম্বোধন-পদটী থাকায় বারো মাত্রা স্থলে ষোল মাত্রা হইয়াছে বলিয়া কোন দোষের কারণ হয় নাই; কিন্তু এই পদের ভণিতার কলির প্রথম চরণটী সর্ববাদিসম্মত রূপে বারো মাত্রাবিশিষ্ট হওয়া সত্ত্বে অযুগ্ম ১ম, ৩য়, ৭ম ও ৯ম চরণগুলি ষোল মাত্রাত্মক হওয়ার কোন সঙ্গত কারণ দেখা যায় না; সুতরাং নগেন্দ্রবাবু যে জন্যই উক্ত অযুগ্ম চরণগুলিতে ষোল মাত্রার পাঠ গ্রহণ করিয়া থাকেন না কেন ঐরূপ পাঠ যে অশুদ্ধ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অর্থের বিচার দ্বারাও নগেন্দ্রবাবুর ঐ পাঠ সমীচীন মনে হয় না। নগেন্দ্রবাবু তাঁহার "খন ভরি নহি রহ" ইত্যাদি চরণের টীকায় লিখিয়াছেন—"ক্ষণকালও গুরুজনের মধ্যে থাকেনা (তাঁহাদিগের সাক্ষাতে অধিক সম্ভ্রম করিতে হয়)।" বস্তুতঃ যৌবনের প্রারম্ভে বালক ও বালিকাদের সম্ভ্রমবোধ জন্মিলে উহারা গুরুজনের সাক্ষাতে কতকটা সঙ্কুচিতভাবে থাকা অপেক্ষা সমবয়সীদিগের সঙ্গেই যে থাকিতে অধিক ভালবাসে ইহা সত্য কথা। সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন কবি প্রথমেই যৌবনোদয়ের এই বিচিত্র

স্বভাবের বর্ণনা দ্বারা ইহাই বুঝাইয়াছেন যে, শ্রীরাধার চরিত্রে তখন পর্যন্ত বালিকাস্বভাব বর্তমান থাকিলেও যৌবনধর্ম লজ্জা ও সঙ্কোচেরই কিঞ্চিৎ প্রাবল্য ঘটিয়াছে। শ্রীরাধা এখন পার্যমাণে অধিক সময় গুরুজনের নিকট থাকিতে চাহেন না; ফাঁক পাইলেই সমবয়সী সখীদের সহিত যাইয়া মিলিত হন—ইহা বলাই কবির অভিপ্রেত বটে; তাই তিনি "না রহে গুরুজন মাঝে"—এই সাধারণ উক্তি দ্বারা সেই কথাটা বুঝাইয়াছেন। "খন ভরি নহি রহ" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা এ সাধারণ উক্তিটার উপর জোর দিয়া, শ্রীরাধা ক্ষণকালও গুরুজনের নিকটে থাকেন না বলিলে, উহা দ্বারা গুরুজনের প্রতি শ্রীরাধার অনাদর ও কর্তব্যনিষ্ঠার অভাবই বুঝাইয়া থাকে; সুতরাং রমণীরত্ন শ্রীরাধার সম্বন্ধে তাদৃশ উক্তি কখনই প্রযোজ্য হইতে পারে না। নগেন্দ্রবাবু তাঁহার "কেলিক রভস" ইত্যাদি চরণের "আনে" শব্দটীর টীকা করিয়াছেন—"আনে—অপরের নিকট।" "আনে" শব্দের এরূপ অর্থও সমীচীন মনে হয় না। কেলি-রহস্যের কথা যখন শোনে—ইহা বলিলেই অন্যের নিকট হইতে শোনা বুঝা যায়। এরূপ স্থলে—"আখ্যাতোপযোগে" এই প্রসিদ্ধ সূত্র অনুসারে, যাহার নিকট হইতে কিছু শোনা যায়, তাহার পরে অপাদান কারকে পঞ্চমী বিভক্তি না হইয়া অধিকরণ কারকে "এ" বিভক্তি প্রয়োগ সঙ্গত হইতে পারে না। পদাবলী-সাহিত্যে কর্তৃকারকে, কর্মকারকে বা অধিকরণ কারকেই "আনে" পদটীর প্রয়োগ দেখা যায়; অপাদান কারকে "অন্যের নিকট হইতে" অর্থ বুঝাইতে "আনে" পদের প্রয়োগ দেখা যায় না; এবং সেরূপ প্রয়োগ কোনরূপেই সমর্থনযোগ্য হইতে পারে না। নগেন্দ্রবাবু "বালাজন" ইত্যাদি কলিটীর অর্থ কাব্যবিশারদের অনুকরণে লিখিয়াছেন "৪। তহি—সেইজন্য অতএব। ৩-৪ যখন বালিকাদিগের সঙ্গে থাকে তাঁহারা (তাহাকে) তরুণী পাইয়া (মনে করিয়া) সেই কারণে পরিহাস করে।" এরূপ অর্থও সমীচীন নহে। বালিকারা তাহাদের ক্রীড়ার সাথী শ্রীরাধাকে তরুণী বলিয়া মনে করার বিশেষতঃ সেজন্য তাঁহার প্রতি অধিক সম্ভ্রম না দেখাইয়া, বেয়াদবিসূচক ঠাট্টা-পরিহাস করার কোন কারণ নাই। মহাকবি বিদ্যাপতি যে এরূপ একটা অস্বাভাবিক বর্ণনা করিবেন, ইহা কিছুতেই সম্ভবপর মনে হয় না। বৈষ্ণব মহাজন প্রসিদ্ধ রাধামোহন ঠাকুর মহোদয় তাঁহার সংস্কৃত টীকায় এই কলিটীর তাৎপর্যব্যাখ্যা করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন "বালিকা সঙ্গেন বাল্যং সূচিতং। তরুণ্যা সহ পরিহাসঃ বাল্যোপমর্দ্দকঃ।"

ইহাদ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, অন্যান্য কলির ন্যায় এই কলিটীতেও কবি যুগপৎ শ্রীরাধার বাল্য ও যৌবনের স্বভাব বর্ণন করিতেছেন। বালিকাদের সঙ্গে অবস্থান দ্বারা তাঁহার বালিকাস্বভাব এবং দৈবাৎ কোন যুবতীকে পাইয়া তাঁহার সহিত পরিহাস-আলাপ দ্বারা তাঁহার বাল্যভাবের বিরোধী (উপমর্দক) যৌবনস্বভাব জানা যাইতেছে। সুতরাং "পরিহাস করে" ক্রিয়ার কর্ত্রী বালিকাগণ নহে কিন্তু শ্রীরাধা বটে। তিনি যখন বালিকাদের মধ্যে থাকেন, তখনও দৈবাৎ কোন তরুণীকে নিকটে পাইলে রসালাপের লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, সেখানে পরিহাস করিয়া থাকেন ইহাই এই বাক্যের সঙ্গত ও স্বাভাবিক অর্থ বটে। সার গ্রীয়ারসন্ সাহেব মহোদয়ের Maithili Chrestomathy গ্রন্থের শব্দকোষে "তহিঁ" শব্দের অর্থ therefore লিখিত হইয়াছে। এখানে "তহিঁ" নগেন্দ্রবাবুর সংস্করণে ("তহিঁ") পাঠ আছে "তহি" নহে; সুতরাং, উহার অর্থ "সেইজন্য, অতএব" সঙ্গত মনে হয় না। "তহাঁ" "তাহাঁ" ও "তহি" শব্দের প্রয়োগ পদাবলীতে সর্বত্রই পাওয়া যায়। উহাদের অর্থ সেখানে, তথায়। সংস্কৃত "তত্র" (প্রাকৃত তৎথ) শব্দের অপভ্রংশ হইতে "তহাঁ" ইত্যাদি শব্দগুলির উদ্ভব হইয়াছে। গ্রীয়ারসন্ মহোদয়ের লিখিত "তহি" শব্দটীর সহিত বাঙ্গালা তাই (সেজন্য) তুলনীয়। বোধহয় সংস্কৃত "তৎ-হি" হইতেই অপভ্রংশ "তা-হি" "তা-ই" "তহি" শব্দগুলির উৎপত্তি হইয়াছে। "তহি" ও "তহিঁ" শব্দদ্বয়ের রূপ প্রায় এক প্রকার; সুতরাং শব্দ দুইটীর মধ্যে গোলযোগ হওয়া খুব স্বাভাবিক বটে।

রাধামোহন ঠাকুর তাঁহার সংস্কৃত টীকায় এই পদটীর তাৎপর্য যেমন সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, অন্য কোন টীকায়ই সেরূপ দেখা যায় না। আমরা কৌতূহলী পাঠকদিগের প্রীতির জন্য রাধামোহন ঠাকুরের ব্যাখ্যাত আভাষ ও শেষ তিনটী অপূর্ব কলির টীকা এখানে উদ্ধৃত করার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। রাধামোহন ঠাকুর আপ্ত-দূতীর উক্তি "শৈশব যৌব দরশন ভেল। দুহুঁ দলবলে ধনি দ্বন্দ্ব পরি গেল॥" ইত্যাদি পদে শ্রীরাধার শৈশব ও যৌবনের মধ্যে বাল্যেরই প্রাবল্য প্রদর্শিত করিয়া তৎপরে উদ্ধৃত "না রহে গুরুজন মাঝে" ইত্যাদি পদটির তাৎপর্য বুঝাইতে যাইয়া লিখিয়াছেন—

> ইতি শ্রুত্বা ত্বয়া তস্যা বাল্যাধিক্যং কথিতং তদা কথং তন্নামশ্রবণং কারয়িত্বা মাং পীড়য়সীতি দৃগ্‌ভঙ্গ্যা স্ববৈবশ্যমুক্তবন্তং শ্রীকৃষ্ণং জ্ঞাত্বা তত্তারুণ্যপ্রাধান্যং ত্বৎকৃতে দৌত্যে গতাহমিতি চ "না রহ গুরুজন মাঝ" ইত্যাদিনাহ।

কেলিরভসশ্রবণং তারুণ্যপ্রাধান্যং তত্রাপি বাল্যস্য বলনালুজ্জয়ান্য-বস্তুনিরীক্ষণছদ্মাদিকং প্রাপ্তং। তৎপ্রচারে বাল্যভাবস্য রোদনমিশ্রতারুণ্যজনিত হাস্যমিলিত-কটুক্ত্যা তৎপ্রাধান্য-মিত্যাদি বাক্‌কৌশলং রসিকস্য বেদ্যং নান্যস্যেত্যনেন পরমরসিকস্য তব সঙ্গমকালঃ সংবৃত্তঃ নত্ববিদগ্ধস্য তৎপতেঃ স্বাভাবিকোভয়নিষ্ঠাকর্ষকগুণাগ্রনবস্থানাদিতি ভাবঃ।

অর্থাৎ দূতীর কথিত "শৈশব যৌবন' ইত্যাদি বর্ণন শ্রবণ করিয়া, তুমি দূতী শ্রীরাধার বাল্যাবস্থার প্রাধান্য বর্ণিত করিলা,তবে (নিরর্থক) তাহার নাম আমি শ্রীকৃষ্ণকে শুনাইয়া কেন আমাকে কষ্ট দিতেছ, নয়ন-ভঙ্গী দ্বারা দূতীর নিকট শ্রীকৃষ্ণ এরূপে নিজের বিবশতা প্রকাশ করিতেছেন জানিয়া, (শ্রীরাধার শৈশব-প্রাবল্য প্রকৃত নহে, উহা তোমার মন বুঝিবার জন্যই বলা হইয়াছে) প্রকৃতপক্ষে শ্রীরাধার দেহে এখন যৌবনেরই প্রাবল্য ঘটিয়াছে এবং তোমার জন্যই আমি শ্রীরাধার নিকট দৌত্যকার্যে গিয়াছিলাম, দূতী "না রহ" ইত্যাদি পদের দ্বারা তাহাই বলিতেছেন।

কেলি-রহস্যের শ্রবণ দ্বারা যৌবনের প্রাধান্য, আবার তাহাতে বাল্যের প্রভাব লজ্জাবশতঃ অন্যত্র নিরীক্ষণরূপ ছল বুঝা যাইতেছে। সেই ছলের কথা প্রকাশ পাইলে বাল্যসূচক রোদন ও যৌবনসূচক হাস্যমিশ্রিত গালি দ্বারা যৌবনেরই প্রাধান্য সূচিত হইতেছে। দূতীর উক্তির এই গূঢ় রহস্য কেবল রসিক ব্যক্তিরই বোধগম্য ; অন্যের নহে। সুতরাং উহাদ্বারা পরম রসিক শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে শ্রীরাধার সহিত সম্মিলনের শুভকাল উপস্থিত হইয়াছে, ইহাই দূতীর উক্তির সারমর্ম বটে। অরসিক পতির সহিত কিন্তু শ্রীরাধার সম্মিলন ঘটিতে পারে নাই ; কেননা, নায়ক ও নায়িকার উভয়গত যে সকল স্বাভাবিক গুণে উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকে শ্রীরাধা ও তৎপতির মধ্যে সে সকল গুণের অবস্থান ছিল না। পরবর্তী বৈষ্ণবগ্রন্থে শ্রীরাধার অনন্যপরতা রক্ষা করার জন্য তাঁহার পতিম্মন্য আয়ানের নপুংসকতা বর্ণিত হইয়াছে, বিদ্যাপতির সময়ে এই তত্ত্বটী প্রচারিত হইয়াছিল কিনা বলা যায় না। বিদ্যাপতির কোন পদেই আমরা এ বিষয়ের কোন ইঙ্গিত পাই নাই। রাধামোহন ঠাকুর "বালা-চরিত রসিক পুন জানে" এই বাক্যের ধ্বনি যাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে আয়ানের অজ্ঞতা ও অরসজ্ঞতাই সূচিত হইয়াছে। অন্তিম চরণের "পুন" অর্থাৎ "কিন্তু" শব্দটীর দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ রসজ্ঞতা ও অন্যের অরসজ্ঞতা ব্যঞ্জিত হইয়াছে ; সুতরাং নগেন্দ্রবাবু প্রভৃতি যে, "পুন" স্থলে "জন" পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন, উহাও এখানে সঙ্গত মনে হয় না।

(১১ সংখ্যক পদ)

নগেন্দ্রবাবুর ১১ সংখ্যক পদটী নেপালের পুথি হইতে সংগৃহীত হইয়াছে; উহা অন্য কোন সংস্করণে নাই। নগেন্দ্রবাবুর সংস্করণও এখন অপ্রাপ্য হওয়ায় আমরা পাঠকবর্গের সুবিধার জন্য সম্পূর্ণ পদটী নগেন্দ্রবাবুর টীকাসহ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া তৎসম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য প্রকাশ করিব।

(দূতীর উক্তি)

ভোঁহ ভাঙ্গি লোচন ভেল আড়।
তৈঅও ন শৈশব সীমা ছাড়॥ ২।
আবে হসি হৃদয় চীর লএ থোএ।
কুচ কঞ্চন অঙ্কুরএ গোএ॥ ৪।
হেরি হল মাধব কএ অবধান।
যৌবন পরসে সুমুখি আবে আন॥ ৬।
সখী পুছইতে আবে দরশএ লাজ।
সঁীচি সুধাএ অধ বোলিঅ বাজ॥ ৮।
এত দিন শৈশবে লাওল সাঠ।
আবে সবে মদনে পঢ়াউলি পাঠ॥ ১০।

(নেপালের পুথি।)

পাদাকুলক ছন্দ।

১—২। ভ্রূ ভাঙ্গিয়া (ভ্রূভঙ্গ করিতে শিখিয়াছে), লোচন আড় হইল (আড় দৃষ্টি হইল), তথাপি শৈশব সীমা ছাড়ে না (শৈশব তাহার দেহকে ত্যাগ করিতে চাহে না)।
৩—৪। এখন হাসিয়া বসন লইয়া হৃদয়ে রাখে (বক্ষে কাপড় দেয়), কাঞ্চন (বর্ণ) কুচাঙ্কুর গোপন করে।
৫। হল (এই শব্দ নানা অর্থব্যঞ্জক, অপর ক্রিয়ার সহিত ব্যবহৃত হয়)—চল।
৬। আন—অন্য।
৫—৬। মাধব, অবধানপূর্বক দেখিয়া চল (লও), যৌবনের স্পর্শে সুমুখী এখন অন্য (রূপ) হইয়াছে।
৭। দরশএ—দেখায়। ৮। সঁীচি—সিঞ্চন করিয়া। অধ—অর্দ্ধ। বোলী—কথা। বাজ—কহে।

৭—৮। সখী জিজ্ঞাসা করিলে এখন লজ্জা দেখায়, অমৃত সিঞ্চন করিয়া অর্দ্ধ (লজ্জাবশতঃ অসম্পূর্ণ) কথা কহে।

৯। সাঠ—সাথ, সঙ্গে।

৯—১০। এতদিন শৈশব সঙ্গে আনিয়াছিল, এখন মদন সমস্ত পাঠ পড়াইল।

এই পদের সম্বন্ধে প্রথমেই বক্তব্য এই যে, নেপালের একখানা মাত্র পুথিতে এই পদটী পাওয়া গিয়াছে। এই পদের অন্য কোন রূপান্তর মৈথিল বা বাঙ্গালা পুথিতে পাওয়া যায় নাই; সুতরাং পদের যেরূপ পাঠ ঐ পুথিতে পাওয়া গিয়াছে, বোধহয়, সেইরূপ পাঠই গৃহীত হইয়াছে।

মিথিলার সংলগ্ন নেপালের প্রদেশ-বিশেষের নাম মোরঙ্গ; বেণীপুরী মহাশয় বলেন যে, মোরঙ্গ-ওয়ালা অর্থাৎ নেপালবাসী লোকেরা বিদ্যাপতির পদে নেপালী রং চড়াইয়াছেন। বস্তুতঃ একথা খুব সত্য। ভাষাতত্ত্ববিৎ ব্যক্তিগণ একটু অভিনিবেশ সহকারে নেপালী পুথির এই সকল পদ মৈথিল-পুথির পদাবলীর সহিত তুলনা করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, যেমন বঙ্গদেশে আসিয়া বিদ্যাপতির মৈথিল পদাবলী অনেক স্থলে বাঙ্গালার নিজস্ব "ব্রজবুলী" ভাষার রূপ এবং কোন কোন স্থলে এমন কি খাঁটি বাঙ্গালার রূপ ধারণ করিয়াছে, নেপালেও এই স্বাভাবিক রূপান্তর না ঘটিয়া যায় নাই; সুতরাং নেপালী পুথির পাঠই বিদ্যাপতির পদের মৌলিক (Original) পাঠ কিনা, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ আছে। তর্কস্থলে যদি নেপালী পুথির পাঠ মৌলিক বলিয়াও স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও অন্ততঃ লিপিকরদিগের ভ্রম-প্রমাদ ও লেখার কায়দার গতিকে মৈথিল ও বাঙ্গালা পুথির মত নেপালী-পুথিখানিতেও যে অনেক ভ্রম-প্রমাদ ঘটিয়াছে, সুতরাং অবিচারে উহার সমস্ত পাঠ গ্রহণ করা যাইতে পারে না; ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। দৃষ্টান্তস্থলে বলা যাইতে পারে যে উদ্ধৃত পদটীতে "আবে" শব্দটী চারিবার প্রযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু সর্বত্রই উহাকে দ্বিমাত্রাত্মক "অব" শব্দের মত পড়িতে হইবে, নতুবা ছন্দ বজায় থাকিবে না। মৈথিল তালপত্রের পুথিতেও অনেক স্থলে "অব" শব্দের পরিবর্তে "আব" বা "আবে" ব্যবহৃত হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, এরূপ স্থলে "আবে" না লিখিয়া "অব" লিখাই সঙ্গত ছিল। সেরূপ না লিখিয়া "অব" স্থলে "আবে" লিখা যে লিপিকরের ভুল হইয়াছে, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। নগেন্দ্রবাবু লিপিকরের এই ভুল পাঠ তাঁহার সংস্করণে

অবিচারে মুদ্রিত করিয়া সুবিবেচনার পরিচয় দেন নাই। তদ্রূপ "তৈঅও" শব্দটীও ত্রিমাত্রাত্মক রূপে পাঠ না করিলে ছন্দোভঙ্গ ঘটে; অথচ প্রকৃতপক্ষে উহা ২+১+২=৫ মাত্রাত্মক বটে; উহাকে ত্রিমাত্রাত্মক গণ্য করিতে হইলে "তৈ" ও "ও" অক্ষর দুইটীকে লঘুরূপে পাঠ করিতে হইবে, কিন্তু এখানে প্রচলিত ব্যবহার অনুসারে প্রথম গুরু অক্ষরটীর মর্যাদা-রক্ষা ও সুশ্রাব্যতার জন্য "তৈ" অক্ষরটীর দীর্ঘ উচ্চারণই আবশ্যক বটে; সুতরাং "তৈঅও" শব্দ না লিখিয়া "তৈও" লিখা এবং উহার "তৈ" অক্ষর গুরু ও "ও" অক্ষর হ্রস্ব উচ্চারণ করিয়া তিন মাত্রা পূরণ করাই কর্তব্য বটে। মৈথিল তালপত্রের পুথিতেও অনেক স্থলেই ত্রিমাত্রাত্মক "তৈও" পাঠের ব্যবহার দেখা যায়; সুতরাং এখানেও সেরূপ পাঠ গ্রহণ না করা সঙ্গত হয় নাই।

এখন এই পদের কতকগুলি শব্দ ও বাক্যের অর্থ সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক মনে হইতেছে।

নগেন্দ্রবাবু "ভাঙ্গি" শব্দের অর্থ "ভাঙ্গিয়া" লিখিয়াছেন; কিন্তু উহাতে সঙ্গত অর্থ হইয়াছে কি? নায়িকার যৌবনসুলভ বিভ্রম-বিলাসের প্রকাশার্থে কিরূপ ভ্রূভঙ্গী করে, কিরূপ আড় অর্থাৎ বক্রদৃষ্টি করে, তাহা সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন, কিন্তু ভ্রূভঙ্গীর সহিত বক্রদৃষ্টির কার্যকারণ সম্বন্ধে আছে কি? ভ্রূভঙ্গী না করিয়া বক্রদৃষ্টি কিংবা বক্রদৃষ্টি না করিয়া ভ্রূভঙ্গী করা যাইতে পারা যায় না কি? অবশ্য ভ্রূ কুঞ্চিত করিতে চোখে একটু টান পড়ে, কিন্তু তাহাকেই কি বক্রদৃষ্টি বলা যায়? আমাদের বিবেচনায় এখানে "ভাঙ্গি" শব্দের "ভাঙ্গিয়া" অর্থ সঙ্গত নহে। এখানে "ভাঙ্গি" শব্দের অর্থ "ভঙ্গী" করিলে অন্বয় বা অর্থের কোন অসঙ্গতি থাকে না; "ভৌহ ভাঙ্গি" ইত্যাদি বাক্যের সরল ও সঙ্গত অর্থ এই যে, শ্রীরাধার ভ্রূভঙ্গী ও লোচন বক্র হইল অর্থাৎ শ্রীরাধা ভুরু বাঁকাইয়া বক্রভাবে দৃষ্টি করিতে শিখিলেন। "অব" শব্দ যেমন লিপিকরের লেখার ভুলে অথবা লেখার কায়দায় "আবে" হইয়াছে, এখানেও তেমনি "ভঙ্গি" "ভাঙ্গি" পাঠে পরিণত হইয়াছে। 'মৈথিল-কোকিল-বিদ্যাপতি' সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্রজনন্দন সহায় মহাশয় "ভৌঁহ ভাঙ্গি" ইত্যাদি বাক্যের অর্থ লিখিয়াছেন — "ভ্রূভঙ্গ করনে লগী ঔর ছিপ্ কর কটাক্ষ করনে লগী", তাঁহার লেখার ভাবে মনে হয় যে, তিনিও "ভৌঁহ-ভাঙ্গি" অর্থে "ভ্রূভঙ্গী" অর্থই বুঝিয়াছেন।

নগেন্দ্রবাবু "তথাপি শৈশবসীমা ছাড়ে না" বাক্যের তাৎপর্য লিখিয়াছেন, "শৈশব তাহার দেহকে ত্যাগ করিতে চাহে না"। এ কথায় সীমা ছাড়ে না—বাক্যের ধ্বনি ঠিক প্রকাশ পায় নাই। "সীমা" শব্দের প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ অর্থ "মর্যাদা" এবং "মর্যাদা" শব্দের অর্থ "ন্যায্য পথে স্থিতি"। যাহার পক্ষে যাহা স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম বা আচরণ উহাই উহার "মর্যাদা" বটে। শৈশবের স্বাভাবিক ধর্ম বা আচরণই শৈশবের সীমা বা মর্যাদা বটে; নতুবা নায়িকার সঙ্গে শৈশবের কোন সীমারেখা (boundary line) থাকিতে পারে না এবং তাহার প্রসঙ্গও কবির অভিপ্রেত হইতে পারে না। শৈশব তাহার সীমা বা মর্যাদা ছাড়ে না এই বাক্যের ধ্বনি এই যে, ভ্রূভঙ্গী ও কটাক্ষদৃষ্টিরূপ যৌবনকার্য আরম্ভ হইলেও শৈশব অর্থাৎ বালভাব উহার স্বাভাবিক আচরণ পরিত্যাগ করিল না অর্থাৎ যৌবনের আরম্ভেও শ্রীরাধার আচরণে বাল্যভাবেরই প্রাবল্য প্রকাশ পাইতেছে।

নগেন্দ্রবাবুর "কাঞ্চন (বর্ণ) কুচাঙ্কুর গোপন করে"—এই অর্থও আমাদের প্রীতিকর মনে হয় না। শ্রীরাধার বর্ণ সর্বাঙ্গেই কাঞ্চনতুল্য থাকা সত্ত্বে কবি বিশেষ করিয়া "কুচাঙ্কুর"কে কাঞ্চনবর্ণ বলিবেন কেন? বরং বিদ্যাপতি নব যৌবনার কুচাঙ্কুরকে আরক্তিম বলিয়াই অন্যত্র বর্ণিত করিয়াছেন, যথা—

উরজ-উদয় থল লালিম দেল

(৪ সংখ্যক পদ)

সুতরাং পূর্বোক্ত উভয় কারণেই "কাঞ্চন" শব্দের প্রসিদ্ধ "স্বর্ণ" অর্থ ত্যাগ করিয়া "স্বর্ণবর্ণ" অর্থ করার সঙ্গত কারণ দেখা যায় না। আমাদের মনে হয় যে এখানে "কাঞ্চন" শব্দের প্রসিদ্ধ "স্বর্ণ" অর্থ করিলে সঙ্গতি হইতে পারে। "কুচ কাঞ্চন" ইত্যাদি বাক্যের অর্থ তাহা হইলে এই হইবে যে, শ্রীরাধা কুচরূপ স্বর্ণ গোলককে (উহার) অঙ্কুর অবস্থায়ই গোপন করিতেছেন। স্বর্ণগোলক লোভনীয় বস্তু; আবার যদি ঐ স্বর্ণগোলক ক্রমশঃ বর্দ্ধনশীল হয়, তাহা হইলে এরূপ অপূর্ব স্বর্ণগোলক হস্তগত করার জন্য কাহার না লোভ হয়? সজ্জন ব্যক্তি নিজে যে পরের ধনে লোভ করেন না, কেবল ইহা নহে,—তিনি অন্যকে প্রলোভিত করাও অসঙ্গত কার্য মনে করেন; সুতরাং সুচরিত্রা শ্রীরাধা তাঁহার পরম লোভনীয় ক্রমশঃ বর্দ্ধনশীল স্বর্ণগোলকরূপ স্তনযুগলকে উহাদের অঙ্কুর-অবস্থায়ই আচ্ছাদিত করিতেছেন, "কুচ কাঞ্চন" ইত্যাদি অপূর্ব ধ্বনিপূর্ণ বাক্যদ্বারা এই সমস্ত ভাব ব্যঞ্জিত হইতেছে। বলা

বাহুল্য যে "কাঞ্চন" শব্দের লাক্ষণিক অর্থ "স্বর্ণবর্ণ" করিলে এই বিচিত্র "ধ্বনি" সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যায়। মহাকবি বিদ্যাপতির অনেক কথাই এরূপ বিচিত্র ব্যঞ্জনাপূর্ণ; দুঃখের বিষয় যে টীকাকারদিগের অপ্রণিধানে ঐ সকল বাক্যে উৎকৃষ্ট ব্যঞ্জনা দূরে থাকুক, অর্থের সহজ সঙ্গতিই পাওয়া কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

নগেন্দ্রবাবু "হল" শব্দটী "নানা অর্থব্যঞ্জক" বিবেচনা করিয়া, এখানে উহার অর্থ লিখিয়াছেন—"চল"; আবার "দেখিয়া চল" এই অদ্ভুত বাক্যটীর সঙ্গত অর্থ হয় না বলিয়া উহার অর্থ করিয়াছেন — "(দেখিয়া) লও"। বস্তুতঃ যদি "হল" শব্দটী কল্পতরুর মত নানা অর্থের প্রদায়ক হয়, তাহা হইলে এরূপ ব্যর্থ পরিশ্রম না করিয়া একবারেই "হল" হইতে "লও" অর্থের নিষ্কাশন করিলেই তো কার্যসিদ্ধি হইতে পারিত; সেরূপ না করার কি কি কারণ আছে? বস্তুতঃ সংস্কৃত ব্যাকরণে ধাতুর অনেকার্থ স্বীকৃত হইলেও বিনা কারণে ও বিনা যুক্তিতে অপভ্রংশ ভাষায় ধাতুসকলের যাহা ইচ্ছা তাহাই অর্থ করা যাইতে পারে না। সংস্কৃত কোন্ ধাতু হইতে অপভ্রংশ কোন্ ধাতুটীর উৎপত্তি হইয়াছে, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের (Comparative Philology) নিয়মানুসারে উহার বিশেষ আলোচনা করিয়াই এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করা আবশ্যক। দুঃখের বিষয় যে, নগেন্দ্রবাবু সংস্কৃত, হিন্দী, মৈথিলি প্রভৃতি ভাষায় অভিজ্ঞ হইলেও বিদ্যাপতির ব্যবহৃত সন্দিগ্ধ সুবন্ত পদ ও তিঙন্ত পদ সকলের অর্থ লিখিতে যাইয়া কুত্রাপি ভাষাতত্ত্বের সাহায্যে আলোচ্য শব্দগুলির ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ের চেষ্টা করেন নাই। অধিকাংশ অনভিজ্ঞ সম্পাদকের ন্যায় তিনিও শুধু প্রকরণ (context) দেখিয়া আন্দাজে অর্থ লিখিয়া দিয়াই দায়িত্ব এড়াইয়াছেন। এজন্য এরূপ বহুসংখ্যক স্থলেই তাঁহার প্রতিপাদিত অর্থ অন্ধকারে ঢিল ছোড়ার মত প্রায়ই অভীষ্টস্থলে পৌঁছিতে পারে নাই। যাহা হউক "হল" শব্দটার প্রকৃত অর্থ কি বিচার করিতে হইলে প্রথমে উহার ব্যুৎপত্তি নির্ণয় আবশ্যক। আমাদের মনে হয় যে, সংস্কৃত "লভ" ধাতু হইতে অপভ্রংশ "লহ" বা "লঅ" এবং "লহ" হইতেই ভাষাতত্ত্বের নিয়মানুসারে অক্ষর বিপর্যাস দ্বারা "হল" ধাতুর উৎপত্তি হইয়াছে। সুতরাং ধাতুর অনেক অর্থ হয় বলিয়া শুধু আন্দাজে নহে, প্রাকৃত ব্যাকরণের যে সূত্র অনুসারে সংস্কৃত "ভ" স্থলে প্রাকৃতে "হ" হইয়া থাকে এবং ভাষাতত্ত্বের নিয়মানুযায়ী যে উচ্চারণের বৈচিত্র অনুসারে 'বাতাস' 'বাবস'

প্রভৃতি শব্দ অক্ষর বিপর্যাস দ্বারা 'বাসাত্' 'বাস্ক' প্রভৃতি শব্দে রূপান্তরিত হইয়া থাকে, উহা দ্বারাই সংস্কৃত 'লভ' ধাতুর 'হল' অপভ্রংশ রূপটী সিদ্ধ হইতেছে।* 'হল' ধাতুর উৎপত্তি সংস্কৃত 'চল' ধাতু হইতে কোনরূপেই সিদ্ধ হইতে পারে না, সুতরাং উহার 'চল' অর্থও অসম্ভব বটে। আর যদি কোনমতে উহার 'চল' অর্থ করা যায়, তাহা হইলেই বা দেখিয়া 'চল' ইহাতে দেখিয়া 'লও' অর্থ কিরূপে সিদ্ধ হইবে, তাহাও বুঝা যায় না। বস্তুতঃ প্রাকৃত ব্যাকরণের সূত্র ও ভাষাতত্ত্বের নিয়মের প্রতি উপেক্ষা হইতেই বিদ্যাপতির ব্যবহৃত বহু অপভ্রংশ শব্দের এরূপ কল্পিত অর্থের উৎপত্তি হইয়াছে।

নগেন্দ্রবাবু "আবে সবে" ইত্যাদি বাক্যের অর্থ লিখিয়াছেন — এখন "মদন সমস্ত পাঠ পড়াইল।" এইপদেই বিদ্যাপতি বলিয়াছেন "তৈও ন শৈশব সীমা ছাড়া" অর্থাৎ তথাপি শৈশব তাহার স্বাভাবিক ধর্ম ছাড়িল না। এই অবস্থায় বিদ্যাপতির পক্ষে সেই একই পদে—যৌবনের অধিপতি মদন সমস্ত পাঠ পড়াইল ইহা বলা সম্ভবপর বা সঙ্গত হইতে পারে কি? আমাদের বিবেচনায় এখানে 'সবে' শব্দের 'সাকল্যে' বা 'মোটে' অর্থ করাই সঙ্গত বটে; তাহা হইলে বাক্যের অর্থ হইবে (যৌবনের অধিপতি) মদন সবেমাত্র পাঠ পড়াইয়াছেন অর্থাৎ নব যৌবনা শ্রীরাধা এখনও কামকলায় প্রবীণতা লাভ করেন নাই, কেবল কামকলার শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। 'সবে' শব্দের 'সাকল্যে বা 'মোটে' অর্থ হইতে অর্থের স্বাভাবিক পরিবর্তন-ক্রম অনুসারে সকলের মধ্যে 'কেবল' অর্থ আসিয়াছে। ঐ অর্থ কেবল বাঙ্গালা ভাষার নিজস্ব বা বিশেষত্ব নহে। বিদ্যাপতির মৈথিল ভাষায় ঐরূপ প্রয়োগ না হইতে পারার কোন কারণ নাই। এরূপ আরও প্রয়োগের দৃষ্টান্ত এখন আমাদের মনে পড়িতেছে না; আমাদের বিশ্বাস যে অতঃপর এরূপ দৃষ্টান্ত আরও পাওয়া যাইবে।

(১২ সংখ্যক পদ)

নগেন্দ্রবাবুর সংস্করণের ১২ সংখ্যক 'পীন পয়োধর দূবরি গতা' ইত্যাদি পদটী মৈথিল তালপত্রের পুথি হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে। নগেন্দ্রবাবু তাঁহার ভূমিকার এক স্থলে লিখিয়াছেন যে, এই পুথিখানি '৩০০ বৎসর পূর্বের লিখিত

*সংস্কৃত 'রভস', প্রাকৃত 'রহস'; সংস্কৃত 'প্রভু', প্রাকৃত 'পহু',; সংস্কৃত 'ভবতি' প্রাকৃত 'হোতি' ইত্যাদি।

অনুমান করিলে অসঙ্গত হয় না।' স্থানান্তরে লিখিয়াছেন — 'প্রবাদ আছে যে এই তালপত্রের পুথি বিদ্যাপতির প্রপৌত্রের লিখিত। এই পুথিখানি যে তাঁহার বংশে ছিল সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই।' সে যাহা হউক, নগেন্দ্রবাবু এই পুথিখানি খুব প্রামাণিক ও শুদ্ধ মনে করিয়া উহার উপর বিশেষভাবে নির্ভর করিয়াছেন এবং প্রায় সকল স্থলেই কোনরূপ সন্দেহ না করিয়া, উহার পদগুলি যথাযথভাবেই উদ্ধৃত করিয়াছেন। বিদ্যাপতি পাঁচশত বৎসরের অপেক্ষাও কিছু অধিক প্রাচীন কবি। উক্ত পুথিখানির বয়স তিনশত বৎসর হইলেও স্বীকার করিতে হইবে যে বিদ্যাপতির অপ্রকটের দুইশত বৎসর পরে উহা লিখিত হইয়াছিল। সাধারণতঃ ইতিহাসবিৎ পণ্ডিতগণ কাল গণনা করিতে যাইয়া, এক শতাব্দীতে তিন পুরুষ করিয়া ধরিয়া থাকেন। এ অবস্থায় দুই শত বৎসরে বিদ্যাপতির পরে আরও ছয় পুরুষ অতীত হওয়ার কথা বটে; সুতরাং এই হিসাবে পুথিখানা তাঁহার প্রপৌত্রের হস্তলিখিত না হইয়া, তাঁহার প্রপৌত্রের প্রপৌত্র বা অন্ততঃ পৌত্রের লিখিত হওয়াই অধিক সম্ভবপর বটে। তর্কস্থলে যদি উহা বিদ্যাপতির প্রপৌত্রের লিখিত বলিয়াও স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও লেখক সুপণ্ডিত না হইলে এবং তিনি বিদ্যাপতির স্বহস্ত লিখিত প্রাচীন ও প্রামাণিক পুথি দেখিয়া নকল না করিয়া থাকিলে উহাতেও অনেক ভুল প্রবেশ করিতে পারে। বস্তুতঃ এই পুথিখানার গৃহীত পাঠের যে কোন স্থলেই সম্পূর্ণ আস্থা করা যাইতে পারে না, আমরা ক্রমে তাহা দেখিতে পাইব। নগেন্দ্রবাবুর ন্যায় পাঠকবর্গ এই পুথিখানার উপর অত্যধিক আস্থা স্থাপন করিয়া ভ্রমে পতিত না হন, এজন্য আমরা প্রথমেই এ কয়েকটী কথা বলিতে বাধ্য হইলাম। "পীন পয়োধর দূবরি গতা" ইত্যাদি আলোচ্য পদটী 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি' ও 'পদরত্নাকর' গ্রন্থেও দৃষ্ট হয়; কিন্তু নগেন্দ্রবাবুর উদ্ধৃত মৈথিল পাঠের সহিত উক্ত দুইখানা বঙ্গীয় পুথির পাঠে পার্থক্য আছে। আলোচনার সুবিধার জন্যে আমরা প্রথমে নগেন্দ্রবাবুর সংস্করণ হইতে এই পদটীর মৈথিল রূপান্তর ও উহার টীকা উদ্ধৃত করিয়া, পরে উহার সহিত বঙ্গীয় পুথির পাঠের তুলনা করিব এবং আমাদিগের মন্তব্য প্রকাশ করিব।

(দূতীর উক্তি)

পীন পয়োধর দূবরি গতা।
মেরু উপজন কনক-লতা॥ ২।

এ কাহ্নু এ কাহ্নু তোরি দোহাই।
অতি অপরুব দেখলি সাই॥ ৪।
মুখ মনোহর আধর রঙ্গে।
ফুললি মধুরি কমল সঙ্গে॥ ৬।
লোচন যুগল ভৃঙ্গ অকারে।
মধুক মাতল উড়য়ে না পারে॥ ৮।
ভঁউহেরি কথা পুছহ জনু।
মদনে জোড়লি কাজর ধনু॥ ১০।
ভনে বিদ্যাপতি দুতি বচনে।
এত শুনি কাহ্নু করু গমনে॥ ১২।

দেশরাজবিজয় ছন্দ। ১২ হইতে ১৪ মাত্রা।

১। দুবরি— দুর্বল শব্দ হইতে, তন্বী। গতা— প্রাপ্ত।
২। কনকলতায় (দেহে) যেমন মেরু (পয়োধর) উৎপন্ন হইল।
৩। সাই— তাহাকে। ৬। বধুরি— বান্ধুলী।
৫। মধুক মাতল— মধুপানে মত্ত।
৬—৭। ভ্রূর কথা জিজ্ঞাসা করিও না, মদন (যেন ভ্রূধনুতে) কজ্জলের গুণ জুড়িয়াছে।

'গীতচিন্তামণি'র পাঠও প্রায় এইরূপ। ভণিতা অন্যরূপ—

ভনই বিদ্যাপতি দুতি বচনে।
কিসলয় অঙ্গ ন হোয় পহু ধরনে॥

'গীতচিন্তামণি' ও 'পদরত্নাকর' পুথির পাঠ তুলনার জন্য নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

এ কানু এ কানু তোহরি দোহাই।
অতি অপরুব আজু পেখলু রাই॥
পীন পয়োধর দুবরি গতা।
মেরু উপজন কনক লতা॥
মুখ মনোহর অধর সুরঙ্গ।
ফুটল মাধুরি কমলক সঙ্গ॥
নয়ন-যুগল ভেল ভুঙ্গ আকার।
মধু মদে মাতল উড়য়ে* ন পার॥

*"মধু মদে মাতল" স্থলে "মধুক মাতল কিয়ে"—পদরত্নাকর।

ভাঙকি ভঙ্গিম না পুছসি জন্থু।
কাজরে সাজল মদন-ধন্থু॥
ভণে বিদ্যাপতি দুতিক বচনে।
বিকসল অঙ্গ না হয় পহু ধরণে॥

নগেন্দ্রবাবু প্রথমেই মৈথিল পদটীর ছন্দের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"দেশ রাজবিজয় ছন্দ। ১২ হইতে ১৪ মাত্রা।" দুঃখের বিষয় যে, তাঁহার এই উক্তি সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। দেশ ও রাজবিজয় কোন ছন্দের নাম নহে; উহা দুইটী প্রসিদ্ধ রাগিনীর নাম বটে। মৈথিল পদটী প্রণিধান সহকারে পাঠ করিলে দেখা যায় যে, উহার প্রত্যেক চরণে লঘুগুরুর বিচার না করিয়া, বাঙ্গালার একাবলী ছন্দের মত ৬+৫=১১টি অক্ষর প্রযুক্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ এই পদটী মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত না হইয়া, অক্ষরবৃত্ত ছন্দেই রচিত হইয়াছে; সুতরাং উহার মাত্রা গণিতে যাওয়া এবং মাত্রার নিশ্চিত ঠিকানা করিতে না পারিয়া ১২ হইতে ১৪ মাত্রা — এরূপ একটা অনিশ্চিত মাত্রার হিসাব দেওয়া হাস্য-জনক ব্যাপার মনে না করিয়া পারা যায় না। মাত্রাবৃত্তের অপরিহার্য নিয়ম অনুসারে প্রত্যেক গুরু-অক্ষর ও লঘু-অক্ষর যথাক্রমে দুই মাত্রা ও এক মাত্রা ধরিলে, নগেন্দ্রবাবুর সংস্করণের উক্ত পদের বারোটা চরণে যথাক্রমে ১৫, ১৩, ১৮, ১৩ ইত্যাদি নানা অসমান মাত্রা দেখা যায়; মৈথিল ব্যাকরণ ও ছন্দের রীতি অনুসারে একার ওকার প্রভৃতি কোন কোন গুরু অক্ষরকে লঘু গণ্য করিলেও কোনরূপেই এই পদে মাত্রার একটা সমতা রক্ষা করা যায় না; পক্ষান্তরে বাঙ্গালা একাবলী ছন্দের মত অক্ষরের লঘুগুরুর দিকে লক্ষ্য না করিয়া প্রত্যেক চরণের ষষ্ঠ অক্ষরের পরে যতি রাখিয়া পড়িয়া গেলে, উহার কোথাও ছন্দের অসামঞ্জস্য লক্ষিত হয় না। মৈথিল কবি বিদ্যাপতির পক্ষে হিন্দী ও মৈথিল কবিতার স্বভাবসিদ্ধ মাত্রাবৃত্ত ছন্দের নিয়ম লংঘন করিয়া এরূপ অক্ষরবৃত্ত ছন্দে পদ রচনা করা আপাততঃ কিছু অসম্ভব মনে হইলেও, এখানে বলা আবশ্যক যে, আমরা মৈথিল তালপত্রের পুথিতেও এরূপ কয়েকটা মৈথিল পদ পাইয়াছি যে উহাতেও অক্ষরের লঘুত্ব বা গুরুত্ব সম্পূর্ণ অনাদৃত হইয়াছে বলিয়া মাত্রার কোন ঠিকানা নাই; কিন্তু অক্ষর গণনায় সমতাহেতু অক্ষরবৃত্ত ছন্দ ঠিক রহিয়াছে। আলোচ্য পদের ঠিক পরবর্তী "জেহে অবয়ব পুরুব সময়" ইত্যাদি ১৩ সংখ্যক নেপালের পুথির পদটীতেই ইহার সুন্দর উদাহরণ

পাওয়া যায়। এখানে উহা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত না করিয়া কেবল প্রথম ও শেষ কলিটী উদ্ধৃত করিতেছি।

জেহে অবয়ব পুরুব সময়
নিচর বিনু বিকার।
সে আবে জাহু তা- হু দেখি ঝাপএ
চিহ্নিমি ন ব্যবহার॥

*   *   *

যৌবন সৈসব খেদএ লাগল
ছাড়ি দেহে মোর ঠাম।
এত দিন রস তোহে বিসরল
অবহু নহি বিরাম॥

একটু প্রণিধান করিলেই দেখা যাইবে যে, এখানেও মাত্রা ছন্দের অনুযায়ী অক্ষরের লঘু-গুরুর কোন পার্থক্য রক্ষিত হয় নাই; কিন্তু বাঙ্গালা লঘু ত্রিপদী ছন্দ অনুসারে প্রত্যেক অর্দ্ধ কলিতে ৬+৬+৮=২০ অক্ষর ঠিক রাখা হইয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় যে, নগেন্দ্রবাবু অথবা তাঁহার উপদেষ্টা মৈথিল পণ্ডিত মহাশয় ছন্দের এই বিশেষত্বটা বুঝিতে না পারিয়া, ইহার সম্বন্ধেও লিখিয়াছেন—"কোড়ার ছন্দ। ২০ হইতে ২৭ মাত্রা। প্রত্যন্তর ১৩ মাত্রা"।* বস্তুতঃ উহার মধ্যে যে কুত্রাপি ১৩ হইতে ২৭ মাত্রার ইচ্ছাধীন প্রয়োগ নাই, সর্বত্রই লঘু ত্রিপদীর নিয়মানুসারে প্রত্যেক অর্দ্ধ কলিতে কুড়িটী অক্ষর প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা আমরা ঐ পদের আলোচনায় দেখাইব। কেবল নেপালের পুথিতে নহে, মৈথিল তালপত্রের পুথিতেও এরূপ অক্ষরবৃত্ত ছন্দের পদ অনেক আছে; যথাস্থানে উহার আলোচনা করিব।

আমরা আলোচ্য পদের ছন্দের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, উহা হইতেই বুঝা যাইবে যে, নগেন্দ্রবাবু উক্ত পদের যেরূপ পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন, সর্বত্র তাহা সুসঙ্গত হয় নাই। কেননা, এই পদে যদিও অক্ষরের লঘুত্ব-গুরুত্ব সমাদৃত হয় নাই, কেবল প্রত্যেক চরণে ৬+৫=১১ অক্ষর ঠিক রাখা হইয়াছে; তথাপি অনাবশ্যকরূপে পদের পাঠে কতকগুলি গুরু অক্ষরের ব্যবহার করিয়া পাঠকদিগের মনে ধোঁকা জন্মাইবার সুযোগ দেওয়া সুবিবেচনার কার্য নহে।

---

*সম্পাদক নগেন্দ্রবাবু বোধহয় 'ধ্রুব' বা ধুয়ার কলির অর্থে 'প্রত্যন্তর' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন।

ছন্দের অনুরোধে বিদ্যাপতির পদে প্রায়শই 'পীন', 'দূবরি' ইত্যাদি শব্দ 'পিন', 'দুবরি' ইত্যাদি রূপে লিখিত হইয়াছে, আমাদের বিবেচনায় এখানেও তদনুসারে 'পিন পঅধর দুবরি গতা' ইত্যাদির মত যথাসাধ্য গুরুবর্ণবর্জিত করিয়া শব্দাবলীর বর্ণবিন্যাস করা উচিত ছিল, কেননা, কেহ মৈথিল পদের প্রচলিত নিয়মানুসারে লঘু গুরু বর্ণের পার্থক্য রক্ষা করিয়া পদটীকে পড়িতে গেলেই ছন্দোভঙ্গ ঘটিবে। বলা বাহুল্য যে, নগেন্দ্রবাবু ও তাঁহার উপদেষ্টা মৈথিল পণ্ডিত মহাশয়ও সেই ধোঁকায়ই পড়িয়াছেন এবং পদের ছন্দ ঠিক করিতে না পারিয়া, মাত্রার সম্বন্ধে অনিশ্চিত ও অশুদ্ধ উক্তি দ্বারাই তাঁহাদিগের ভ্রমের স্পষ্ট পরিচয় দিয়া ফেলিয়াছেন।

'গীতচিন্তামণি' ও 'পদরত্নাকর' পুথির যে রূপান্তর উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে, উহার প্রতি একটু প্রণিধান করিলেই বুঝা যাইবে যে, বঙ্গীয় পুথির লিপিকরগণ এই পদটী পনর বা ষোল মাত্রার মাত্রা-চতুষ্পদী ছন্দে রচিত মনে করিয়া প্রত্যেক চরণেই সেই পনর বা ষোল মাত্রার* পূরণের জন্য এক আধটী শব্দ যোজনা করিয়াছেন ; কিন্তু এরূপ গোঁজামিল দিয়াও সর্বত্র মাত্রা-চতুষ্পদী বা চৌপাই ছন্দ বজায় রাখিতে পারেন নাই ; ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৯ম ও ১০ম চরণে ছন্দোভঙ্গ ঘটিয়াছে ; আমূল পরিবর্তন ব্যতীত উক্ত চরণগুলির শব্দ বজায় রাখিয়া সেই ছন্দের দোষ সংশোধন করা সম্ভবপর হয় নাই ; অতএব অগত্যা পদটী ছন্দোদুষ্টই রহিয়া গিয়াছে। বিদ্যাপতির অনেক মৈথিল পদ বঙ্গদেশে প্রচারিত হইয়া গায়ক ও লিপিকরগণের অপ্রণিধান ও অনভিজ্ঞতার জন্যে যে কিরূপ বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে, তাহার একটা সুন্দর উদাহরণ বটে। সাধারণতঃ নগেন্দ্রবাবু বঙ্গীয় সংস্করণের অনেক পাঠান্তর ও রূপান্তরের প্রতি অনেক সময়ে অসঙ্গত দোষারোপ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই ; কিন্তু তিনি এই পদের বঙ্গীয় পাঠের সম্বন্ধে কোন দোষারোপ না করিয়া কেন যে "গীতচিন্তামণির পাঠও প্রায় এইরূপ" এইমাত্র বলিয়া ক্ষান্ত হইয়াছে, উহার একমাত্র কারণ ইহাই বিবেচনা হয় যে, এই পদটী মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত বলিয়া তাঁহারও ভ্রান্ত ধারণা থাকায়, এবং মৈথিল পদটী হইতে উহার বাঙ্গালা রূপান্তরে মাত্রাবৃত্তের

*চরণের শেষ অক্ষর লঘু বা গুরু গণ্য করা ইচ্ছাধীন বটে ; সুতরাং 'চৌপাই' ছন্দ পনর মাত্রার বা ষোল মাত্রার দুই কথাই বলা যাইতে পারে। হিন্দীর ছন্দোগ্রন্থে উভয় প্রকার উক্তিই পাওয়া যায়।

হিসাবে অনেক অল্প ত্রুটি থাকায় তিনি প্রকৃত কথাটা চাপিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছেন; নতুবা তাঁহাকে স্পষ্ট বলিতে হইত যে, তাঁহার মতে একান্ত প্রামাণিক ও বিশুদ্ধ মৈথিল তালপত্রের পুথির পাঠ হইতে আলোচ্য পদে বঙ্গীয় 'গীতচিন্তামণি' পুথির পাঠই অধিক শুদ্ধ। বস্তুতঃ কিন্তু এখানে মৈথিল তালপত্রের পুথির পাঠান্তরই প্রাচীন, প্রামাণিক ও শুদ্ধ বটে। বঙ্গীয় পুথির পরবর্তী রূপান্তরে মৈথিল পদের অর্থ প্রায় ঠিক থাকিলেও উহাতে ছন্দের ব্যতিক্রম ও মাত্রা ছন্দের হিসাবে ছন্দোদোষ ঘটিয়াছে। বঙ্গীয় পুথিগুলির গৃহীত পাঠের সম্বন্ধে মোটামুটি আমাদের মন্তব্য বলা হইয়াছে,— কেবল একটি বলা হয় নাই; উহা বলিয়াই আমরা আলোচ্য মৈথিল পদের পাঠ ও অর্থের বিচারে প্রবৃত্ত হইব। মৈথিল পুথির অন্তিম চরণ—

এত বলি কাহ্নু করু গমনে॥

এই পাঠ যদি মৈথিল তালপত্রের পুথিতে থাকিয়া থাকে, তাহা হইলেও উহা প্রামাণিক পাঠ বলিয়া স্বীকার করিতে প্রবৃত্তি হয় না। এই দূতী শ্রীকৃষ্ণের আপ্ত দূতী বা রাধার আপ্ত দূতী যিনিই হউন না কেন, তাঁহার নিকট হইতে অভিসারে গমনের জন্যে কোন অনুরোধ বা ইঙ্গিত না পাইয়াও শ্রীকৃষ্ণ যে অভিসারে যাইবেন, ইহা নিতান্ত অস্বাভাবিক ও রসবিরুদ্ধ মনে হয়। এখানে "গমন" শব্দের অর্থ "অভিসারে গমন" না হইয়া "নিজের গৃহে গমন" বা "কর্মান্তরে গমন" হইলে, তাহাতেও অর্থের কোন পুষ্টি না হইয়া বরং তদ্দ্বারা দূতীর বাক্যশ্রবণে শ্রীকৃষ্ণের আগ্রহের অভাব বা অল্পতাই প্রতীত হয়; সুতরাং এই পাঠ যে মহাকবি বিদ্যাপতির অভিপ্রেত ও মৌলিক পাঠ নহে, তাহা আমরা দৃঢ়তা সহকারে বলিতে পারি। নগেন্দ্রবাবু বোধহয় বটতলার কোন অশুদ্ধ 'গীতচিন্তামণি' হইতে বঙ্গীয় পুথির উক্ত পদের অন্তিম চরণের "বিকসল অঙ্গ না হয় পহু ধরণে॥" এই সুন্দর ও ধ্বনিপূর্ণ পাঠের পরিবর্তে অশুদ্ধ ও অর্থশূন্য, "কিসলয় অঙ্গ না হয় পহু ধরণে॥" পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। বস্তুতঃ কবিরা শিরিষ প্রভৃতি কোমল কুসুমের সঙ্গেই নায়িকার অঙ্গের উপমা দিয়া থাকেন— পল্লবের সঙ্গে নহে; সুতরাং এখানে "কিসলয় অঙ্গ" সম্পূর্ণ অসঙ্গত ও অর্থশূন্য বটে। "বিকসল অঙ্গ" ইত্যাদি প্রামাণিক পাঠের অর্থ— বিদ্যাপতি দূতীর কথায় বলিতেছেন যে, হে প্রভু! শ্রীকৃষ্ণ! নায়িকার বিকাশপ্রাপ্ত স্তন, নিতম্ব প্রভৃতি ধরিয়া রাখিতে অর্থাৎ গুপ্ত রাখিতে পারা যায় না অর্থাৎ নায়িকা বাল্যভাবের

প্রকাশ দ্বারা তাঁহার যৌবন গোপনের যত চেষ্টাই করুন না কেন, তাঁহার বিকাশপ্রাপ্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিই তাঁহার যৌবন ব্যক্ত করিয়া দিতেছে। আমরা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, বৈষ্ণব গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে শ্রীমৎ অদ্বৈত প্রভু আন্দাজ পাঁচশত বৎসর বিদ্যাপতির জীবদ্দশায়ই তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে মিথিলার বিস্‌কী গ্রামে যাইয়া বিদ্যাপতির রচিত বহু পদ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় বঙ্গীয় পুথির অনেক পাঠই খুব প্রাচীন ও প্রামাণিক মনে করা অসঙ্গত নহে। আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস যে, পরবর্তী সময়ে বঙ্গীয় পুথির এই পদটীতে অনেক অসঙ্গত পরিবর্তন সাধিত হইয়া থাকিলেও উহার ভণিতার অন্তিম চরণের "বিকসল" ইত্যাদি পাঠ মূলতঃ সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক ও শুদ্ধ বটে। মিথিলার আন্দাজ তিনশত বৎসরের প্রাচীন গায়ক ও লিপিকরদিগের ভ্রমহেতু অনেক পাঠেই বোধহয় এইরূপ পরিবর্তন ও বিকৃতি ঘটিয়াছে। এই অন্তিম চরণে "পহু" শব্দের প্রয়োগ তাদৃশ প্রয়োজনীয় বা সুসঙ্গত মনে হয় না। উহা ছাড়িয়া দিয়া "বিকসল অঙ্গ নহে ধরনে॥" এইরূপ পাঠ কল্পনা করিলেই মৈথিল পদটীর এগার অক্ষরী একাবলী ছন্দ ঠিক থাকে। বোধহয় মূল মৈথিল পদে ঐরূপই পাঠ ছিল, — পরে অন্যান্য চরণের সহিত বঙ্গীয় সংস্করণের সম্পূর্ণ পদটীই পরিবর্তিত হইয়াছে।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত বলিয়া যদিও এই পদে অক্ষরসমূহের লঘুত্ব বা গুরুত্ব ধর্তব্য নহে, কিন্তু তথাপি পাঠকদিগের ধোঁকা নিবারণের উদ্দেশ্যে যথাসম্ভব লঘু অক্ষরের ব্যবহার করাই সঙ্গত বটে। হিন্দী ও মৈথিল ভাষায় 'দোহাই', 'রঙ্গে', 'সঙ্গে' ও 'মনোহর' শব্দগুলি 'দুহাই', 'রঙে', 'সঙে' ও 'মন্‌হর' রূপেই লিখিত ও পঠিত হইয়া থাকে। এখানেও ঐ শব্দগুলির 'দো', 'র', 'স' ও 'নো' অক্ষরগুলি গুরুস্বরযুক্ত ও সংযুক্তবর্ণের পূর্ববর্তী বলিয়া মাত্রাছন্দের নিয়মানুসারে গুরু উচ্চারিত না হইয়া লঘুরূপেই উচ্চারিত হইবে। সুতরাং তিনশত বৎসরের প্রাচীন কালের লিপিকর তাঁহার খামখেয়ালি হইতে যেরূপ বর্ণবিন্যাসই বলিয়া থাকুক না কেন, এখন উচ্চারণ অনুযায়ী বর্ণবিন্যাস প্রদর্শিত করাই সমীচীন বটে। নগেন্দ্রবাবু অনেকস্থলেই তাহা করিয়াছেন, এখানে যে ভ্রমপ্রযুক্তই সেরূপ করেন নাই, তাহাও বলা হইয়াছে; সুতরাং এ সম্বন্ধে আর আর অধিক কথা না বলিয়া, কেবল ইহাই বলিতে ইচ্ছা করি যে, এই পদের অন্তর্গত 'দোহাই',

'রঙ্গে', 'সঙ্গে', 'মনোহর' শব্দগুলির স্থলেও ব্যবহার ও উচ্চারণ অনুযায়ী 'দুহাই', 'রঙে' বা 'রংএ', 'সঙে' বা 'সংএ' ও 'মন্‌হর' পাঠই গ্রহণ করা উচিত ছিল।

নগেন্দ্রবাবু চতুর্থ চরণে 'সাই' পাঠ গ্রহণ করিয়া, উহার অর্থ 'তাহাকে' লিখিয়াছেন। বস্তুতঃ এরূপ অর্থে 'সাই' শব্দের প্রয়োগ, কি প্রাচীন, কি আধুনিক মৈথিল ভাষায় দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। আমাদের বিশ্বাস যে, এখানেও বঙ্গীয় পুথির 'রাই' পাঠই প্রামাণিক ও সমীচীন বটে। বোধহয় লিপিকরের ভুলেই এই অর্থপ্রযুক্ত ও অর্থশূন্য পাঠের উৎপত্তি হইয়াছে।

'ভঁউহেরি' পাঠও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এই পাঠ হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, বিদ্যাপতির প্রাচীন মৈথিল ভাষার সর্বত্র ষষ্ঠ বিভক্তিতে 'ক' বা 'কি' ব্যবহৃত না হইয়া, বাঙ্গালার মত কোন কোন স্থলে 'এর' বা 'এরি' ও ব্যবহৃত হইত, যথা—

নন্দক নন্দন কদম্বেরি তরু তরে

(নগেন্দ্রবাবুর ১ সংখ্যক)

নগেন্দ্রবাবুর নিজের সংগৃহীত মৈথিল পদে এরূপ প্রয়োগ থাকা সত্ত্বেও তিনি যে বঙ্গীয় সংস্করণের অনেক পদে কি জন্য অনাবশ্যকরূপে ষষ্ঠী বিভক্তির 'এর' প্রত্যয়ের স্থলে 'ক' প্রত্যয় করিয়া দিয়াছেন, আমরা বুঝিতে পারি না। আমরা যথাস্থলে এ বিষয়ের যথোচিত আলোচনা করিব; এখানে কেবল প্রসঙ্গ করিয়া রাখিলাম।

পদের অর্থ সরল, ইহাতে দুর্বোধ্য কিছু নাই বলিলেই হয়; তথাপি দুঃখের বিষয় যে, নগেন্দ্রবাবু "ভঁউহেরি কথা" ইত্যাদি কলির যে অর্থ করিয়াছেন, উহা সমর্থন করিতে পারিতেছি না। নগেন্দ্রবাবু 'কাজর' শব্দ হইতে 'কজ্জলের গুণ' কোথায় পাইলেন? এরূপ অর্থ কি কষ্টকল্পনা নহে? এরূপ অর্থ করিলেও 'কজ্জলের গুণ' যে এখানে কি তাহা বলা আবশ্যক। যদি বলেন যে, কবি এখানে ভুরুর সহিত বঙ্কিম ধনুর উপমা দিয়া, নয়নের কজ্জল রেখাকে ধনুর কালো গুণের সহিত উপমিত করিয়াছেন; কিন্তু ইহা তাদৃশ সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না; কেননা কবি আগেই কৃষ্ণ তারকবিশিষ্ট কজ্জসাঙ্কিত নয়নযুগলকে মধুমত্ত ভৃঙ্গের সহিত উপমিত করিয়াছেন, এখানে আবার

নয়নের কজ্জলের উল্লেখ অনাবশ্যক। 'ভঁউহেরি কথা পুছসি জনু' বাক্যদ্বারা কবি এখানে নায়িকার ভ্রূ-ধনুর উপরই প্রাধান্য দিয়া বলিতেছেন যে, নায়িকার ভুরু দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন কন্দর্প কজ্জলরঞ্জিত ধনু জুড়িল অর্থাৎ উহাতে গুণ চড়াইল। অবশ্য এখানেও নয়নের কজ্জল-রেখাকেই উক্ত ভ্রূধনুর গুণরূপে বুঝিতে হইবে; কিন্তু উহা ধ্বনিগম্য অর্থ। 'কাজর ধনু' লিখায় এখানে অন্বয় ঠিক রাখিয়া কোনমতেই কাজলকে ধনুর সহিত সংযুক্ত করা সম্ভবপর নহে। এজন্য বিদ্যাপতির আধুনিক মৈথিল সংস্করণের সম্পাদক মহাশয় 'মদনে জোড়লি কাজর ধনু' পাঠ ধরিয়া উহার অর্থ সহজবোধ্য বলিয়া, উহার কোন টীকা করাই আবশ্যক মনে করেন নাই। আমাদিগের নিকটও এইরূপ পাঠ ও পূর্বোক্ত অর্থই সঙ্গত বোধ হয়। আধুনিক কালের বিলাসিনীগণ যেমন মুখে পাউডার বা রূজ মাখিয়া ভ্রূ যুগলকে কৃষ্ণতর করার জন্য মসীশলাকা দ্বারা অঙ্কিত করিয়া থাকেন, প্রাচীন সময়েও ভ্রূ যুগলে সেরূপ কাজল পরার রীতি ছিল; সুতরাং কজ্জলরঞ্জিত ভুরু ধনু কেবল কবির কল্পনা নহে, উহা প্রাচীন কালের একটা সাধারণ বিলাসসজ্জাও বটে। কবি কাজর ধনু এই সমাসযুক্ত পদের দ্বারা উহাকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। সঙ্গত অন্বয় রক্ষা করিয়া উহার অর্থ আর কিছুই করা যাইতে পারে না।

(১৩ সংখ্যক পদ)

নগেন্দ্রবাবুর ১৩ সংখ্যক পদটী নেপালের পুথি হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। ঐ পদ অন্য কোন বঙ্গীয় সংস্করণে না থাকায় এবং নগেন্দ্রবাবুর সংস্করণও এখন অপ্রাপ্য হওয়ায়, আমরা পাঠকদিগের সুবিধার জন্যে নগেন্দ্রবাবুর সংস্করণ হইতে টীকাসহ সম্পূর্ণ পদটী নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া, পরে উহার সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য প্রকাশ করিব।

(দূতীর উক্তি)

জেহে অবয়ব পুরুব সময়
নিচয় বিণু বিকার।
সে আবে জাহু তাহু দেখি ঝাপএ
চিহ্নিমি না বেবহার ॥২॥

কন্‌হা তুরিত শুনসি আএ।
রূপ দেখতে নয়ন ভুলল
সরণ তোরী দোহাএ ॥৪।
সৈস্‌ব বাপু বহীরি ফেদাএল
জৌবনে গহল পাস।
জেও কিছু ধনি বিরুহ বোলএ
সে সেও সুধাসম ভাস ॥৬।
জৌবন সৈসব খেদএ লাগল
ছাড়ি দেহে মোর ঠাম।
এত দিন রস তোহে বিরসল
অবহু নহি বিরাম ॥৮।

কোড়ার ছন্দ। ২০ হইতে ২৭ মাত্রা। প্রত্যন্তর ১৩ মাত্রা।

১। জেহে — যে। পুরুব সময় — পূর্বকালে, পূর্বে। নিচয় — নিশ্চল, স্থির। বিণু বিকার — বিকার শূন্য।

২। আবে — এখন। জাহু তাহু — যাহাকে তাহাকে। ঝাপএ — ঢাকা দেয়। চিহ্নিম — চিনিতে পারি, বুঝিতে পারি। ন — না। বেবহার — ব্যবহার।

১—২। যে শরীর পূর্বে বিকারশূন্য ও স্থির (ছিল) (যে দেহে শৈশবসুলভ নিশ্চিন্ততায় কোনরূপ লজ্জার চাঞ্চল্য লক্ষিত হইত না), সে দেহ এখন যাহাকে তাহাকে দেখিয়া আবরণ করে (গায়ে কাপড় দেয়); (এরূপ) ব্যবহার বুঝিতে পারি না।

৩। কন্‌হা — কানাই। তুরিত — ত্বরিত।

৪। দেখতে — দেখিতে, দেখিয়া। ভুলল — ভুলিল। সরূপ — স্বরূপ, সত্য। তোরি — তোর। দোহাএ — দোহাই।

৩—৪। কানাই, শীঘ্র আসিয়া শোন্। তোর দোহাই, সত্য বলিতেছি রূপ দেখিয়া আমার নয়ন ভুলিল।

৫। বাপু (মৈথিল) — বেচারা; পাঠান্তর — বান্ধব। বহীরি — বাহিরে। ফেদাএল — খেদাইল, তাড়াইয়া দিল; গহল — গ্রহণ করিল, লইল। পাস — পাশ, নিকটে।

৬। জেও — যাহাও। বিরুহ — বিরোধ, কটু। বোলএ — কহে। সে সেও — তাহা তাহাও, সে সকলও। সুধাসম ভাস — অমৃততুল্য প্রতীয়মান।

৫—৬। শৈশব বেচারাকে বাহিরে তাড়াইয়া দিল, যৌবনকে নিকটে লইল (পাশে লইল); ধনী যাহা কিছু কটু (কথাও) বলে, তাহাও অমৃততুল্য প্রতীয়মান হয়।

৭। খেদএ লাগল—তাড়াইতে লাগিল। দেহে—দে। মোর ঠাম—আমার স্থান। ৮। তোহে—তোকে। বিরসল—রস প্রদান করাইল ভোগ করাইল। অবহু—এখনও। বিরাম—নিবৃত্তি, বিরতি।

৭—৮। যৌবন শৈশবকে তাড়াইতে লাগিল, কহিল আমার স্থান ছাড়িয়া দে (এখন ইহার দেহে আমার অধিকার হইয়াছে, অতএব তুই ইহাকে ত্যাগ কর); এতদিন তোকে রস ভোগ করাইল (এতদিন তুই ইহার দেহ অধিকার করিয়াছিলি), এখনও নিবৃত্তি নাই (এখনও তোর আশা মেটে নাই)?

এই পদের সম্বন্ধে প্রথমেই বক্তব্য এই, নগেন্দ্রবাবু টীকায় ইহার যে 'কোডার' ছন্দ নাম দিয়াছেন, দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা পিঙ্গলের ছন্দোসূত্র অথবা পরবর্তী কোন ছন্দোগ্রন্থে আজ পর্যন্ত সেই নাম পাই নাই। আমরা ইতিপূর্বে বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি, কোন ছন্দই এরূপ উচ্ছৃংখল নহে যে, উহা ইচ্ছানুসারে কখনও কম মাত্রার কখনও বেশী মাত্রার হইতে পারে। সুতরাং টীকার ২০ হইতে ২৭ মাত্রা কথাটা সম্পূর্ণ অসম্ভব বটে। কোডার (?) ছন্দের এই অদ্ভুত মাত্রাবিবরণ নগেন্দ্রবাবু তাঁহার সে মৈথিল উপদেষ্টার নিকট হইতেই পাইয়া থাকুন, উহা সম্পূর্ণ মনঃকল্পিত। এই পদের কুত্রাপি ২০ হইতে ২৭ মাত্রা নাই। ইহা মাত্রাছন্দের পদও নহে। ইহা ৬+৬+৮=২০ অর্থাৎ কুড়ি অক্ষরী সাধারণ লঘু ত্রিপদীর পদ বটে; তবে বিদ্যাপতি ইহার দুইটী স্থলে দুইটি লঘু অক্ষরের পরিবর্তে একটা গুরু অক্ষর ব্যবহার করায় দুটী ছয়-অক্ষরী মধ্যবর্তী চরণে ছয় অক্ষরের স্থলে পাঁচ অক্ষর পাওয়া যাইতেছে।

যেমন

রূপ দেখতে নয়ন ভুসল
চিহ্নিমি ন বেবহার॥

এবং

সৈসব বাপু বহীরি (বৈরী) ফেদাএল
জৌবনে গহল পাশ॥

পংক্তিগুলির 'রূপ' ও 'সৈসব' শব্দ দুইটির 'রূ' ও 'সৈ' অক্ষর গুরু বলিয়া দীর্ঘ উচ্চারিত হওয়ায় ঐ চরণ দুইটির ছয়ের স্থলে পাঁচ অক্ষরেও ছন্দ ঠিক আছে। যে সকল চরণে ছয় অক্ষর ঠিক আছে, সেখানে বাঙ্গালা ছন্দের মত গুরু অক্ষরগুলিও লঘুরূপে পঠিত হইবে। এইভাবে পদটি পড়িলে ও লঘু ত্রিপদীর মত ত্রিপদীর তিনটী চরণ ফাঁক দিয়া লিখিলে, কোনই

গোলযোগ ঘটিত না ; কিন্তু বর্তমান সময়ে মৈথিল ভাষায় বিশুদ্ধ মাত্রা ত্রিপদী ব্যতীত এরূপ কুড়ি অক্ষরী লঘুত্রিপদী ছন্দের প্রচলন না থাকায় নগেন্দ্রবাবুর উপদেষ্টা মৈথিল পণ্ডিত মহাশয় ভ্রান্ত হইয়া, ইহাকে মাত্রা ত্রিপদী মনে করিয়া মাত্রার সমতা খুঁজিয়া না পাইয়া, অগত্যা ঐরূপ একটা অদ্ভুত ও অসম্ভব সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। পাঠক মহাশয়গণ এই পদের অক্ষরগুলিকে ৬+৬+৮=২০ অক্ষরী লঘু ত্রিপদীর ধরণে সাজাইয়া পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন যে, ইহাতে কোনই গোলযোগ নাই ; কেবল 'রূপ' ইত্যাদি ও 'সৈসব' ইত্যাদি চরণে এক-একটী অক্ষর কম এবং 'তাহু দেখি ঝাপএ', 'বহীরি ফেদাএল' ও 'সে সেও' ইত্যাদি চরণ তিনটিতে ৬, ৬ ও ৮ অক্ষরের স্থলে পুথি লেখকের ভুলে যথাক্রমে ৭, ৭ ও ৯টী অক্ষর আছে। 'রূ' ও 'সৈ' অক্ষর গুরু, সুতরাং প্রত্যেকে দুইটী লঘু অক্ষরের সমান বটে ; এজন্যে সেই চরণ দুইটীতে পাঁচ অক্ষরই ছয় অক্ষর ধরিতে হইবে। 'তাহু' ইত্যাদি চরণগুলিতে পুথি লেখকের ভুলে একটি করিয়া অক্ষর বেশী দেওয়ায় লঘুত্রিপদীর ছন্দ ভঙ্গ হইয়াছে ; তাহা অভিজ্ঞ পাঠক পড়িলেই কানে বাজিবে। উহা যে রচয়িতা মহাকবি বিদ্যাপতির ভুল নহে অথবা ঐ পদের প্রকৃত শুদ্ধ পাঠ নহে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি প্রণিধান করিলেই তাহা বুঝা যাইবে।

১। 'ঝাপএ' স্থলে 'ঝাপ' বা 'ঝাপে' শব্দও মৈথিল ভাষা অনুসারে সমান শুদ্ধ বটে। দৃষ্টান্তস্থলে নিম্নলিখিত প্রয়োগগুলি দেখুন ঃ

অমিঅক লহরী বস অরবিন্দ (নগেন্দ্রবাবুর ৩০নং পদ)
রস বুঝ রসমন্ত (ঐ ৩২নং পদ)
ভনই বিদ্যাপতি গাবে (ঐ ৩৭নং পদ)

'বসই' বা 'বসএ' স্থলে 'বস', 'বুঝই' বা 'বুঝয়ে' স্থলে 'বুঝ' ও 'গাবই' স্থলে 'গাব' বা 'গাবে' যেমন প্রযুক্ত হইয়াছে, এখানেও সেরূপ 'ঝাপ' বা 'ঝাপে' পাঠ গ্রহণ করিলেই ছন্দোভঙ্গ নিবারিত হয়। পুথি লেখকেরা অনেক সময়ে এরূপ বা ইহা অপেক্ষাও অনেক মারাত্মক ভুল করিয়া থাকেন ; এরূপ ভ্রম লেখক মাত্রেরই স্বাভাবিক, অভিজ্ঞ পাঠকদিগকে ইহা বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না।

২। 'বহীরি ফেদাএল' স্থলে 'বৈরি ফেদাএল' লিখিলে ও পড়িলেই ছন্দ ও অর্থ উভয় দিক্ রক্ষা হইতে পারে। 'বাহিরে' শব্দটা সচরাচর 'বাইরে' রূপে লিখিত বা উচ্চারিত হইয়া থাকে। 'হী' স্থলে 'ই' উচ্চারণ নিতান্ত

স্বাভাবিক। সংস্কৃত 'বহি' শব্দের স্থলে প্রাচীন বাঙ্গালা পুথিতে 'বহি' ও আধুনিক বাঙ্গালায় 'বই' শব্দের (যেমন— "রাধাকৃষ্ণ প্রাণ পতি, জীবনে মরণে গতি, ইহা বহি অন্য নাহি মনে।"—নরোত্তম) ব্যবহার দেখা যায়। সেই রূপেই সংস্কৃত 'বহিঃ' হইতে মৈথিল 'বহির' 'বহিরি' 'বইরি' 'বৈরি' শব্দগুলির উদ্ভব হইয়াছে। সুতরাং বৈরি লিখিয়া এখানে ছন্দ ও অর্থ উভয় দিক্ রক্ষা করাই যে সঙ্গত, ইহাতে কোনই সন্দেহ হইতে পারে না।

(৩) 'সে সেও' ইত্যাদি স্থলে প্রথম 'সে'টা কেবল সম্পূর্ণ অনাবশ্যক নহে, উহার প্রয়োগ অসঙ্গতও বটে। সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে 'যৎ' শব্দ ও 'তৎ' শব্দের সম্বন্ধ নিত্য। কোন বাক্যে আগে 'যৎ' বা যে শব্দের প্রয়োগ করিলে পরে আবার 'তৎ' বা সে শব্দেরও প্রয়োগ করিতে হয়; নতুবা অর্থসঙ্গতি থাকে না। এই নিয়মের 'তেহি নো দিবসো গতাঃ' ইত্যাদির মত কয়েকটী ব্যতিক্রমস্থলও আছে। এখানে সেই ব্যতিক্রমও খাটে না বলিয়া, বিদ্যাপতি 'জেও কিছু ধনি' ইত্যাদি বাক্যে 'জেও' শব্দের প্রয়োগ করায়, পরে তাঁহাকে সেও শব্দের ব্যবহার করিতে হইয়াছে। এখানে আগে 'জেও' (যাহাও) থাকায় পরে 'সেও' (তাহাও) থাকাই সঙ্গত বটে। আগে 'জে জেও' থাকিলেও পরেও 'সে সেও' রাখা আবশ্যক, আগে শুধু 'জেও' থাকায় পরে 'সে সেও' লিখা কেবল অনাবশ্যক নহে, উহা ভুলও বটে। নগেন্দ্রবাবু 'সে সেও' শব্দের অর্থ বাধ্য হইয়া 'তাহা তাহাও' লিখিয়া, পরে সম্পূর্ণ বাক্যের অর্থ করার সময়ে শুধু 'তাহাও' লিখিয়া বাক্যটার সঙ্গতি রক্ষা করিয়াছেন সুতরাং সে শব্দটা যে এখানে নিরর্থক, উহা তাঁহারও স্বীকার্য বটে। এরূপ অবস্থায় উহা পরিত্যাগ করিয়া ছন্দ ও অর্থের শুদ্ধতা রক্ষা করাই কর্তব্য ছিল। এখানে বলা আবশ্যক বিদ্যাপতির পদের এরূপ বিশ-অক্ষরী লঘু-ত্রিপদী বিরল নহে। নগেন্দ্রবাবুর সংস্করণের ৫৪, ৫৯, ৬২ প্রভৃতি পদেও এরূপ ছন্দ দেখিতে পাওয়া যাইবে। মৈথিল পণ্ডিতের পক্ষে ইহা বুঝা কঠিন হইলেও, নগেন্দ্রবাবুর পক্ষে এরূপ ভ্রম আশ্চর্যের বিষয় বটে।

এখন অর্থের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। নগেন্দ্রবাবু সাধারণ পাঠকের পক্ষে পদের অর্থ সুগম করার জন্য যে শ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তাহা অতীব প্রশংসনীয়। দুঃখের বিষয় যে, স্থানাভাবে অনেক বৈষ্ণব-পদাবলীর টীকাকারই এত বিস্তৃতভাবে পদের শব্দ ও বাক্যের অর্থ লিখিতে পারেন না।

সে যাহা হউক, নগেন্দ্রবাবু টীকায় এত পরিশ্রম করা সত্ত্বেও উহাতে দুই একটা গুরুতর ভুল রহিয়াছে দেখিয়া, আমরা বিনীতভাবে সত্যের অনুরোধে উহা এখানে প্রদর্শিত করিতে বাধ্য হইতেছি।

নগেন্দ্রবাবুর 'বিরুহ' শব্দের অর্থ 'বিরোধ, কটু' লিখিয়াছেন। 'বিরোধ' একটা বিশেষ্য শব্দ; উহার অর্থ বিশেষণ 'কটু' হইবে কি প্রকারে? বোধ হয়, তিনি 'বিরুদ্ধ' শব্দের স্থলেই ভুলে বিরোধ লিখিয়াছেন, অথবা ছাপাখানার ভুলেই 'বিরুদ্ধ' শব্দের স্থলে 'বিরোধ' ছাপা হইয়াছে। যাহা হউক, 'বিরুহ' শব্দটা সংস্কৃত 'বিরুদ্ধ' শব্দেরই অপভ্রংশ। উহার অর্থ 'বিরুদ্ধ' অর্থাৎ 'প্রতিকূল'। উহার সহিত 'কটু' শব্দের অর্থের যথেষ্ট পার্থক্য আছে। কেহ কোন কথা বলিলে এবং অন্যে সেই কথার প্রতিবাদ করিলে, সেই প্রতিবাদকে বিরুদ্ধ বা প্রতিকূল কথা বলা যায়। সত্যের অনুরোধে গুরুজনদিগের কথার বিরুদ্ধ বা প্রতিকূল কথাও অনেক সময়েই বলা আবশ্যক হয়। কিন্তু 'কটু' কথা কখনই বলা সঙ্গত নহে। রমণী-রত্ন শ্রীরাধা কি 'কটু বাক্য কহা অনুচিত' আমাদের শৈশবশ্রুত এই সাধারণ নীতিটা জানিতেন না, তিনি এতই কোপনা ও অরসিকা ছিলেন যে, প্রিয়তমের বার্তা-বাহিনী দূতীর প্রতিও কটুবাক্য প্রয়োগ করিতেন? একটু প্রণিধান করিলেই বুঝা যাইবে 'বিরুহ' শব্দের অর্থ এখানে 'কটু-কথা' কোন মতেই সঙ্গত হইতে পারে না। এখানে ইহার একমাত্র সঙ্গত অর্থ 'প্রতিকূল কথা'। দূতীর কথার আভাসে বেশ বুঝা যায় যে, দূতী শ্রীরাধার নিকট কৌশলে অভীষ্ট কার্যের প্রস্তাব উপস্থিত করিলে, চতুরা শ্রীরাধা দূতীর উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া, যে জন্যই হউক উহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার ঐ প্রতিবাদের বা বিরুদ্ধ-উক্তির বলিবার ভঙ্গী এত সুন্দর যে, সেই বিরুদ্ধ উক্তিও দূতীর কাছে অমৃততুল্য প্রতীয়মান হইয়াছিল। বস্তুতঃ সুন্দর ও প্রেমবতী নায়িকাদিগের অসম্মতিসূচক বাক্যেও এমন একটা আকর্ষিণী শক্তি আছে, যে তাহাতে কেহই মোহিত না হইয়া পারে না। প্রেমাসক্ত নায়কদিগের পক্ষেও প্রণয়িনীর এরূপ সবিলাস নিষেধ উক্তি অমৃততুল্যই বটে। সুচতুরা দূতী শ্রীকৃষ্ণকে সমধিক প্রলোভিত করিবার উদ্দেশ্যেই এখানে এ প্রসঙ্গটা এ ভাবে করিয়াছেন। 'কটু কথা' অর্থ করিলে দূতীর কথার কোন চমৎকারিত্বই থাকে না, বরং উহা দ্বারা রমণীরত্ন শ্রীরাধার চরিত্রের নিন্দনীয়তা এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রেরিত দূতীর প্রতি কটূক্তি করা হেতু শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের

বিরক্তির সঙ্গত কারণ আশঙ্কিত হইতে পারে। মহাকবি বিদ্যাপতির কবিতার কি এরূপ রসবিরুদ্ধ অর্থ করা যাইতে পারে? বস্তুতঃ এই পদের 'জেও কিছু ধনি' ইত্যাদি ধ্বনিপূর্ণ অপূর্ব বাক্যটীতে কবি রসজ্ঞতার যে কিরূপ পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা অল্প কথায় ব্যাখ্যা করা অসম্ভব ; বেশী কথা বলিলেও ধ্বনির মাধুর্য নষ্ট হইয়া যায় সুতরাং আমরা রসজ্ঞ পাঠক মহাশয়দিগকেই ইহার অনির্বচনীয় মাধুর্য কল্পনায় আস্বাদন করিতে অনুরোধ করিতেছি।

নগেন্দ্রবাবু শেষ পংক্তি দুইটীর যে অর্থ করিয়াছেন, উহাও কোনরূপেই সঙ্গত মনে হয় না।

'বিরসল' শব্দের অর্থ কোনরূপেই 'ভোগ' করাইল করা যাইতে পারে না। 'বি' বা 'নি' উপসর্গ যোগ করিলে 'রস' ধাতুর অর্থ আস্বাদন না বুঝাইয়া আস্বাদনের অভাবই বুঝাইয়া থাকে। 'বিরসল' শব্দের এক মাত্র অর্থ করা যাইতে পারে, 'বিরস' বা 'রস-হীন' হইল। উহা হইতে কোনরূপেই টানিয়া 'ভোগ করাইল' অর্থ করা যাইতে পারে না; সুতরাং নগেন্দ্রবাবুর এই ব্যাখ্যাও সঙ্গত হয় না। আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস যে, এখানেও লিপিকরের ভুলে একটা পাঠ বিভ্রাট ঘটিয়াছে। বোধহয় বিরসল শব্দের স্থলে 'বিসরল' (অর্থাৎ বিস্মৃত হইল) প্রকৃত পাঠ ছিল, কিন্তু 'বাতাস', 'বাসক', 'বাক্স' ইত্যাদি শব্দের স্থলে অনেক সময়েই ভুলে উচ্চারিত 'বাসাত', 'বাকস', 'বাস্ক' ইত্যাদির ন্যায় পদের গায়ক বা লেখকের ভুলে 'বিরসল' পাঠে পরিণত হইয়াছে। 'বিসরল' পাঠ ধরিলে অর্থ হইবে 'এতদিনে (নায়িকা শ্রীরাধা) তোমাতে অর্থাৎ তোমার উপর রস অর্থাৎ অনুরাগ বিস্মৃত হইল, (তথাপি) এখন পর্যন্ত তোমার বিরাম নাই অর্থাৎ এখন পর্যন্তও তুমি তাঁহার দেহেই আছ।'

যদি কেহ আমাদের অনুমিত 'বিসরল' পাঠ গ্রহণ না করিয়া 'বিরসল' পাঠই ঠিক রাখিতে চাহেন, তাহা হইলেও নগেন্দ্রবাবুর ন্যায় কাল্পনিক অর্থ করা চলিবে না; উহার জন্য সঙ্গত অর্থ খুঁজিতে হইবে। আমাদের বিবেচনায় 'বিরসল' পাঠ ঠিক ধরিলে অগত্যা এরূপ অর্থ করিতে হইবে—এত দিনে (শ্রীরাধার) অনুরাগ তোমার উপরে রস-হীন হইল। কিংবা 'বিরসল' শব্দটীকে ক্রিয়াপদ না ধরিয়া, 'বিরস' শব্দের উত্তর যুক্ত অর্থে বাঙ্গালা তদ্ধিত প্রত্যয় 'ল' যোগে 'বিরসল' (অর্থাৎ বিরসযুক্ত) পদটী সিদ্ধ করিয়া অর্থ করা যাইতে পারে—তোমার উপরের শ্রীরাধার যে রস বা অনুরাগ

ছিল, এত দিনে তাহা বিরস-যুক্ত অর্থাৎ বিরাগযুক্ত হইল। এরূপ অর্থ করিলে না করা যাইতে পারে এমত নহে। তথাপি আমাদের বিবেচনা হয় যে, এই অর্থ অপেক্ষা 'বিসরল' পাঠের অর্থই অধিক সঙ্গত এবং খুব সম্ভবতঃ "বিসরল"ই মৌলিক পাঠ ছিল, কিন্তু গায়ক বা লেখকদিগের ভ্রমেই উহা "বিরসল" পাঠে পরিণত হইয়াছে।

"বিরসল" পাঠ যে প্রকৃত নহে, এরূপ অনুমান করার ইহাও একটা কারণ বটে যে, আমরা বিস্মৃত হইল অর্থে বিসরল শব্দের বহু প্রয়োগ বিদ্যাপতি ও অন্যান্য বৈষ্ণব পদাবলীতে পাইয়াছি, কিন্তু রসহীন হইল বা 'রসহীন' অর্থে নিরসল শব্দ ব্যতীত 'বিরসল' এই 'তিঙন্ত' ক্রিয়াপদ বা 'তদ্ধিত প্রত্যয়ান্ত' বিশেষণ পদের প্রয়োগ পদাবলী সাহিত্যে কুত্রাপি পাই নাই; বিদ্যাপতির মৈথিল পদেও পাইয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। "নিরসল রসিক মুরারি" ইত্যাদির মত রসহীন হইল অর্থে "নিরসল" শব্দের প্রয়োগ বহু দেখা গিয়াছে। 'বি' উপসর্গের অর্থ 'বিশেষরূপে' ধরিয়া 'বিরসল' রূপ একটী নূতন ক্রিয়াপদের সৃষ্টি করা হইয়াছে, যদি তর্কস্থলে এরূপও স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও উহার "বিশেষরূপে রসযুক্ত হইল" অর্থ না হইয়া, "বিশেষরূপে রস ভোগ করাইল"—এরূপ অদ্ভুত অর্থ কোন ব্যাকরণ বা ভাষা-তত্ত্বের নিয়ম অনুসারে সিদ্ধ হইতে পারে না; সুতরাং আমাদিগের বিবেচনায় নগেন্দ্রবাবুর 'বিরসল' পাঠের যে অর্থ করিয়াছেন, উহা কোনরূপেই সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না।

(১৪ সংখ্যক পদ)

নগেন্দ্রবাবুর ১৪ সংখ্যক "কি আরে নব জৌবন অভিরামা" ইত্যাদি পদটা শ্রীযুক্ত রামবৃক্ষ শর্মা বেণীপুরী মহাশয়ের সম্পাদিত 'বিদ্যাপতি কী পদাবলী' নামক গ্রন্থেও উদ্ধৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থ দরভঙ্গা, লহেরিয়া সরায় ঠিকানায় হিন্দী পুস্তক ভাণ্ডারে পাওয়া যায়। ইহা হিন্দী সাহিত্যের উপাধি পরীক্ষার অন্যতম পাঠ্য গ্রন্থ। নগেন্দ্রবাবুর সংস্করণ যাঁহাদিগের নাই তাঁহারা উক্ত সংস্করণ এখন অপ্রাপ্য বলিয়া, সম্পূর্ণ পদটী দেখিতে ইচ্ছা করিলে বেণীপুরী মহাশয়ের সংস্করণের ১১ সংখ্যক পদ দেখিবেন। আলোচনার সংক্ষেপের জন্য আমরা অতঃপর নগেন্দ্রবাবুর যে পদগুলি বঙ্গীয় অন্যান্য সংস্করণে না থাকিলেও বেণীপুরী

মহাশয়ের সংস্করণে বা পূর্বোক্ত ব্রজনন্দন সহায় মহাশয়ের 'মৈথিল কোকিল বিদ্যাপতি' গ্রন্থে আছে, সেগুলি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত না করিয়া ঐ দুইটী সংস্করণের উপরই বরাত দিব।

অন্যান্য অধিকাংশ পদের ন্যায় এই পদটীর ছন্দ ও মাত্রার বিবরণেও নগেন্দ্রবাবু যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ ভুল। নগেন্দ্রবাবুর লিখিত 'আহিরাণী ভীমপলাশী ছন্দ' নামে কোন ছন্দ নাই। "আহিরী" ও "ভীমপলাশী" দুইটি রাগিণী (হিন্দী ভাষায়—'রাগ') বটে। নগেন্দ্রবাবু বা তাঁহার মৈথিল উপদেষ্টা এখানেও ভুলে রাগিণীর নামে একটা নূতন ছন্দ বুঝিয়াছেন। সে যাহা হউক যদি মাত্রার পরিচয়টা ঠিক থাকিত, তাহা হইলে এই নামের ভুলে বিশেষ কিছু আসিয়া যাইত না। কিন্তু নগেন্দ্রবাবু উহার মাত্রার বিবরণে—"২৬ হইতে ৩০ মাত্রা। প্রত্যন্তর ১৩ মাত্রা" লিখিয়া পদটীর মাত্রা সম্বন্ধেও নিতান্ত ভ্রান্তিপূর্ণ একটা মত প্রকাশ করিয়াছেন। "কি আরে" ইত্যাদি ধ্রুব-কলির প্রথম চরণ নগেন্দ্রবাবুর প্রত্যন্তর ছাড়া এই মাত্রা ত্রিপদী ছন্দের পদটীর প্রত্যেক অর্দ্ধ কলিতে (Half stanza) গীতগোবিন্দের "ললিত লবঙ্গ লতা" ইত্যাদি পদের মত ২৮ মাত্রা আছে। নগেন্দ্রবাবু পদটীর ছন্দ ধরিতে না পারায়, তাঁহার উদ্ধৃত পাঠে স্থানে স্থানে ছন্দোভঙ্গ ঘটিয়াছে, যথা "হরিণ ইন্দু অরবিন্দ করিনি হিম পিক বুঝ অনুমানী।"

'বুঝ' পাঠে এক মাত্রা কম পড়ায় ছন্দোভঙ্গ ঘটে। বেণীপুরী মহাশয় 'বুঝ' হলে সমানার্থ বুঝল পাঠ ধরিয়া ছন্দোভঙ্গ নিবারণ করিয়াছেন। নগেন্দ্রবাবু অবলম্বিত তালপত্রের পুথির উপরে তাঁহার অবিচলিত শ্রদ্ধা থাকিলেও ঐ পুথিও নির্ভরযোগ্য নহে, ইহা এবং ইহার মত আরও বহু উদাহরণ হইতেই উহা বেশ বুঝা গিয়াছে। পদের নিম্নোদ্ধৃত অংশ দেখুন—

কুচযুগ পর চিকুর ফুজি পসরল
তা অরুঝায়ল হারা।
জনি সুমেরু উপর মিলি উগল
চাঁদ বিহুন সব তারা॥

নগেন্দ্রবাবুর এই পাঠে "কুচযুগ" ইত্যাদি চরণে এক মাত্রা কম ও "জনি সুমেরু" ইত্যাদি চরণে তিন মাত্রা কম আছে। বেণীপুরী মহাশয় যে জন্য নিম্নলিখিত পাঠ ধরিয়াছেন, যথা —

কুচজুগ পরসি চিকুর ফুজি পরসল
তা অরুঝায়ল হারা।
জনি সুমেরু উপর মিলি উগল
চাঁদ বিহিন্থ সব তারা॥

'পর' স্থলে 'পরসি' পাঠ ধরায়, ছন্দের এক মাত্রার পূরণ হইয়াছে বটে, কিন্তু অর্থের ব্যতিক্রম হইয়া পড়িয়াছে। উদ্ধৃত কলির অর্থ এই যে শ্রীরাধার চিকুর কেশ ফুজি অর্থাৎ খুলিয়া যাইয়া কুচযুগের উপরে প্রসারিত হইল, তাহাতে মুক্তার হার জড়াইয়া গেল। দেখিয়া মনে হইল যেন স্বর্ণময় সুমেরুর চন্দ্রবিহীন তারা সমূহ উদিত হইল।

এখানে 'পরসি' পাঠ কল্পনা করিলে, অর্থ হইবে যে, শ্রীরাধার কেশ খুলিয়া যাইয়া, তাঁহার কুচযুগলকে স্পর্শ করিয়া প্রসারিত হইল ইত্যাদি। বলা বাহুল্য যে, এখানে 'পরসি' অপেক্ষা 'পর' বা উপর পাঠেই সঙ্গত অন্বয় ও উপমার সৌন্দর্য অধিক রক্ষিত হয়। সুতরাং আমাদিগের বিবেচনায় পরসি পাঠ কল্পনা না করিয়া এখানেও শেষার্দ্ধের ন্যায় 'পর' স্থলে সমার্থক 'উপর' পাঠ গ্রহণ করিয়া ছন্দ ও অর্থ রক্ষা করাই সঙ্গত। 'জনি সুমেরু' ইত্যাদির স্থলে বেণীপুরী মহাশয় যে পাঠ কল্পনা করিয়াছেন, উহাতে মাত্রাগণনায় ২৮ মাত্রা পাওয়া গেলেও, উহার "জনি সুমেরু উপর" ইত্যাদি অংশে মাত্রাবিভাগের সাধারণ ও সহজ রীতির ব্যতিক্রম হেতু পড়িতে কানে বাজে, সুতরাং উহার মাত্রাবিভাগ নির্দোষ বলা যায় না। কিন্তু এরূপ মাত্রাবিভাগের ব্যতিক্রম ছন্দোভঙ্গ হইতে বহুগুণে শ্রেয়ঃ বলিয়া, এখানে অগত্যা বেণীপুরী মহাশয়ের পাঠই স্বীকার্য বটে।

নগেন্দ্রবাবুর ধৃত আর একটী অর্দ্ধ কলি, যথা —

লোল কপোল ললিত মাল কুণ্ডল
অধর বিম্ব অধ জাই।

এখানে 'মাল' শব্দে একমাত্রা অধিক আছে; তাই বেণীপুরী মহাশয় 'মাল' স্থলে 'মণি' পাঠ ধরিয়াছেন। বস্তুতঃ এখানে মাল শব্দের দ্বারা ছন্দ বা অর্থ কোনটাই রক্ষিত হয় না; সুতরাং 'মণিকুণ্ডল' পাঠই সঙ্গত বোধ হয়। সম্ভবতঃ আদর্শ পুথির 'মণি' শব্দটী পাঠোদ্ধারের ভুলে 'মাল' হইয়াছে। প্রাচীন হস্ত-লিখিত পুথির পাঠোদ্ধার অতি কঠিন কার্য। একটু অসতর্কতা ঘটিলেই উহার ফলে এরূপ পাঠবিভ্রাট অনিবার্য হইয়া পড়ে। পাঠোদ্ধারের এরূপ ভ্রম পরেও

অনেক দেখা যাইবে। আমরা নগেন্দ্রবাবুর তালপত্রের পুথি দেখি নাই; সুতরাং ইহা লিপিকরের ভুল কিনা ইহাও নিশ্চিত বলিতে পারি না। বস্তুতঃ আদর্শ পুথিতে "মাল" পাঠ থাকিলেও উহাতে যে ছন্দ বা অর্থ রক্ষিত হয় না, ইহা সম্পাদক মহাশয়ের বুঝা উচিত ছিল। বেণীপুরী মহাশয় এখানে প্রশংসনীয় নিপুণতার পরিচয় দিয়াছেন।

পদের অর্থের সম্বন্ধে বিশেষ বক্তব্য কিছু নাই; তবে 'হরিণ ইন্দু' ইত্যাদি চরণের 'হিম' (বেণীপুরী মহাশয়ের সংস্করণের 'হেম') শব্দের সম্বন্ধে একটা কৌতুকজনক বিষয় আছে, উহা বলিয়াই আজ আমাদের বক্তব্য শেষ করিব। 'হরিণ ইন্দু' ইত্যাদি অর্দ্ধ কলির বাকি অর্দ্ধ, যথা —

নয়ন বয়ন পরিমল গতি তনুরুচি
অও অতি সুললিত বাণী॥

সম্পূর্ণ কলির অর্থ— হরিণ, চন্দ্র, পদ্ম, হস্তিনী, স্বর্ণ ও পিক, — অনুমান করিয়া বুঝিলাম (উহারা যথাক্রমে শ্রীরাধার) নয়ন, বদন, পরিমল অর্থাৎ অঙ্গসৌরভ, গতি, অঙ্গকান্তি ও অত্যন্ত সুললিত বাণী।

নগেন্দ্রবাবু বোধহয় আদর্শ পুথির অনুযায়ী 'হিম' পাঠ ও বেণীপুরী মহাশয় ঐ পাঠ অসঙ্গত মনে করিয়া 'হেম' পাঠ ধরিয়াছেন এবং উহার অর্থ একজনে 'তুষার' ও অন্যজনে 'সোনা' লিখিয়াছেন। বস্তুতঃ প্রতীচ্য খণ্ডের তুষার-ধবলা সুন্দরীদিগের শুভ্র তুষারকান্তি অত্রত্য নাগরদিগের মনোহরণ করিলেও আমাদের দেশে সুন্দরীদিগের স্বর্ণকান্তি বা চাঁপা ফুলের রংই বিশেষ প্রশংসিত বটে। এখানে তুষারধবল বর্ণ যে অস্বাভাবিক বলিয়া কেবল কবির বর্ণনায় অচল, তাহা নহে; এরূপ বর্ণ কুৎসিত রোগবিশেষের সূচিজনক বলিয়া নিন্দনীয়ও বটে। যেখানে ভারতীয় কবিগণ 'গৌরী' বা 'গৌরাঙ্গী' নায়িকার গৌরকান্তির প্রশংসা করেন, সেখানেই সেই 'গৌর' বর্ণকে দুগ্ধ বা তুষারের ন্যায় শ্বেত না বুঝিয়া আমাদের 'সোনার গৌরাঙ্গে'র অঙ্গকান্তির দৃষ্টান্তে স্বর্ণবর্ণ বা চম্পক-বর্ণই বুঝিতে হইবে। 'শব্দকল্পদ্রুমে' 'গৌর' শব্দের শুধু 'পীতবর্ণ' অর্থই দৃষ্ট হয়। সুতরাং নগেন্দ্রবাবু 'হিম' শব্দে 'হেম' না বুঝিয়া, যে তুষার বুঝিয়াছেন,— ইহা তাঁহার নিতান্তই ভ্রম হইয়াছে। মৈথিলীতে একার বিকল্পে হ্রস্ব উচ্চারিত হয় বলিয়া 'হেম' অনেকটা 'হিম'বৎ

শোনা যায়। আদর্শ পুথির লিপিকর এখানে উচ্চারণানুযায়ী বানান দিতে যাইয়াই এই গোলযোগের সৃষ্টি করিয়াছেন। এখানে 'হেম' পাঠ ও উহার 'স্বর্ণ' অর্থই সঙ্গত বটে।

(১৫ সংখ্যক পদ)

নগেন্দ্রবাবুর সংস্করণের ১৫ সংখ্যক "লঘু লঘু সঞ্চর কুটিল কটাখ" ইত্যাদি পদটী আমাদের ভূমিকায় উল্লিখিত 'মৈথিল-কোকিল বিদ্যাপতি' নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। যাহাদের নিকট নগেন্দ্রবাবুর বিদ্যাপতি নাই, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে উক্ত গ্রন্থেও দেখিতে পারিবেন। তাই বাহুল্যভয়ে আমরা সম্পূর্ণ পদটী এখানে উদ্ধৃত না করিয়া কেবল আপত্তিজনক শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধেই আলোচনা করিব।

(১) পদের প্রথম কলি—

লঘু লঘু সঞ্চর কুটিল কটাখ।
দুঅও নয়ন লহ এক হোক লাখ॥

নগেন্দ্রবাবু টীকা করিয়াছেন—

২। লহ—অনুমান হয়। ১—২। কুটিল কটাক্ষ লঘু লঘু সঞ্চরণ করে, দুই নয়ন এক লক্ষ অনুমান হয় (যেন লক্ষ নয়নে কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছে)।

'মৈথিল-কোকিল বিদ্যাপতি' গ্রন্থের সম্পাদক মহাশয় দ্বিতীয় পংক্তির 'দুঅও' স্থলে 'দুঅউ' ও 'একহোক' স্থলে 'য়ক হোক' পাঠ কল্পনা করিয়া অর্থ লিখিয়াছেন— 'দোনেঁা আঁখেঁ এক্ হো কর্ (সাথ্ হী সাথ্) কটাক্ষ কর্তী হৈঁ'। তাঁহার মতে 'হোক' একটা শব্দ নহে ; উহা 'হো কর্' শব্দদ্বয়ের সংক্ষিপ্ত রূপ। হিন্দীতে 'হো কর্' শব্দদ্বয়ের পরিবর্তে অনেক সময়ে সংক্ষিপ্ত 'হোকে' রূপটী পাওয়া গেলেও বিদ্যাপতির প্রাচীন মৈথিল ভাষায় 'হো কর' বা 'হোকে' — ইহার কোন রূপেরই প্রয়োগ দেখা যায় না। 'হো কর' অর্থাৎ 'হইয়া' অর্থে বিদ্যাপতিতে সর্বত্রই 'হোয়' বা 'হোই' প্রয়োগ পাওয়া যায় ; সুতরাং ব্রজনন্দনবাবুর 'হো কর্' অর্থ সমীচীন নহে। তিনি 'লহ' ও 'লাখ' শব্দদ্বয়ের অর্থও ছাড়িয়া দিয়াছেন। তাঁহার অর্থে ঐ শব্দ দুইটীর কোন প্রয়োজন বা অবকাশ ঘটে না ; সুতরাং তাঁহার উক্ত পাঠ বা অর্থ— কিছুই সঙ্গত মনে হয় না। নগেন্দ্রবাবু যে তাৎপর্য অর্থ লিখিয়াছেন, উহাই যে একমাত্র

সঙ্গত ও সুন্দর অর্থ, তাহাতে সন্দেহ নাই ; কিন্তু তিনি যে 'লহ' শব্দের অর্থ 'অনুমান হয়' এবং 'এক হোক' শব্দের অর্থ 'এক' ধরিয়াছেন, তাহা শুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করা যায় না। বস্তুতঃ আলোচ্য শব্দের ব্যুৎপত্তি (Derivation) স্থির না করিতে পারিলে, শুধু প্রক্রম (Context) দেখিয়া আন্দাজে অর্থ করিতে গেলে পদে পদেই এরূপ অর্থবিভ্রাট ঘটিয়া থাকে। আমাদের বিবেচনায় এখানেও সেরূপ বিভ্রাটই ঘটিয়াছে। 'লহ' শব্দের 'অনুমান হয়' অর্থ হিন্দী মৈথিল প্রভৃতি সংস্কৃতের অপভ্রংশ কোন ভাষায়ই সিদ্ধ হয় না। সংস্কৃত শব্দের মধ্য বা অন্ত্যস্থিত 'ভ' অপভ্রংশ ভাষায় 'হ' হইয়া যায়। সংস্কৃত 'লভ' হইতে এই রূপেই 'লহ' ও পরে 'লঅ' বা 'লয়' হইয়াছে। সংস্কৃত ব্যাকরণ শাস্ত্রের একটা সুপ্রসিদ্ধ উক্তি—'সর্বে গত্যর্থাঃ প্রাপ্ত্যর্থাঃ জ্ঞানার্থাশ্চ সমানাঃ।' অর্থাৎ সকল গতি অর্থবিশিষ্ট, প্রাপ্তি অর্থবিশিষ্ট ও জ্ঞান অর্থবিশিষ্ট ধাতুই সমান অর্থাৎ উহাদিগের একতম ধাতুর দ্বারা অন্যতম ধাতুর অর্থ প্রকাশ পায়। প্রাপ্তি অর্থক 'লভ' বা 'লহ' ধাতুর অর্থ লাভ করা, উহা দ্বারা 'গমন করা' বা 'বোধ করা' অর্থও প্রকাশিত হইতে পারে। প্রাপ্তি-অর্থক মৈথিল 'লহ' ধাতুর বর্তমান কালের প্রথম পুরুষে 'লহই' 'লহে' 'লহ'—তিন প্রকার রূপই প্রসিদ্ধ বটে। এখানে 'লহ' বা 'লাভ করে' অর্থ দ্বারাই 'বোধ করে' অর্থ পাওয়া যাইতেছে। 'এক হোক' শব্দ সংস্কৃত 'একৈক' শব্দের অপভ্রংশ বটে। 'একৈক'—'একইক'—'একহিক'—'একহুক' ভাষাতত্ত্বের নিয়মানুযায়ী। এখানে ছন্দের জন্য 'একহোক' শব্দের 'হো' 'হু' অক্ষরের মতই লঘু উচ্চারিত হইবে। সুতরাং আলোচ্য পংক্তিটীর প্রকৃত অর্থ—(দর্শক) দুইটী নয়নকেই এক এক লক্ষ বোধ করে। অর্থাৎ নায়িকার দুইটী নয়নের কটাক্ষই রসজ্ঞ দর্শকের উপর লক্ষ কটাক্ষের কার্য করিয়া, তাঁহাকে সম্পূর্ণ নির্জিত করিয়া ফেলে।

(২) কাহাই নয়না হলিঅ নিবারি।
যে অণুপম উপভোগ ন আবএ
কী ফল তাহি নিহারি॥

নগেন্দ্রবাবু টীকায় লিখিয়াছেন—

৫। হলিঅ—যাও, চল। উপভোগ—উপভোগ জন্য। আবয়—আসে। তাহি—তাহাকে। ৫-৬। কানাই, নয়ন নিবারিয়া চল (দেখিও না), (যে সামগ্রী) উপভোগে আসে না, তাহাকে দেখিয়া কি ফল ?

এখানেও নগেন্দ্রবাবু তাৎপর্য অর্থ ঠিকই লিখিয়াছেন, কিন্তু 'হলিও' শব্দের অর্থে গোলযোগ করিয়াছেন। 'হলিঅ' শব্দের 'যাও' বা 'চল' অর্থ হিন্দী বা মৈথিল ভাষায় পাওয়া যায় না। আমাদিগের মতে 'হলিঅ' 'লহিঅ' শব্দেরই রূপান্তর বটে। সংস্কৃত 'লভ' হইতে পূর্ব প্রদর্শিত 'লহ' এবং 'লহ' শব্দের অক্ষর বিপর্যাস দ্বারা 'হল' হওয়া ভাষাতত্ত্ব অনুসারে নিতান্ত স্বাভাবিক। সুতরাং 'হলিঅ' বা 'লহিঅ' শব্দের একমাত্র সঙ্গত অর্থ 'লইও'। দূতী বলিতেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ! নয়ন নিবারণ করিয়া লইও; (কেননা) যে অনুপম (দ্রব্য) উপভোগে আসে না, তাহা দেখিয়া কি ফল?

ব্রজনন্দনবাবু নগেন্দ্রবাবুর ধৃত 'হলিএ' পাঠের কোন সঙ্গত অর্থ বুঝিতে না পারিয়া তৎস্থলে 'চলিএ' পাঠ কল্পনা করিয়াছেন। আমরা ইতিপূর্বে স্থানান্তরে বলিয়াছি, এখনও বিশেষ করিয়া বলিতেছি যে প্রাচীন সাহিত্যের কোন দুরূহ শব্দের অর্থ বুঝিতে না পারা সম্পাদকের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে, সেজন্য তাঁহাকে অপরাধী করা যাইতে পারে না, কিন্তু অর্থ বুঝিতে না পারিয়া সম্পাদক যদি কিছু না বলিয়া এরূপ কল্পিত পাঠ সন্নিবেশিত করেন, তাহা হইলে উহা নিশ্চিতই সম্পাদকের একটা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। নগেন্দ্রবাবু তাঁহার সুবৃহৎ সংস্করণের প্রায় কোন স্থলেই কোন সন্দিগ্ধ শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ের জন্য চেষ্টা করেন নাই; সেজন্য বহু স্থলেই তাঁহার আনুমানিক শব্দার্থে এরূপ অসঙ্গতি রহিয়াছে; কিন্তু প্রশংসার বিষয় যে, তিনি 'জনু' ও 'জনি' শব্দের মত দুই চারিটী ব্যাপক শব্দের ভ্রান্তিজনিত রূপ পরিবর্তন ব্যতীত 'হলিঅ' স্থলে 'চলিএ' শব্দের মত পাঠ পরিবর্তন বড় একটা করেন নাই। সেজন্যই তাঁহার অবলম্বিত মৈথিল তালপত্রের পুথির এই সন্দিগ্ধ দুরূহ পাঠগুলি আমরা যথাযথরূপে দেখিতে পাইতেছি। যদি তিনিও ব্রজনন্দনবাবুর মত 'হলিঅ' স্থলে 'চলিঅ' বা 'চলিএ' পাঠই লিখিতেন, তাহা হইলে 'লহিঅ' স্থলে 'হলিঅ'—এই বৈকল্পিক রূপটী আমরা দেখিতে পাইতাম না।

কেহ বলিতে পারেন 'লহিঅ' স্থলে 'হলিঅ' রূপটী যে লিপিকরের প্রমাদজনিত নহে সে সম্বন্ধে কি প্রমাণ আছে? যদি আমরা বিদ্যাপতির পদাবলী হইতে 'হলিঅ' শব্দের আরও দুই চারিটা এরূপ প্রয়োগ দেখাইতে পারিতাম, তাহা হইলে ইহা লিপিকরের ভ্রম নহে, ইহা জোর করিয়া বলা

যাইতে পারে! কিন্তু আমরা এরূপ প্রয়োগ আর পাইয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না; সুতরাং ইহা লিপিকরের ভ্রম হইলেও হইতে পারে। বস্তুতঃ 'হলিঅ' কিংবা 'লহিঅ' যাহাই প্রকৃত পাঠ হউক না কেন, উহার অর্থ 'লইও' ব্যতীত 'যাও' বা 'চল' নহে, ইহা জোর করিয়াই বলা যাইতে পারে। অপভ্রংশ ভাষায় অক্ষর বিপর্যাসের অনেক দৃষ্টান্তই দেখিতে পাওয়া যায় সুতরাং 'লহিঅ' স্থলে 'হলিঅ' হওয়াও ভাষাতত্ত্বের নিয়মানুসারে অসম্ভব নহে, ইহাই আমাদের বক্তব্য বটে। নগেন্দ্রবাবুর সংস্করণের ১৩ সংখ্যক "জেহে অবয়ব" ইত্যাদি পদের 'বিরসল' শব্দটীর সম্বন্ধে আমরা (৮) সংখ্যক প্রবন্ধে যে বিচার করিয়াছি, পাঠক উহাতেই লিপিকর কর্তৃক ভুলে শব্দের অক্ষর বিপর্যাসের একটা সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইয়াছেন। সুতরাং নগেন্দ্রবাবুর অবলম্বিত তালপত্রের পুথির বিশুদ্ধির উপর তাঁহার একান্ত বিশ্বাস থাকিলেও, উহাতেও যে লিপিকরের ভ্রম না ঘটিয়াছে এরূপ মনে করার কারণ নাই। আমরা তালপত্রের পুথির পাঠেও স্থানে স্থানে অনেক ত্রুটী ও ভুল লক্ষ্য করিয়াছি, যথাস্থানে সে সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

(১৬ সংখ্যক পদ)

নগেন্দ্রবাবুর সংস্করণের "কণকলতা অরবিন্দা" ইত্যাদি ১৬ সংখ্যক পদটীর সম্বন্ধে আমাদিগের বিশেষ কিছু বক্তব্য নাই। ঐ পদটী মৈথিল তালপত্রের পুথি হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। 'রাগতরঙ্গিণী' নামক মৈথিল পদসংগ্রহ পুথি হইতে ঐ পদের যে রূপান্তর নগেন্দ্রবাবু উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহার পঞ্চম কলিতে পাঠ আছে—

কবিরতনাই ভানে।
সঙ্ক কলঙ্ক দুঅও অসমানে॥

নগেন্দ্রবাবু এই 'কবিরতনাই' বা 'কবি রতন' শব্দ বঙ্গদেশের পদাবলীর 'কবিরঞ্জন' শব্দের ন্যায় বিদ্যাপতিরই অন্যতম উপাধি বলিয়া অনুমান করেন। নগেন্দ্রবাবু যে পদটীর ছন্দের সম্বন্ধে টীকায় লিখিয়াছেন "প্রথম চরণ ১২ মাত্রা। দ্বিতীয় ১৬।", ইহা সত্য বটে। এইরূপ ছন্দের আরও দৃষ্টান্ত বিদ্যাপতির পদে এবং অন্যান্য বৈষ্ণব পদাবলীতে পাওয়া যায়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এখানে নগেন্দ্রবাবু পদটীর শুদ্ধ মাত্রাবিবরণ দিয়াও টীকার প্রারম্ভেই

'রাগতরঙ্গিণী' পুথি হইতে "চতুষ্কল চতুষ্ক্রান্তা রুদ্রসংখ্যকলাদিকাঃ। কলা অনিয়তা যত্র পদার্দ্ধে সা তু ভোগিনী।" লক্ষণ-শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়া, এই ছন্দের নাম দিয়াছেন "ভোগিন্যাসাবরী ছন্দ।" উদ্ধৃত শ্লোকের "চতুষ্ক্রান্তা" শব্দটী বোধহয় 'চতুষ্কান্তা' শব্দের স্থলে লিপিকরের ভুল। শ্লোকের একমাত্র সঙ্গত অর্থ এই যে, যে পদার্দ্ধে (পয়ারে) কলা (মাত্রা) অসমান, অন্ত্য চরণ চতুষ্কল (চতুর্মাত্রিক) অর্থাৎ চারিটী অংশযুক্ত এবং আদ্য চরণ দ্বাদশ মাত্রা যুক্ত উহাকে 'ভোগিনী' ছন্দ বলা হয়। বস্তুতঃ 'আসাবরী' বা 'আসোয়ারী' কোন ছন্দের নাম নহে, উহা একটা প্রসিদ্ধ রাগিণী। 'রাগতরঙ্গিণী' গ্রন্থের মতে ইহা 'ভোগিনী' ছন্দের পদ, 'আসাবরী' রাগিণী সংযোগে গেয়, সুতরাং এই 'ভোগিন্যাসাবরী' সাঙ্কেতিক শব্দটাকে ছন্দের নাম মনে করিয়া নগেন্দ্রবাবু এখানেও হাস্যজনক ভুল করিয়াছেন। 'ভোগিনী' নামটী এতদ্দেশে প্রচলিত নাই, সুতরাং অন্য পূর্বোক্ত নামের অভাবে বিষমমাত্রিক পয়ার ছন্দের 'ভোগিনী' নামকরণ করিলে মন্দ হয় না। এই 'ভোগিনী' ছন্দের—

কামিনী করই সিনান।
হেরইতে হৃদয় হনল পঁচ-বাণ॥

ইত্যাদি বিদ্যাপতির পদ এবং

মধুর মধুর তুয় রূপ।
জগ-জন-লোচন-অমিয় স্বরূপ॥

ইত্যাদি গোবিন্দদাস প্রভৃতি বঙ্গীয় বৈষ্ণব কবিদিগের অনেক পদ প্রসিদ্ধ বটে।

নগেন্দ্রবাবুর সংস্করণের "মাধব কি কহব সুন্দরি-রূপে" ইত্যাদি ১৭ সংখ্যক পদটী গ্রীয়ারসন সাহেব মহোদয়ের সংস্করণে, কাব্যবিশারদের সংস্করণে এবং ভজনন্দন সহায় ও বেণীপুরী শর্মার হিন্দী সংস্করণে সর্বত্রই দৃষ্ট হয়। নগেন্দ্রবাবুর পাঠ প্রায় গ্রীয়ারসন সাহেবের ধৃত মৈথিল পাঠের অনুরূপ। কাব্যবিশারদ মহাশয়ের গৃহীত বঙ্গীয় পুথির পাঠের সহিত ঐ পাঠের সামান্য সামান্য প্রভেদ লক্ষিত হয়। যেখানে পাঠ-বৈষম্য হেতু পদের অর্থে গুরুতর বৈষম্য উপস্থিত হইয়াছে এবং তজ্জন্য কোনটী শুদ্ধ পাঠ সে বিষয়েও সন্দেহ জন্মিয়াছে, আমরা কেবল সেইরূপ দুই তিনটী স্থলের সম্বন্ধেই আলোচনা করিব।

অধর বিম্ব সন দশন দাড়িম্ব বিজু
রবি শশি উগথিক পাশে।

রাহু দূরি বস নিয়রো ন আবথি
তেঁই নহি করথি গরাসে ॥ ৮ ।

গ্রীয়ারসন সাহেব ও নগেন্দ্রবাবু প্রভৃতির এই কলিটীর স্থলে কাব্যবিশারদ মহাশয়ের ধৃত পাঠ, যথা —

অধর বিম্ব সনে দশন দাড়িম্ব বীজ
রবি শশী উভয় পাশ ।
রাহু দূরে রহু নিকটে না আওয়ে
তেঁই না করয়ে গরাস ॥

নগেন্দ্রবাবু টীকায় লিখিয়াছেন —

৭—৮ । অধর বিম্বতুল্য, দশন দাড়িম্ব বীজ । রবি (সিন্দুর বিন্দু) শশী (মুখ) পাশাপাশি উদয় হইয়াছে । রাহু (কেশ) দূরে বাস করে, নিকটে আসে না, সেইজন্য গ্রাস করে না । (পৃষ্ঠবিলম্বিত মুক্তকেশ মুখ হইতে দূরে থাকে) ।

কাব্যবিশারদ টীকায় লিখিয়াছেন যে, এখানে "অধর বিম্বের সহিত, দশন দাড়িম্ব বীজের সহিত, রবিশশী কপোলদ্বয়ের সহিত ও রাহু কেশজালের সহিত উপমিত হইয়াছে" ।

গ্রীয়ারসন সাহেবের অনুবাদে 'রবিশশী'—"the sun and moon" এবং উহার তাৎপর্য পাদ টীকায় "Her two eyes" অর্থাৎ নায়িকার চক্ষুদ্বয় বলিয়া লিখিত হইয়াছে ।

'মৈথিল-কোকিল-বিদ্যাপতি' গ্রন্থের সম্পাদক ব্রজনন্দনবাবু অনেক স্থলেই কাব্যবিশারদের পাঠ ও অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, এখানে তিনি কাব্যবিশারদ ও গ্রীয়ারসন—উভয়ের পাঠ গ্রহণ করিয়া লিখিয়াছেন— "রবিশশী কপোল যুগল অথবা নেত্র দ্বৈ" । একটু প্রণিধান করিলেই বুঝা যাইবে যে, 'রবিশশী' শব্দে কোন মতেই নায়িকার 'কপোলদ্বয়' বা 'নেত্রদ্বয়' লক্ষিত হইতে পারে না ; কেননা কপোলদ্বয়ে বর্ণের বৈষম্য নাই, কিন্তু রবি রক্তবর্ণ ও শশী গৌরবর্ণ বলিয়া, উহাদিগের মধ্যে স্পষ্টতঃ বর্ণের বৈষম্য রহিয়াছে । নগেন্দ্রবাবু ও তাঁহার মতানুসরণে বেণীপুরী মহাশয় যে, 'রবি' শব্দে সিন্দুর বিন্দু ও 'শশি' শব্দে মুখ অর্থ ধরিয়াছেন, তাহা অপেক্ষাকৃত অধিক সঙ্গত হইলেও—সেরূপ অর্থও নির্দোষ নহে । নায়িকার মুখ কবিমতে চন্দ্র ধরিলে, সিন্দুর-বিন্দুরূপে সূর্য চন্দ্রের

পাশাপাশি উদিত হইয়াছে, না বলিয়া রবি চন্দ্রের মাঝে উদিত হইয়াছে বলাই উচিত ছিল। এতদ্ভিন্ন কবি 'অধর', 'দশনা' ও 'সিন্দুর বিন্দু' রূপ মুখের পৃথক পৃথক অংশকে বিম্ব ইত্যাদি রূপে বর্ণিত করায়, আবার যদি ঐ সকল অংশের সমষ্টিরূপ সম্পূর্ণ মুখমণ্ডলকে চন্দ্র বলিয়া বর্ণিত করেন, তাহা হইলে পূর্বোক্ত বিম্ব দাড়িম্ব বীজ প্রভৃতির কোন বৈশিষ্ট্য থাকে না এবং অসঙ্গত হইয়া উক্তিও অসঙ্গত হইয়া পড়ে, কেননা, চন্দ্রে বিম্ব, দাড়িম্ব বীজ প্রভৃতির অস্তিত্ব সম্ভবে না। আগে মুখের অবয়বগুলিকে বিম্ব দাড়িম্ব বীজ ইত্যাদি রূপে বর্ণিত করিয়া পরে আবার উহাদিগের সমষ্টিকে চন্দ্র বলিয়া প্রখ্যাপিত করিলে, সেই উক্তি পূর্বাপরবিরুদ্ধ উন্মত্ত প্রলাপের ন্যায় অসংলগ্ন হইয়া পড়ে। সুতরাং অন্যত্র মুখের সহিত চন্দ্রের উপমা প্রসিদ্ধ ও সঙ্গত হইলেও, এখানে 'শশি' শব্দের দ্বারা কবি নায়িকার মুখমণ্ডল লক্ষ্য না করিয়া তাহার ললাটের শ্বেত-চন্দন-বিন্দুকে লক্ষ্য করিয়াছেন ইহাই বিবেচনা হয়।

"রবি শশি উগথিক পাশে" বাক্যের "পাশে" শব্দটীর মধ্যে যে গূঢ় ধ্বনি রহিয়াছে, সম্পাদকগণ কেহই তাহা লক্ষ্য করেন নাই। অভিজ্ঞ পাঠকগণ জানেন যে অমাবস্যা তিথিতে সূর্যগ্রহণ ও পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ ঘটিয়া থাকে। এই প্রাকৃতিক নিয়মের কদাচ ব্যতিক্রম হইতে পারে না। অমাবস্যা তিথিতে চন্দ্র রবির সহিত একই রাশিতে এবং পূর্ণিমায় রবি হইতে রাশিচক্রের সপ্তম রাশিতে অর্থাৎ রাশিচক্রের দূরতম স্থানে অবস্থিতি করে। রবি ও চন্দ্র পাশাপাশি রাশিতে অবস্থিত হইলেই বুঝা যায় যে, উহা অমাবস্যা বা পূর্ণিমার অবস্থিতি নহে, সুতরাং সেরূপ অবস্থায় জ্যোতিষশাস্ত্র-সিদ্ধ প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে চন্দ্র বা সূর্যের গ্রহণ ঘটিতে পারে না। কবি এই ধ্বনিপূর্ণ বাক্যের দ্বারা ইহাই বুঝাইতে চাহেন যে, রবি ও শশী এক সঙ্গে অথবা পরস্পরের বিপরীত নহে। কবি বলিতেছেন যে, রবি ও চন্দ্র পাশাপাশি উদিত হইয়াছে বলিয়াই রাহু গ্রাস করিতেছে না। ইহার প্রকৃত তাৎপর্য যে কি, তাহা বুঝিতে হইলেই এই জ্যোতিষ তত্ত্বটি জানা আবশ্যক, নতুবা শুধু কবি কল্পনা মূলে অর্থ করিতে যাইয়া যদি কেহ বলেন যে, রবি ও চন্দ্র পাশাপাশি অর্থাৎ একজন আর একজনের সাথী ও সহায় থাকায় রাহু ভয়ে তাহাদিগের মধ্যে কাহাকেও গ্রাস করিতে সাহসী হইতেছে না, এইরূপ অর্থ আপাততঃ সঙ্গত মনে হইলেও উহা বিচারসহ হইবে না। কেননা জ্যোতিষ

শাস্ত্রসিদ্ধ প্রাকৃতিক নিয়ম-অনুসারে চন্দ্র অমাবস্যায় রবির সহিত একত্র অবস্থান করে, কিন্তু কেবল সেই অমাবস্যায়ই সূর্যগ্রহণ সম্ভবপর বটে। সুতরাং রবি ও চন্দ্রের একত্র অবস্থান গ্রহণ হইতে রক্ষা পাওয়ার কারণ না হইয়া সূর্যগ্রহণের একান্ত প্রয়োজনীয় অন্যতম কারণ হওয়ায়, কবি পাশাপাশি অর্থাৎ নিকটবর্তী অথচ ভিন্ন রাশিতে রবি চন্দ্রের উদয় বর্ণিত করিয়া কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যের মণি-কাঞ্চন যোগ প্রদর্শিত করিয়াছেন।

আলোচ্য কলিতে শশিদ্বারা নায়িকার মুখমণ্ডল না বুঝাইয়া, ললাটের শ্বেত চন্দনবিন্দু অর্থ করিলে উহা যে অস্বাভাবিক বা অসঙ্গত হয় না, বিদ্যাপতির—

কত ন বেদনা মোহি দেহি মদনা।
হর নহি বলা জুবতি জনা॥

ইত্যাদি নগেন্দ্রবাবুর সংস্করণের ৬৯ সংখ্যক পদের নিম্নলিখিত পংক্তিদ্বয় দ্বারা বেশ বুঝা যাইবে, যথা—

চন্দনক বিন্দু মোরা নহি ইন্দু গোটা।
ললাট পাবক নহি সিন্দুরক ফোটা॥

পূর্বে মহাদেব মদনকে ভস্ম করায়, সেই আক্রোশবশতঃ বিরহিণী শ্রীরাধাকে মহাদেব বলিয়া ভ্রম করিয়া, মদন শরপ্রহারে জর্জরিত করিতেছেন বিবেচনায় শ্রীরাধা মদনকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন— হে মদন! তুমি আমাকে কত বেদনা দিতেছ? আমি হর নহি, কেবল যুবতী জন মাত্র। (আমার ললাটে তুমি যাহা দেখিতেছ, তাহা) চন্দনের বিন্দু— উহা চন্দ্র নহে। (আর যাহা দেখিতেছ, তাহা) সিন্দুরের ফোটা, উহা অগ্নি নহে। কাব্যবিশারদের সংস্করণে এই পদের "কতিহু মদন তনু দহসি হমারি" ইত্যাদি যে বঙ্গীয় রূপান্তর (version) উদ্ধৃত হইয়াছে উহাতে "চন্দনক বিন্দু" ইত্যাদির স্থলে পাঠ আছে— "মোতিক বদ্ধ মৌলি—নহ ইন্দু।" অর্থাৎ ইহা আমার মুক্তাখচিত শিল্প শিরোভূষণ—চন্দ্র নহে।

বলা বাহুল্য যে, চন্দনবিন্দু বা মুক্তাখচিত শিরোভূষণের সহিত চন্দ্রের সাদৃশ্য থাকায় মদনের পক্ষে চন্দ্র বলিয়া ভুল করা সম্ভবপর হইয়াছে, এবং সেইজন্যই শ্রীরাধা মদনের ভ্রম দূর করার জন্য বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে,

আমার ললাটে এ দুইটি চন্দ্র ও অগ্নি নহে,—চন্দন ও সিন্দুরের ফোটা বটে। কেহ বলিতে পারেন যে বিদ্যাপতির —

সুন্দর বদনে সিন্দুর বিন্দু
সাঙর চিকুর ভার।
জনু রবি শশী সঙ্গহি উয়ল
পিছে করি আন্ধিয়ার॥

(কাব্যবিশারদের ৬ সংখ্যক)

পদে কবি "রবি শশী" শব্দের দ্বারা নায়িকার সিন্দুরবিন্দু ও বদনকেই লক্ষ্য করিয়াছেন বুঝা যায়; সুতরাং এখানেও শশী শব্দের দ্বারা নায়িকার মুখ-চন্দ্রকেই লক্ষ্য করা সঙ্গত। এই আপত্তির উত্তরে বক্তব্য এই যে, এখানে নায়িকার সুন্দর বদনের স্পষ্ট উল্লেখ আছে এবং 'রবি শশী' একসঙ্গে উদিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত এখানে গ্রহণের কোন প্রসঙ্গ নাই; সুতরাং এখানে মুখে চন্দ্রত্বের আরোপে কোনই বাধা দেখা যায় না। আমাদিগের আলোচ্য পদে মুখে চন্দ্রত্বের আরোপ করিলে যে সকল অসঙ্গতি ঘটে, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। বিদ্যাপতি যে অন্যত্র চন্দনবিন্দুর সহিতও চন্দ্রের উপমা দিয়াছেন "চন্দনক বিন্দু মোরা নহি ইন্দু গোটা" বাক্যদ্বারা তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। আলোচ্য পদে কবি অসাধারণ সতর্কতা ও সূক্ষ্মদৃষ্টিহেতুই রবি চন্দ্রের (একসঙ্গে বা সুদূরে উদয় বর্ণনা) না করিয়া গ্রহণের অযোগ্যতা দেখাইবার জন্যই পাশাপাশি উদয় 'বর্ণনা' করিয়াছেন এবং সম্পূর্ণ মুখমণ্ডলের উপমা না দিয়া উহার পৃথক্ পৃথক অবয়ব অধর দশন প্রভৃতির পৃথক পৃথক বিম্ব, দাড়িম্ব বীজ ইত্যাদি উপমা জুটাইয়াছেন, সুতরাং সম্পূর্ণ মুখকে আবার চন্দ্রের সহিত উপমিত করিলে চন্দ্রে বিম্ব, দাড়িম্ব-বীজ ইত্যাদির অবস্থিতি অসম্ভব বলিয়া অলঙ্কার-দোষই ঘটিয়া থাকে—এই বিষয়গুলি প্রণিধান করিলে, এখানে যে মুখের সহিত চন্দ্রের উপমা কবির অভিপ্রেত নহে, ইহাতে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না।

আলোচ্য কলির যে পাঠ বঙ্গীয় পদাবলী হইতে কাব্যবিশারদ মহাশয় গ্রহণ করিয়াছেন, উহার মধ্যে "উগথিক" শব্দের স্থলে "উভয়" শব্দদ্বারা ছন্দ বা অর্থ কিছুই রক্ষিত হয় না; সুতরাং মৈথিল পদের "নিয়রো" "আবথি" "করথি" শব্দগুলির পরিবর্তে বঙ্গীয় পুথিতে সরলতার জন্য যে সমার্থক "নিকটে"

"আওয়ে" ও "করয়ে" পাঠ যথাক্রমে গৃহীত হইয়াছে, উহা তেমন দূষনীয় মনে না করিলেও আমরা এস্থলে কোনমতেই "উগথিক" স্থলে "উভয়" পাঠ সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। এই 'উভয়' শব্দটাকে শুদ্ধ পাঠ বলিয়া গ্রহণ করায়ই বোধহয় কাব্যবিশারদ মহাশয় "রবি শশি" নায়িকার কপোলদ্বয়ের সহিত উপমিত হইয়াছে, এইরূপ একটা অসঙ্গত হাস্যজনক অর্থ করিয়া ফেলিয়াছেন!

এই পদের আরও দুই একটা বাক্যের পাঠ ও অর্থ লইয়া সম্পাদকদিগের মধ্যে মতভেদ আছে, কিন্তু সেই স্থলে নগেন্দ্রবাবুর গৃহীত পাঠ ও অর্থই সঙ্গত বলিয়া, আমরা গ্রীয়ারসন সাহেব, কাব্যবিশারদ মহাশয় ও ব্রজনন্দনবাবুর ভ্রম প্রদর্শিত করিতে যাইয়া বাগ্‌বাহুল্যের অবতারণা নিষ্প্রয়োজন বিবেচনায় ক্ষান্ত রহিলাম।

(১৮ সংখ্যক পদ)

নগেন্দ্রবাবুর সংস্করণের "মঞে তো আজ" ইত্যাদি ১৮ সংখ্যক পদটীতে কোন ভণিতা নাই, কেবল নিম্নলিখিত কয়েকটী চরণ আছে, যথা—

মঞে তো আজ দেখলি কুরঙ্গি নয়নিঞা।
সরদক চান্দ বদনিঞা॥ ২।
কনক লতা জনি কুন্দি বৈসাওল
কুচ যুগ রতন কটোরবা লো।
দশন জ্যোতি জনি মোতি বৈসাওল
অধর তসু পবারবা লো॥ ৪।

সম্পাদক মহাশয় টীকায় এই পদের ছন্দ সম্বন্ধে মন্তব্য লিখিয়াছেন—

মিশ্র অহিরাণা ছন্দ। সাধারণ অহিরাণী ছন্দের লক্ষণ ২৬ হইতে ২৯ মাত্রা, প্রত্যন্তর, (ধ্রুব অথবা ধুয়া) ১২ মাত্রা। এই পদে দ্বিতীয় চরণে ১২ মাত্রা এবং তৃতীয়ে (লো শব্দ ত্যাগ করিয়া) ২৯ মাত্রা, কিন্তু প্রথম চরণে ১৯ মাত্রা।

দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, এখানেও সম্পাদক মহাশয় মাত্রা ও চরণের গণনায় বিষম ভুল করিয়া ফেলিয়াছেন; তিনি উল্লিখিত পদের প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তিকে পৃথকভাবে যথাক্রমে ঐ পদের প্রথম চরণ ও প্রত্যন্তর

বা ধুয়া বলিয়া গণনা করিয়াও, জানি না কি জন্যে তৃতীয় ও চতুর্থ পংক্তিকে একযোগে তৃতীয় চরণ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন এবং সেই হিসাবে পঞ্চম ও ষষ্ঠ পংক্তিকে চতুর্থ চরণ বলিয়া গণ্য করা তাঁহার কর্তব্য হইলেও উহার কোনই উল্লেখ করেন নাই। বস্তুতঃ এই পদটী তিন বা চারি চরণবিশিষ্ট শুদ্ধ বা মিশ্র অহিরাণী ছন্দের পদ নহে। আভিরী অপভ্রংশে—আহিরী, অহিরাণী একটা প্রসিদ্ধ রাগিণীর নাম,—উহা কোন ছন্দের নাম নহে। উদ্ধৃত পংক্তিগুলি একটা অসম্পূর্ণ মাত্রাত্রিপদী পদের তিনটী অর্দ্ধ কলি অর্থাৎ সাকল্যে দেড় কলি (stanza) মাত্র।

নগেন্দ্রবাবু "কনকলতা" ইত্যাদি পংক্তিদ্বয়ের অর্থ করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন—"কুন্দি—কুঁদিয়া, কাটিয়া। কটোরবা—কটোরা। * * ৬-৪। কনকলতা দেহ কাটিয়া যেন কুচ-যুগল আকারে রত্ননির্মিত বাটী বসাইয়াছে।" এই লেখার ভাবে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তিনি 'কনকলতা' অর্থাৎ দেহকেই 'কুন্দি' অসমাপিকা-ক্রিয়াটীর কর্মপদ ধরিয়া লইয়াছেন। এরূপ অর্থ কোনরূপেই সমীচীন নহে। 'কুন্দি' শব্দের অর্থ যে কুন্দ নামক তক্ষণ-যন্ত্র দ্বারা কুঁদিয়া বা চাঁছিয়া—সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই; কিন্তু এখানে জিজ্ঞাস্য এই যে, কনকলতারূপ কৃশ দেহকে কুঁদিয়া কুচযুগরূপ রত্ন নির্মিত বাটী বসানো যাইতে পারে কি? স্থূল দ্রব্যকে কুন্দে চাঁছিয়া কৃশ করা যাইতে পারে, কিন্তু কৃশ দ্রব্যকে চাঁছিয়া তদপেক্ষা স্থূল করা একান্তই অসম্ভব। কুচযুগের উপরিস্থিত গ্রীবা ও নিম্নস্থিত কটি উভয় অঙ্গই কুচযুগল অপেক্ষা কৃশ বটে, সুতরাং এ অবস্থায় কনকলতারূপ কৃশ দেহকে চাঁছিয়া স্থূল কুচযুগ বসাইয়াছে বলিলে নিতান্তই অসঙ্গত কথা বলা হয়। তারপরে কনকলতাবৎ দেহকে কুন্দে কাটিয়া বা চাঁছিয়া কুচযুগ নির্মিত হইলে উহাও কনকবর্ণ হওয়াই স্বাভাবিক বটে, কিন্তু কবি কুচযুগকে এখানে কনক কটোরা না বলিয়া 'রতন কটোরা' বলিয়া বর্ণিত করিয়াছেন, ইহা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? অবশ্য রতন শব্দে স্থলবিশেষে স্বর্ণ না বুঝা যাইতে পারে—এমত নহে, কিন্তু এখানে আগে কনক শব্দ দ্বারা স্বর্ণ বুঝাইয়া, পরে আবার রতন শব্দের প্রয়োগ করায় উহা যে স্বর্ণ নহে, কিন্তু স্বর্ণ আধারে শোভমান অন্য কোন রত্ন সুতরাং মণিকাঞ্চন যোগহেতু পরম সুদৃশ্য ও লোভনীয় উহাই প্রতীত হয়। নগেন্দ্রবাবুর প্রতিপাদিত অর্থের আর একটা গুরুতর দোষ এই যে,

কৃশ দেহকে কাটিয়া বা চাঁছিয়া কুচযুগরূপ স্থূল বাটি নির্মিত করা যদি তর্কস্থলে সম্ভবপর বলিয়াও ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও নায়িকার স্বর্ণ লতাবৎ নধর ও কোমল দেহের উপর কুন্দ যন্ত্র রূপ শাণিত অস্ত্রপ্রয়োগের বর্ণনা দ্বারা মধুর রসের বিরোধী বীভৎস বা ভয়ানক রসই রসজ্ঞের হৃদয়ে উদিত হইয়া থাকে। আমাদের বিবেচনায় 'কনকলতা' কঁুদিয়া ক্রিয়ার কর্মপদ নহে, ইহা 'বৈসাওল' ক্রিয়ার আধার অর্থাৎ অধিকরণ বটে। ত্রিচরণাত্মক ধ্রুব কলির প্রথম চরণ নাই, ইহার তিনটী অর্দ্ধ কলিতেই (half stanza) ত্রিপদীর নিয়মানুসারে দুইটি করিয়া চরণ আছে। সুরের ওজন রক্ষার জন্য চতুর্থ ও ষষ্ঠ পংক্তির শেষে যে 'লো' শব্দ আছে, উহা হিসাব হইতে বাদ দিলে সাধারণ মাত্রা ত্রিপদীর মত উহার ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ চরণগুলিতেও যথাক্রমে ১৬, ১২, ১৬ ও ১২ মাত্রাই পাওয়া যায়। 'গীতগোবিন্দে'র "ললিত লবঙ্গলতা" ইত্যাদি প্রসিদ্ধ মাত্রা ত্রিপদী ছন্দের অনুকরণে রচিত মৈথিল ও বাঙ্গালা ব্রজবুলীর পদের ধ্রুব কলির ব্যতীত অন্যান্য কলিতে সর্বত্রই এইরূপ মাত্রা বিন্যাস দেখা যায়। এই মাত্রা ত্রিপদীর প্রত্যেক অর্দ্ধ কলিতে ২৮টি মাত্রা আছে। ত্রিপদীর প্রত্যেক অর্দ্ধ কলি এক পংক্তিতে না লিখিয়া উদ্ধৃত পদের মত দুইটি চরণে বিভাগ করিয়া লিখিলে উহার অযুগ্ম চরণগুলিতে ১৬ মাত্রা ও যুগ্ম চরণগুলিতে ১২ মাত্রা পাওয়া যায়। এই পদের দ্বিতীয় চরণেও সেই ১২ মাত্রাই ঠিক আছে, কিন্তু প্রথম চরণে ১৬ মাত্রার স্থলে দুইটি মাত্রা বেশী পাওয়া যাইতেছে, সুতরাং প্রথম চরণটি ছন্দ রক্ষা করিয়া পাঠ করা যায় না। অথচ এই প্রথম ও দ্বিতীয় চরণটিকে এই পদের ধ্রুব কলি গণ্য করিয়া মাত্রার অনিয়মের কারণ নির্দেশ করাও এখানে সম্ভবপর নহে। কেননা মাত্রা-ত্রিপদী ছন্দের ধ্রুব কলির তিনটি চরণের পরিমাণ নিতান্ত কমের পক্ষেও যথাক্রমে ১২, ১০ ও ১২ মাত্রা হওয়া আবশ্যক। এখানে "মঞে তো" ইত্যাদি চরণের মাত্রাগুলিকে অস্বাভাবিকরূপে বাড়াইয়া পড়িলেও উনিশ বা কুড়ি মাত্রার বেশী পাওয়া যায় না; সুতরাং উহাকে ধ্রুব কলির প্রথম ও দ্বিতীয় চরণের সমষ্টি মনে করার কারণ নাই। আমাদের বিবেচনায় গায়ক বা লেখকের ভুলে এই অসম্পূর্ণ পদের ধ্রুব কলি ও 'মঞে আজ' ইত্যাদি কলির অর্দ্ধাংশ পরিত্যক্ত ও 'মঞে আজ' ইত্যাদি অর্দ্ধ কলিতে অনাবশ্যক 'তো' শব্দটী সংযোজিত হইয়াছে। 'তো' শব্দটী পরিত্যাগ করিয়া স্বাভাবিক উচ্চারণ

অনুসারে পড়িলে—"সৈ দেখলি কুর"গ-নয়নিঞা" ইত্যাদি অর্দ্ধ পংক্তিদ্বয়েও পূর্বোক্ত নিয়ম অনুসারেই যথাক্রমে ১৬ ও ১২ মাত্রা অর্থাৎ মাত্রা-ত্রিপদী-ছকের অর্দ্ধ কলির সেই ২৮ মাত্রাই পাওয়া যাইবে। সুতরাং এজন্য নগেন্দ্র বাবু কিংবা তাঁহার উপদেষ্টা মৈথিল পণ্ডিত যিনিই দায়ী হউন না কেন, এই ছন্দ ও মাত্রার বিবরণ নিতান্ত অশুদ্ধ। পংক্তিদ্বয়ের অর্থ এই যে, (কোন সুদক্ষ শিল্পী) যেন কুচযুগরূপ রত্ননির্মিত কটোরাকে কুঁদিয়া নির্মাণ করিয়া কনকলতায় বসাইয়াছে। নায়িকার কুচযুগ চিত্র বিচিত্র ক"াচুলী দ্বারা আচ্ছাদিত বলিয়া উহাকে নানাবিধ রত্নের দ্বারা খচিত রত্নকটোরা রূপে বর্ণিত করা হইয়াছে। খনি হইতে উত্তোলিত রত্নরাজিকে না কুন্দাইলে অভীষ্ট আকারে পরিণত করা যায় না, তাই রত্নরাজি কুঁদিয়া রত্ন কটোরারূপ কুচযুগ নির্মিত হইয়াছে বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। বিদ্যাপতির পদে অধিকরণ কারকে সপ্তমী বিভক্তি লোপের অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে, সুতরাং এখানে 'কনকলতা' শব্দের অর্থ 'কনকলতায়' হইতে কোনই বাধা নাই। নগেন্দ্রবাবুর সংস্করণ হইতেই সপ্তমী বিভক্তি লোপের কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ—

(১) নয়ন বয়ন দুই উপমা দেল।
এক কমল দুই খঞ্জন খেল॥
(১৫ সংখ্যক পদ)

নয়ন (ও) মুখ দুই উপমা দিল (উপমিত হইল) এক কমলে (পরে) দুই খঞ্জন খেলা করিতেছে। (নগেন্দ্রবাবুর টীকা)

(২) কনক-লতা অরবিন্দা।
দমনা মাঝ উগল জনি চন্দা॥ ২।
(১৬ সংখ্যক পদ)

কনকলতায় (দেহলতায়) পদ্ম (মুখ) দ্রোণ গুল্মের মধ্যে যেন চন্দ্রোদয় হইল। (নগেন্দ্রবাবুর টীকা)

(৩) নীল বসন তন ঘেরলি সজনি গে
শির দেল চিকুর সমারি।
(২৫ সংখ্যক পদ)

নীল বসনে তনু ঘিরিয়াছে, মস্তকে কেশ সাজাইয়া দিয়াছে। (ঐ)

(১৯ সংখ্যক পদ)

নগেন্দ্রবাবুর "জুগল সৈল সিম" ইত্যাদি ১৯ সংখ্যক পদটী মৈথিল তালপত্রের পুথি ও 'রাগতরঙ্গিনী' পুথি হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। নগেন্দ্রবাবু পাঠকদিগের হিতার্থে টীকার প্রারম্ভেই পদের ছন্দ ও মাত্রাবিবরণে লিখিয়াছেন "করুণ মালব ছন্দ। ২৫ হইতে ২৮ মাত্রা।"

। ॥ ॥ । । । । । । । ॥ । ।
জুগল সৈল সিম হিম কর দেখল
। । । । । ॥ ॥ । ।
এক কমল দুই জ্যোতিরে॥

আমরা বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, নগেন্দ্রবাবুর প্রদত্ত এই ছন্দের নাম ও মাত্রাবিশ্লেষণ (scanning) সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। 'করুণ মালব' রাগিণী বিশেষ,—উহা কোন ছন্দের নাম নহে। নগেন্দ্রবাবু প্রথম কলির অর্দ্ধাংশের যে মাত্রা বিশ্লেষণ করিয়াছেন উহাও ঠিক নহে। সাধারণ মাত্রা ত্রিপদী ছন্দের অর্দ্ধ কলির প্রথম ও দ্বিতীয় চরণে যথাক্রমে ১৬ ও ১২ মাত্রা অর্থাৎ দুইটী চরণে সাকল্যে ২৮ মাত্রা পাওয়া যায়,—এখানেও সুরের পূরণের জন্য প্রত্যেক অর্দ্ধ কলির পরে প্রযুক্ত 'রে' শব্দ বাদেই ২৮ মাত্রা আছে। দ্বিতীয় চরণের 'রে' শব্দ লইয়া ১২ মাত্রা দেখাইতে যাইয়া নগেন্দ্রবাবু 'এক' শব্দের 'এ' অক্ষর ও 'জ্যোতি' শব্দের 'তি' অক্ষর লঘু অর্থাৎ এক মাত্রা পরিমিত গণ্য করিয়াছেন, কিন্তু 'এ' ও 'তি' অক্ষরটীকে গুরু অর্থাৎ দ্বিমাত্রাত্মক পাঠ না করিলে,—'এক কমল' ইত্যাদি চরণের যে ছন্দ রক্ষিত হয় না, তাহা তিনি লক্ষ্য করেন নাই। মৈথিল ভাষায় 'এ' অক্ষর প্রয়োজনবশতঃ লঘু বা গুরু উভয়রূপেই পাঠ করা যাইতে পারে; 'রে' শব্দ পদের অঙ্গীয় না হওয়ায়, 'জ্যোতি' শব্দের 'তি' অক্ষরটী চরণের অন্ত্য বর্ণ বলিয়া ছন্দোশাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে বিকল্পে গুরু ধরা যাইতে পারে। সুতরাং 'রে' শব্দ বাদেই 'এক কমল দুই জ্যোতি' বাক্যে ১২টী মাত্রা বর্তমান আছে। 'রে' বর্ণ গুরু অর্থাৎ দ্বিমাত্রাত্মক, উহাকে গণনা করিলে এই পদের অর্দ্ধ কলি ২৮ মাত্রাত্মক না হইয়া ৩০ মাত্রাত্মক হইয়া পড়ে। নগেন্দ্রবাবু ১৮ সংখ্যক পদের ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ পংক্তির শেষের 'লো' সুরপূরক বলিয়া মাত্রা গণনায় বাদ দিয়াছেন। এই পদেও 'রে' শব্দটীকে বাদ দিয়াই মাত্রা গণিতে হইবে।

মাত্রা-ত্রিপদীর প্রত্যেক অর্দ্ধ কলিতে প্রথম ও দ্বিতীয় চরণে যে যথাক্রমে কেবল ১৬ ও ১২ মাত্রা থাকিলেই চলে, এরূপ নহে। ঐ মাত্রাগুলি আবার সহজে চতুর্মাত্রিক গণে বা অংশে বিভাজ্য হওয়া আবশ্যক, নতুবা ছন্দোভঙ্গ ঘটে। নগেন্দ্রবাবুর প্রদর্শিত 'এক কমল' ইত্যাদি চরণে 'এ' অক্ষর লঘু ধরিলে— "এক কম। ল ছুই জোতি রে।" বাক্যে ঐ চতুর্মাত্রিকগণ মিলে না,— কেননা "জোতি" শব্দের 'জো' অক্ষরটীকে সহজে কাটিয়া ছুইভাগ করা যায় না, কিন্তু পূর্বোক্ত কারণে 'এ' ও 'তি' অক্ষর গুরু ধরিলে অতিরিক্ত সুরপূরক 'রে' অংশ বাদেই ১২ মাত্রা পাওয়া যায়, যথা— "এক ক। মল ছুই। জোতি।" ছন্দ ও মাত্রার কলা ছাড়িয়া এখন পদের পাঠ ও অর্থের দিকে দেখা যাউক। নগেন্দ্রবাবুর সংস্করণে পদের অন্তিম কলিটি নিম্নরূপ, যথা—

ভনই বিদ্যাপতি এহু পুরব পুন তহ
ঐসন ভজনে রসমন্ত রে।
বুঝয়ে সকল রস নৃপ সিব সিংঘ
লখিমা দেইকর কন্ত রে॥

নগেন্দ্রবাবুর উল্লিখিত হস্তলিখিত পুথিখানার মধ্যে এই পদের পাঠে কোন ব্যতিক্রম আছে কিনা জানা যায় না; কেননা, সম্পূর্ণ পদটার মধ্যেও তিনি কোন পাঠান্তরের উল্লেখ করেন নাই। ব্রজনন্দনবাবুর 'মৈথিল-কোকিল বিদ্যাপতি' গ্রন্থে কিন্তু উদ্ধৃত কলির প্রথম চরণে "এহু" শব্দটা নাই, এতদ্ভিন্ন তৃতীয় চরণের 'নৃপ সিব সিংঘ' স্থলে 'নৃপতি সিব সিংঘ' পাঠ আছে। বস্তুতঃ 'এহু' শব্দটার এখানে বিশেষ সার্থকতা দেখা যায় না, উহা না থাকিলেও অর্থ প্রতীতির ব্যাঘাত হয় না। 'এহু' থাকিলে ঐ চরণের নির্দিষ্ট ১৬ মাত্রা স্থলে ১৮ মাত্রা হইয়া পড়ে। ইহা লক্ষ্য করিয়াই ব্রজনন্দনবাবু 'এহু' শব্দটীকে ত্যাগ করিয়াছেন, কিংবা তাঁহার আদর্শ পুথিতে 'এহু' শব্দ নাই,— বুঝা গেল না। বস্তুতঃ যে কারণেই হউক 'এহু' শব্দের বর্জন দ্বারা যে ছন্দোদোষ সংশোধিত হইয়াছে এবং অর্থেরও কোন ক্ষতি হয় নাই—ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ঐ পংক্তির 'পুন তহ' শব্দের অর্থ পুণ্যতঃ অর্থাৎ 'পুণ্য হইতে'। 'ঐসন' ইত্যাদি বাক্যের অর্থ 'ঐ প্রকার (রমণী) রসিক পুরুষকে ভজনা করে।' সুতরাং সম্পূর্ণ অর্দ্ধ কলির অর্থ 'বিদ্যাপতি

বলিতেছেন— পূর্ব পুণ্যহেতু ঐরূপ রমণী রসিক পুরুষকে ভজনা করে।' এখানে 'এই পূর্ব পুণ্য' না বলিয়া শুধু 'পূর্ব' বলিলেও অর্থ বুঝিতে বাধা হয় না। 'নৃপ সিব সিংঘ' পাঠের সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, এইরূপ পাঠ স্বীকার করিলে যদি অনুস্বারযুক্ত বলিয়া 'সিং' অক্ষরটীকে গুরু গণ্য করা হয়, তাহা হইলে 'ঘ' অক্ষরটীকে সেইরূপ গুরু গণ্য না করিলে চরণের নির্দিষ্ট ১৬ মাত্রার পূরণ হয় না। বিদ্যাপতির অধিকাংশ পদের ভণিতায়ই রাজা শিব সিংহের উল্লেখ আছে, যথা—

রস বুঝ শিব সিংহ নৃপ সহোদার।
(নগেন্দ্রবাবুর ২০ সংখ্যক)

সিব সিংহ মিথিলা-ভূপে।
(ঐ ২১ সংখ্যক)

রাজা শিব সিংহ রূপনারায়ণ।
(ঐ ২৩ সংখ্যক)

এই সকল স্থলে অনুস্বারযুক্ত হইলেও 'সিং' অক্ষর লঘু অর্থাৎ এক-মাত্রাত্মক রূপেই প্রযুক্ত হইয়াছে, এরূপ অবস্থায় কবি যে এখানে তাঁহার স্বাভাবিক রীতির বিপর্যয় করিয়া 'সিংঘ' শব্দের 'সিং' অক্ষরটীকে গুরু অক্ষররূপে ব্যবহার করিয়াছেন, ইহা সম্ভববোধ হয় না। তারপরে সম্পূর্ণ অর্দ্ধ কলির অন্তে-স্থিত লঘু অক্ষর ছন্দের জন্য গুরু গণ্য করার ব্যবহার আছে, কিন্তু চারি চরণের কলির প্রত্যেক চরণের অন্তেস্থিত লঘু অক্ষরকে ইচ্ছা অনুসারে গুরু গণ্য করার নিয়ম নাই, সুতরাং এখানে সিংঘ শব্দের 'ঘ' অক্ষর দ্বিতীয় অর্দ্ধ কলির অন্তে না থাকিয়া মধ্যে থাকায় উহাকেও গুরু গণ্য করা যাইতে পারে না। পক্ষান্তরে উদ্ধৃত ভণিতার দুইটি অর্দ্ধ কলির অন্তে (রে শব্দ ধর্তব্য নহে বলিয়া) যে দুইটি 'স্ত' অক্ষর আছে উহা লঘু হইলেও গুরু গণ্য করিয়া অর্দ্ধ কলির পূর্বোক্ত ১৬+১২=২৮ মাত্রার পূরণ করা হইয়াছে। সুতরাং 'নৃপ সিব সিংহ (হ)' পাঠে যে ছন্দোভঙ্গ অনিবার্য হইয়া পড়ে, উহাও অস্বীকার করার উপায় নাই। ব্রজনন্দনবাবুর গৃহীত 'নৃপতী' পাঠে ছন্দ রক্ষিত হইলেও 'নৃপ' 'নৃপতি' ব্যতীত 'নৃপতী' শব্দের প্রয়োগ সমর্থনযোগ্য নহে। উহার স্থলে 'নরপতি' শব্দ প্রয়োগ করিলেই সকল দিক রক্ষিত হইতে পারে, আমরা উহাকেই এখানে একমাত্র সঙ্গত পাঠ বলিয়া বিবেচনা করি।

আলোচ্য পদের একটি কলি এই —

বিপরিত কনক কদলি তর শোভিত
থল পঙ্কজকে রূপ রে।
তথহুঁ মনোহর বাজন বাজয়ে
জনি জগে মনসিজ ভূপ রে॥ ৫।

নগেন্দ্রবাবু উহার টীকায় লিখিয়াছেন—

৫। বিপরীত কনক কদলী (উরু) তলে শোভিত স্থলপদ্মের রূপ (চরণ), তাহাতে যেন জগতে মনসিজ ভূপের মনোহর বাদ্য (নূপুর) বাজিতেছে।

দুঃখের বিষয় এই যে আমরা নগেন্দ্রবাবুর এই ব্যাখ্যাটীকে সম্পূর্ণ ভুল না বলিয়া পারিতেছি না। সমাস ব্যতীত সম্বন্ধে ষষ্ঠী বিভক্তিলোপের উদাহরণ সংস্কৃত, হিন্দী, মৈথিল বা বাঙ্গালা কোন ভাষাতেই দেখা যায় না। ইহা ভাষাতত্ত্বের সম্পূর্ণ নিয়মবিরুদ্ধ। এ অবস্থায় উদ্ধৃত কলির চতুর্থ পংক্তির 'মনসিজ ভূপ' শব্দের কোনমতেই 'মনসিজ ভূপের' অর্থ করা যায় না, আর উহার সহিত তৃতীয় পংক্তির 'বাজন' (বাদ্য) শব্দেরও টানিয়া অন্বয় করা যাইতে পারে না। তারপরে যদিও হিন্দী, মৈথিল ও বাঙ্গালার 'জগৎ' শব্দের অপভ্রংশ 'জগ' শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়, কিন্তু উহার সপ্তমী বিভক্তিতে হিন্দী ও মৈথিল ভাষায় 'জগ মে' 'জগ মহ' কিংবা বিভক্তিলোপে শুধু 'জগ' ব্যতীত 'জগে' পদের প্রয়োগ দেখা যায় না। বাঙ্গালা ভাষার সপ্তমীতে 'তে' অপেক্ষা 'এ' বিভক্তিরই বাহুল্য, কিন্তু বাঙ্গালায়ও 'জগ' শব্দের সপ্তমীতে 'জগে' পদ এযাবৎ পাই নাই। যদিও বা ভাষাতত্ত্বের নিয়ম সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া জোর করিয়া ঐরূপ অর্থ করা হয়, তাহা হইলেও এখানে 'জগতে' শব্দটার কোনই সার্থকতা দেখা যায় না। নায়িকার দেহকে কবিকল্পনার বলে যৌবনরাজ্য বা মদন ভূপতির রাজ্য বলা যাইতে পারে, কিন্তু উহাকে নির্বিশেষে জগৎ বলা যাইতে পারে না। অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের সাহায্যে মনসিজ রাজার বাদ্যে অর্থাৎ নায়িকার নূপুরের ধ্বনিতে সমস্ত জগের মনোহরণ করিতেছে, —কবির ইহা বলাই অভিপ্রেত হইলে, এই বাক্যটী সম্পূর্ণ অন্যভাবে রচনা করা আবশ্যক হইত। বর্তমান অবস্থায় সেরূপ অর্থ কোনমতেই করা যায় না। হিন্দী ও মৈথিল ভাষায় 'জাগা' অর্থে 'জগ' ধাতুর বহুল প্রয়োগ আছে, 'জাগিতেছে' অর্থে মৈথিল ভাষায় 'জগই' 'জগে' 'জগু' 'জগ' ইত্যাদি পদ

হইয়া থাকে। আমাদিগের বিবেচনায় এখানে 'জাগ' অর্থেই 'জগ' পদটি ব্যবহৃত হইয়াছে। গীত ও বাদ্যদ্বারা রাজাদিগের নিদ্রা ভঙ্গ করাইবার প্রথা প্রাচীন কালে এদেশে প্রচলিত ছিল। নায়িকার চরণকমলে নূপুরযুগল মনোহর বাদ্য করিতেছে দেখিয়া অনুমান হয়, যেন মনসিজ রাজা মনোহর বাদ্যে জাগিতেছেন। অর্থাৎ এতকাল তিনি নিদ্রিত ছিলেন, এখন সময় বুঝিয়া তিনি জাগরিত হইতেছেন। নবযৌবনার পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক বর্ণনা বটে। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, ব্রজনন্দনবাবু এই পদের অর্থই লিখিয়াছেন, কিন্তু সন্দিগ্ধ 'জগে' শব্দের অর্থ লিখেন নাই। হিন্দুস্থানী ও মৈথিল ব্যক্তিদিগের নিকট 'জগে' শব্দের 'জাগে' অর্থটী এতই সহজ যে, উহার অর্থ লিখার তিনি মোটেই প্রয়োজন বোধ করেন নাই। বস্তুতঃ বিভক্তিহীন 'মনসিজ ভূপ' শব্দকে কর্তৃপদ ধরিলে 'জগে' অর্থাৎ 'জাগে' শব্দটাকে উহার ক্রিয়াপদ না বলিয়া গত্যন্তর দেখা যায় না। হিন্দী ও মৈথিল ভাষার অনেক শব্দ ও ধাতুর রূপেই এরূপ সহজ আকারবৈষম্য অনেক সময়েই বাঙ্গালী পণ্ডিতদিগেরও কিরূপ গুরুতর হাস্যজনক ভ্রান্তি জন্মাইয়া থাকে,—ইহা তাহার একটা সুন্দর দৃষ্টান্ত বটে।

(২০ সংখ্যক পদ)

নগেন্দ্রবাবুর ২০ সংখ্যক "অধর সুশোভিত বদন সুছন্দ" ইত্যাদি পদটী মৈথিল তালপত্রের পুথি হইতে সংগৃহীত। উহার দুইটী কলি এইরূপ, যথা—

বিশেখি ন দেখলি এ নিরমলি রমণী।
সুরপুর সঞো চলি আইলি গজগমনী ॥ ৬।
গিম সঞো লাবল মুকুতা হারে।
কুচ জুগ চকেব চরই গঙ্গা ধারে ॥৮।

নগেন্দ্রবাবু টীকায় লিখিয়াছেন—

৫। বিশেখি—বিশেষ, শ্রেষ্ঠতর। দেখলি—দেখিলাম। নিরমলি—নির্মিতা। ৬। সঞো—হইতে। আইলি—আসিল। ৫—৬। এই রমণীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর নির্মিতা (কোন নারী) দেখি নাই, স্বর্গ হইতে গজগামিনী চলিয়া আসিল। ৭। গিম—গ্রীবা। লাবল—নামিল, দুলিল। ৮। চকেব—চক্রবাক। চরই—

চরিতেছে। ৭—৮। গ্রীবা হইতে মুক্তাহার দুলিল, যেন কুচ চক্রবাকযুগল গঙ্গাধারে (হারের পার্শ্বে) চরিতেছে।

প্রথমতঃ বক্তব্য এই যে, "বিশেখি ন দেখিল" ইত্যাদি পংক্তির "এ" শব্দটা শুদ্ধ পাঠ বলিয়া স্বীকার করিলে ঐ পংক্তির "শে" "দে" ও "এ" অক্ষর তিনটীকে লঘুরূপে উচ্চারিত না করিলে ছন্দোভঙ্গ ঘটিয়া থাকে। যদিও মৈথিল ভাষায় 'এ' ও 'এ'-কারান্ত বর্ণ বিকল্পে লঘুরূপেও গণ্য করা যাইতে পারে, কিন্তু একটা পংক্তিতে তিনটা দীর্ঘস্বরের এইরূপ হ্রস্ব উচ্চারণ বিদ্যাপতির ভাষায়ও বড় একটা দেখা যায় না। আমাদের বিবেচনা হয় যে এ শব্দটা এখানে লিপিকরের ভুলে আসিয়াছে। 'এ' শব্দটা না থাকিলেও অর্থের কোন ক্ষতি হয় না, অথচ 'দে' অক্ষরটা গুরু উচ্চারিত হওয়ায় প্রয়োগের স্বাভাবিকতা রক্ষিত হয়। বিদ্যাপতির পদে 'দেখল' ও 'দেখলি' শব্দের 'দে' অক্ষর যে প্রায় সর্বত্রই গুরুবর্ণরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে, নিম্নলিখিত প্রয়োগগুলি দেখিলেই তাহা প্রতীত হইবে, যথা—

(ক) জুগল শৈল সিম হিমকর দৈখল
(১৯ সংখ্যক পদ)

(খ) কি আরে নব যৌবন অভিরামা।
জত দেখল তত কহহি ন পরিঅ
ছও অনুপম এক ঠামা॥
(১৪ সংখ্যক পদ)

(গ) মাধব কি কহব সুন্দরি রূপে।
কতেক জতন বিহি আনি সমারল
দেখলি নয়ন স্বরূপে॥
(১৭ সংখ্যক পদ)

এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, সাধারণতঃ মৈথিল ভাষার 'দেখল' 'পেখল' ইত্যাদি শব্দের গুরুবর্ণগুলিকে গুরুরূপে উচ্চারিত করার দিকেই যথেষ্ট ঝোঁক দেখা যায়, কেবল যেখানে ছন্দের অনুরোধে সেগুলিকে লঘুরূপে উচ্চারিত না করিলে চলে না, সেখানেই বাধ্য হইয়া বিকল্প বিধির আশ্রয় লওয়া হয়।

বিদ্যাপতির ছন্দোবিচারে এ কথাটা সর্বদাই মনে রাখা আবশ্যক। সে যাহা হউক, নগেন্দ্রবাবু 'বিশেখি ন দেখলি' ইত্যাদি পংক্তির যে ক্লীষ্ট ও অসঙ্গত অন্বয় দ্বারা পূর্বোক্ত অর্থ বাহির করিয়াছেন, তাহা আমরা কোনমতেই সমর্থন-যোগ্য বলিয়া মনে করিতে পারি নাই। 'বিশেষ' শব্দের অর্থ যদি তর্কস্থলে শ্রেষ্ঠতর বলিয়াও স্বীকার করা যায় তাঁহা হইলেও 'বিশেষি' 'বিশেখি' শব্দের অর্থ 'বিশেষ করিয়া' ব্যতীত 'বিশিষ্ট' বা 'শ্রেষ্ঠ' কোনমতেই সিদ্ধ করা যায় না। বিদ্যাপতির পদে 'বিশেখি' শব্দটা অন্যত্র 'বিশেষ করিয়া' অর্থেই প্রযুক্ত দেখা যায়, কুত্রাপি 'বিশিষ্ট' বা 'শ্রেষ্ঠ' অর্থে উহার প্রয়োগ দেখা যায় না। নিম্নে কয়েকটী দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইল, যথা—

(ক) সংশয় পড়ল সব দেখি।
কেও বোলএ তাহি জুগুতি বিশেখী॥
(১৬ সংখ্যক পদ)

বিশেখী — বিশেষ করিয়া। (নগেন্দ্রবাবুর টীকা)

(খ) হৃদয় হার মোর দেখী।
লোভে নিকট নহি হোএব বিশেখী॥
(২২২ সংখ্যক পদ)

বিশেখী — বিশেষ করিয়া। (ঐ টীকা)

(গ) নাসা তিলফুল গরুড় চঞ্চু জিনি।
গিধিনী শ্রবণে বিশেখী॥
(২৫০ সংখ্যক পদ)

নাসা তিলফুল গরুড় চঞ্চু জিনিয়া, শ্রবণ গৃধিনী হইতে বিশেষ (প্রধান জিনিয়া)। (নগেন্দ্রবাবুর টীকা)

বস্তুতঃ বিশেষ্য 'বিশেখ' শব্দটীর অর্থ সার গ্রীয়ারসন সাহেব মহোদয়ের মৈথিল শব্দকোষেও "speciality" লিখিত হইয়াছে। সংস্কৃত "বিশেষ" শব্দের অর্থও তাই বটে। আমাদের আলোচ্য পক্তিতেও "বিশেখী" শব্দের ঐ স্বাভাবিক ও সঙ্গত অর্থ ধরিয়াই অর্থ করা যায় যে, বিশেষ করিয়া অর্থাৎ গুণে অতিক্রম করিয়া এরূপ নির্মলা অর্থাৎ গৌরাঙ্গী সুন্দরী রমণী আর দেখি নাই। নগেন্দ্রবাবু যে "নিরমলি"

শব্দের "নির্মিতা" অর্থ করিয়াছেন, উহা সঙ্গত নহে। এরূপ অর্থে 'নিরমল' বা 'নিরমলি' শব্দের প্রয়োগ আমরা পদাবলী সাহিত্যে কোথাও পাই নাই। 'নিরমল' শব্দ ক্রিয়াপদ হইলে, উহার অর্থ 'নির্মাণ করিল' এবং বিশেষণ হইলে উহার অর্থ 'নির্মল' হইবে। এখানে 'নিরমলি' শব্দের '(বিধাতা) নির্মাণ করিল' অর্থ সঙ্গত না হওয়ায়, উহা 'নির্মলা' শব্দের অপভ্রংশ ও 'গৌরাঙ্গী সুন্দরী' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়াই বিবেচনা হয়। নগেন্দ্রবাবু যে 'রমণী' শব্দের পরে 'অপেক্ষা' অর্থে পঞ্চমী বিভক্তির লোপ করিয়া 'রমণীর অপেক্ষা' অর্থ করিয়াছেন, উহা ব্যাকরণ বা প্রয়োগ অনুসারে কোনমতেই সিদ্ধ হয় না। তাঁহার অন্বয় ও ব্যাখ্যা আগাগোড়া ব্যাকরণ ও প্রয়োগের বিরুদ্ধ এবং অসঙ্গত বটে। আমাদের প্রদর্শিত অন্বয় ও অর্থ ব্যাকরণ ও প্রয়োগ দ্বারা উত্তমরূপে সমর্থিত হইতেছে। অবশ্য এরূপ অর্থ করিতে হইলে একটা 'এসী' (এরূপ) শব্দ উহ্য করিতে হয়; আলোচ্য পংক্তির 'এ' শব্দটা ধরিলে, উহার অর্থও এইরূপ করা যাইতে পারে। নগেন্দ্রবাবুর অর্থে ব্যাকরণ ও প্রয়োগ অগ্রাহ্য করিয়াও 'কোন নারী' শব্দদ্বয় ও পঞ্চমী বিভক্তি উহ্য করিতে হইয়াছে, উহা হইতে পূর্বোক্ত ব্যাখ্যাই সমীচীন মনে হয়।

নগেন্দ্রবাবু 'লাবল' (লাওল) শব্দের অর্থ 'নামিল' 'দুলিল' লিখিয়াছেন; কিন্তু এরূপ অর্থ কোনরূপে সিদ্ধ হয় না। সংস্কৃত 'লা' ধাতুর মত হিন্দী ও মৈথিল ভাষায়ও গ্রহণার্থক লা ধাতুর বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। সার গ্রীয়ারসন সাহেবের মৈথিল শব্দকোষে 'লা' ধাতুর অতীত 'লাএল' পদ আছে। 'লাবল' শব্দের 'ব' অন্ত্যস্থ 'ব' বলিয়া 'লাবল' 'লাওল' 'লাএল' সকল রূপই সম্ভব বটে। 'লা' ধাতুর মৌলিক অর্থ 'গ্রহণ' হইতেই 'আনিয়া সম্মিলিত করা' বা সংঘটিত করা আসিয়াছে। বিদ্যাপতির আর একটী মৈথিল পদে 'সংঘটন করে' অর্থেই আমরা 'লাবএ' শব্দের প্রয়োগ পাইয়াছি, যথা—

জগত কত ন জুব জুবতী
কত ন লাবএ পেম ॥
(নগেন্দ্রবাবুর ২৬০ সংখ্যক পদ)

জগতে কত কত যুবক যুবতী প্রেম সংঘটন করে। (নগেন্দ্রবাবুর টীকা)

এখানেও 'লাবল' 'সংঘটিত করিল' অর্থাৎ 'সম্মিলিত করিল' অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। 'গিম সঞো' ইত্যাদি পংক্তির অর্থ গ্রীবার সহিত মুক্তাহারকে

(কুচযুগের সহিত) সম্মিলিত করিল। 'সঞো' বা 'সঞে' শব্দের অর্থ যদি 'হইতে' করা যায়, তাহা হইলে অর্থ হইবে —গ্রীবা হইতে মুক্তাহারকে (কুচযুগের সহিত) সম্মিলিত করিল। অবশ্য এই বাক্যের তাৎপর্য অর্থ শ্রীরাধা গলায় হার ঝুলাইল ; কিন্তু তা বলিয়া সোজাসুজি 'লাবল' শব্দের অর্থ 'নামিল' বা 'দুলিল' করা যাইতে পারে না। সেরূপ করিলে ব্যাকরণ ও প্রয়োগকে একবারে বিসর্জন দিতে হয়। 'ল' ও 'ন' এবং 'ম' ও 'ব' অনেক সময়েই পরস্পর পরিবর্তনীয় হইলেও মৈথিল বা হিন্দী ভাষায় 'নমাবল' বা 'নমাওল' ব্যতীত 'নামাইল' বা 'দোলাইল' অর্থে 'লাওল' বা 'নাওল' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় না।

(২২ সংখ্যক পদ)

নগেন্দ্রবাবুর সংস্করণের ২১ সংখ্যক পদের সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কোন বক্তব্য নাই। তাঁহার ২২ সংখ্যক "শুনহ নাগর কান" ইত্যাদি পদটীর টীকার শেষে লিখিত হইযাছে—"বটতলার পুস্তক হইতে সংশোধিত পদ"। বস্তুতঃ কলিকাতার বটতলার মুদ্রাযন্ত্রসমূহ হইতে বহু গ্রন্থই প্রকাশিত হইয়াছে। নগেন্দ্র-বাবু উহার কোন্ গ্রন্থ হইতে এই পদটী সংগৃহীত করিয়াছেন, বুঝা গেল না। সে যাহা হউক, এই পদে শ্রীরাধার শাশুড়ী জটিলা নামে উল্লিখিত হইয়াছেন, যথা —

জটিলা-বধূ নবীন বালি।
অপন সোভাবে কর খেয়ালী॥

বিদ্যাপতির কোন নিঃসন্দিগ্ধ পদেই জটিলা নামে শ্রীরাধার শাশুড়ীর উল্লেখ পাওয়া যায় না। এমন কি তাঁহার সমসাময়িক কবি চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন' গ্রন্থেও 'জটিলা' নামের ব্যবহার দেখা যায় না। নগেন্দ্রবাবুর সংস্করণের ৫৩৪ সংখ্যক "জটিলা শাশ ফুকরি তহিঁ বোলত" ইত্যাদি বিদ্যাপতির ভণিতা যুক্ত পদটী যে বিদ্যাপতির রচিত নহে,— উহার প্রমাণ উক্ত ৫৩৪ সংখ্যক পদের আলোচনায় দেওয়া যাইবে। এখানে শুধু ইহাই বক্তব্য যে বটতলার পুস্তকের "শুনহ নাগর কান" ইত্যাদি পদের ভাষা অথবা ভাবের মধ্যে এমন কিছুই নাই, যাহাতে উহাকে বিদ্যাপতির রচিত মনে করা যায়। পক্ষান্তরে উহার 'জটিলা' শব্দ এবং ছন্দোদুষ্ট "অপন সোভাবে কর খেয়ালি" ইত্যাদি

বাক্যসমূহই উহাকে ব্রজবুলী রচনায় অপরিপক্ক কোন বঙ্গীয় কবির রচনা বলিয়াই স্পষ্ট পরিচয় দেয়।

(২৩ সংখ্যক পদ)

নগেন্দ্রবাবুর ২৩ সংখ্যক "সুধামুখি কে বিহি নিরমিল বালা" ইত্যাদি পদটি 'পদকল্পতরু'র ১০৫৯ সংখ্যক পদ বটে। এ পদের শুদ্ধ ও প্রামাণিক পাঠ মৎসম্পাদিত 'পদকল্পতরু' গ্রন্থে (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ) দ্রষ্টব্য। নগেন্দ্রবাবু 'পদকল্পতরু' অশুদ্ধ সংস্করণ হইতে পাঠগ্রহণ ও ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া, এই পদে যে কতকগুলি ভুল করিয়াছেন, উহার আলোচনা করিয়াই আমাদের আজিকার বক্তব্য শেষ করিব।

এই পদের অন্তিম কলিদ্বয়, যথা —

তিন বাণে মদন জিতল তিন ভুবনে
অবধি রহল দউ বাণে।
বিধি বড় দারুণ বধিতে রসিক জন
সোঁপল তোহর নয়ানে॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর যুবতি
ইহ রস কো পয়ে জান।
রাজা শিব সিংহ রূপ নরায়ণ
লছিমা দেবী পরমাণ॥

নগেন্দ্রবাবুর পাঠ ও টীকা, যথা—

তিন বাণ মদন তেজল তিন ভুবনে
অবধি রহল দউ বাণে।
বিধি বড় দারুণ বধইতে রসিক জন
সোঁপল তোহর নয়ানে॥ ৮॥
ভণই বিদ্যাপতি শুন বর যুবতি
ইহ রস কেও পয় জানে।
রাজা শিব সিংহ রূপ নরায়ণ
লখিমা দেবী রমানে॥ ১৮॥

৭—৮। মদন তিন বাণ ত্রিলোকে ত্যাগ করিল, দুই বাণ অবশিষ্ট রহিল। বিধি বড় নিষ্ঠুর, রসিক পুরুষকে বধ করিবার জন্য (সেই দুই বাণ) তোমার নয়নে সমর্পণ করিয়াছেন।

৯। কেও—কেহ। পয়—অব্যয় শব্দ।

১০। রমাণ—রমণ, বল্লভ।

৯—১০। বিদ্যাপতি কহিতেছে, শুন যুবতী শ্রেষ্ঠ, এই রস লখিমা দেবীর বল্লভ রাজা শিব সিংহ রূপনারায়ণের (তুল্য) কেহ (বিরল ব্যক্তি) জানে।

প্রথমেই বক্তব্য এই যে, নগেন্দ্রবাবু 'জিতল' শব্দের স্থলে বটতলার পুস্তকের 'তেজল' পাঠ গ্রহণ করিয়া যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা কোনরূপেই সঙ্গত হইতে পারে না। মদন স্বর্গ, মর্ত ও পাতাল—এই তিন লোকে তিনটি বাণ ত্যাগ করিল, শুধু ইহা বলিলেই ত্রিলোকের জয় বুঝা যায় না। 'তেজল' পাঠের স্থলে সকল পুথিতেই 'জিতল' ও কেবল বটতলার আদর্শ 'ক' পুথিতে 'তিজল' পাঠ আছে। প্রাচীনতর ও প্রামাণিক 'খ' 'ঘ' পুথির 'জিতল'ই লিপিকরের ভুলে 'তিজল' পাঠে পরিণত হইয়াছে— ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। অর্থ হইবে—(শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে বলিতেছেন,) মদন তাঁহার তিনটি বাণের দ্বারা তিন লোক জয় করিলেন, দুইটি বাণ উদ্বৃত্ত হইল; সুতরাং সেই দুইটি বাণ নিজের নিকট রাখিয়া কোন কার্য নাই বুঝিতে পারিয়া তিনি রসিক পুরুষদিগের পরাজিত করার জন্য তোমার নয়নদ্বয়ে এ দুইটি বাণ সমর্পণ করিয়াছেন।

এই 'তেজল' পাঠের সম্বন্ধে ইহাও বক্তব্য যে, পূর্ববর্তী সম্পাদক কাব্য-বিশারদ মহাশয়ের সংস্করণে 'জিতল' পাঠ ও উহার টীকায় 'জয় করিয়াছেন' অর্থ লিখিত হইয়াছে। নগেন্দ্রবাবু অনেক স্থলেই কাব্যবিশারদ মহাশয়ের ধৃত অনেক অশুদ্ধ পাঠ সংশোধিত করিয়া লইয়াছেন; এরূপ অবস্থায় তিনি এখানে তাঁহার শুদ্ধ ও সঙ্গত পাঠটী ত্যাগ করিয়া অশুদ্ধ ও অসঙ্গত পাঠ কেন গ্রহণ করিলেন, বুঝা গেল না।

দ্বিতীয় কথা, তিনি যে জন্যই হউক 'বধিতে' শব্দের স্থলে 'বধইতে' পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু উহাতে যে পংক্তিটীতে ১৬ মাত্রার স্থলে ১৭ মাত্রা হওয়ার ছন্দোভঙ্গ ঘটে, তিনি উহা লক্ষ্য করেন নাই। বেণীপুরী মহাশয় নগেন্দ্রবাবুর অন্ধ অনুকরণে তাঁহার অধিকাংশ অশুদ্ধ পাঠ গ্রহণ করিয়া থাকিলেও এখানে ছন্দোভঙ্গ সুস্পষ্ট বুঝিয়াই বোধহয় নগেন্দ্রবাবুর 'বধইতে' স্থলে 'বধয়ে'

পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। উহাতে ছন্দ রক্ষিত হইলেও অর্থের অসঙ্গতি হইয়া পড়িয়াছে। কেননা, 'বধয়ে' শব্দের অর্থ 'বধ করে' না হইয়া 'বধ করিবার জন্য' হইতে পারে না। বেণীপুরী মহাশয় 'বধয়ে' পাঠ কল্পনা করিয়াও ঐ বাক্যের অর্থ করিয়াছেন— "ব্রহ্মা বড়া হী নিষ্ঠুর হৈ, (উনবচে হুএ দো বাণোঁ কো) রসিকোঁ কী হত্যা করনে কে লিয়ে তুহ্মারে নয়নোঁ কো সোঁপ দিয়া।" ব্রজনন্দনবাবু তাঁহার 'মৈথিল-কোকিল-বিদ্যাপতি' গ্রন্থে 'বধিতে' শব্দের স্থলে 'বধত' পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। 'বধত' শব্দের অর্থ—'বধ করে' অথবা 'বধ করিতে' উভয়ই হইতে পারে। বস্তুতঃ এখানে যে 'বধিতে' পাঠ আছে, উহার 'তে' অক্ষর মৈথিল ভাষার নিয়ম অনুসারে বিকল্পে লঘু গণ্য করিলে উহা দ্বারা ছন্দের কোন হানি হয় না ; সুতরাং ছন্দের জন্য 'বধত' পাঠ কল্পনা করার কোন কারণ দেখা যায় না। যদিও আধুনিক মৈথিল ভাষায় 'করিতে' 'যাইতে' ইত্যাদির অর্থে 'করইত' 'জাইত' ইত্যাদি রূপগুলির অধিক প্রয়োগ দেখা যায়, কিন্তু 'করিতে' 'জাইতেঁ' ইত্যাদি রূপগুলিও প্রাচীন প্রয়োগে দুষ্প্রাপ্য নহে। আমরা স্যার গ্রীয়ারসনের মৈথিল শব্দকোষে 'জাইত' ও 'জাইতেঁ'— এই উভয় রূপই পাইয়াছি। সুতরাং বিদ্যাপতির বঙ্গীয় পদাবলীর 'করিতে' 'যাইতে' ইত্যাদি বহু কৃদন্ত শব্দ অশুদ্ধ বিবেচনায় নগেন্দ্রবাবু প্রভৃতি যে তৎস্থলে 'করইত' 'যাইত' ইত্যাদির ব্যবহার করিয়াছেন, উহা আমরা সমীচীন মনে করি না। ঐরূপ করিলে আলোচ্য 'বধইতে' শব্দের ন্যায় অনেক স্থলেই যে ছন্দের মাত্রা ঠিক থাকে না, উহা দ্বারাই নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, এরূপ স্থলে 'করত' 'জাইত' ইত্যাদি অথবা বঙ্গীয় পুথি অনুসারে 'করিতে' 'যাইতে' ইত্যাদি ত্রিমাত্রিক শব্দ ব্যতীত কোনরূপেই 'করইত' ইত্যাদি চতুর্মাত্রিক শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে না।

নগেন্দ্রবাবুর গৃহীত 'যুবতি' পাঠেও ছন্দোভঙ্গ অনিবার্য বটে। বেণীপুরী মহাশয় উহা বুঝিতে পারিয়াই তৎস্থলে 'জৌবতি' পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ 'যুব' 'জৌ' গুরু অক্ষর বলিয়া উভয়ই এখানে প্রযুক্ত হইতে পারে। বিদ্যাপতির মৈথিল পুথিতে অনেক স্থলেই 'যুবতি' শব্দের পরিবর্তে 'জৌবতি' বা উহার অপভ্রংশ 'জৌমতি' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। ব্রজনন্দনবাবু ছন্দের দোষ এড়াইবার জন্য 'যুবতী' পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। 'যুবতী' সংস্কৃত রূপ হইলেও হিন্দী বা মৈথিল ভাষায় প্রায়শঃ 'যুবতি' (জুবতি) ব্যতীত 'যুবতী' শব্দের ব্যবহার দেখা

যায় না। বিদ্যাপতির ছন্দের আর একটা বিশেষত্ব এই যে উহাতে শব্দের আদ্য বর্ণকে গুরুরূপে ধ্বনিত করার প্রবণতা দেখা যায়। 'যুবতি' 'যৌবতী' বা 'যুবতী' শব্দগুলির প্রত্যেকটী চতুর্মাত্রিক শব্দ হইলেও 'যুবতি' বা 'জৌবতি' শব্দের প্রথম অক্ষর গুরু উচ্চারিত হইলেই উচ্চারণের উক্ত স্বাভাবিকতা রক্ষিত হয়, কিন্তু 'যুবতী' পাঠে সেই স্বাভাবিকতা রক্ষিত হয় না, বিশেষতঃ প্রচলিত ব্যবহার লংঘন করিয়া 'তী' অক্ষরকে গুরু উচ্চারিত না করিলে ছন্দোভঙ্গই ঘটিয়া থাকে। বিদ্যাপতির ছন্দের রহস্যজ্ঞ বেণীপুরী মহাশয় এজন্যই সংস্কৃত 'যুবতী' শব্দটা সুলভ হইলেও উহা না লইয়া 'জৌবতি' শব্দই গ্রহণ করিয়াছেন। গ্রীয়ারসন্ মহোদয়ের মৈথিল শব্দকোষে 'জুবতি' ও 'জৌমতি' শব্দ আছে ; 'যুবতী' বা 'জুবতী' শব্দ নাই।

নগেন্দ্রবাবুর "কেও পয় জানে" পাঠ ও উহার অর্থ কিঞ্চিৎ রহস্যপূর্ণ। 'পদকল্পতরু'র 'ক' 'খ' পুথি 'পদরসসার' ও 'পদরত্নাকর' পুথিতে 'কেও পয় জানে' স্থলে 'কো যুবতি জান' এবং 'ঘ' 'চ' পুথিতে 'কো পয়ে জান' পাঠ আছে। কাব্যবিশারদ মহাশয়ের ও তদনুযায়ী ব্রজনন্দনবাবুর সংস্করণে 'কূপ যে জানে' পাঠ আছে। কাব্যবিশারদ টীকায় লিখিয়াছেন, "কূপ কোন ২ হস্তলিখিত পুস্তকে 'কোপ' পাঠ পাওয়া গেল।" তিনি তাঁহার ধৃত 'ইহ রস কূপ যে জানে' বাক্যের কোন অর্থ করার প্রয়াস করেন নাই। ব্রজনন্দনবাবু শুধু "রসকূপ = অগম রস" অর্থাৎ অগম্য রস লিখিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। বাংলা প্রাচীন সাহিত্যে দুই এক স্থানে কেবল রসের কূপ ইত্যাদি প্রয়োগ পাওয়া গেলেও বিদ্যাপতির পদে তাদৃশ প্রয়োগ দেখা যায় না। বস্তুতঃ আমাদিগের দৃষ্ট উক্ত পুথিগুলিতে 'কূপ' বা 'কোপ' পাঠ নাই। 'ইহ রস কো জান' পাঠই অনভিজ্ঞ লিপিকরের ভুলে 'ইহ রস কোপ' (অথবা কূপ কে জানে), অদ্ভুত পাঠে পরিণত হইয়াছে। সে যাহা হউক নগেন্দ্রবাবু যে কোথায় 'ইহ রস কেও পয় জানে' পাঠ পাইলেন বুঝা গেল না। বোধ হয় উহা তাঁহার অনেক পাঠের মতই সম্পূর্ণ মনোকল্পিত। এরূপ অপ্রামাণিক ও কল্পিত পাঠ গ্রহণ করিয়াও তিনি কোন সঙ্গত অর্থ করিতে পারেন নাই। তিনি 'পয়' শব্দটীকে অব্যয় শব্দ লিখিয়াই অব্যাহতি পাওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু অব্যয় শব্দের কি কোন অর্থ নাই? সকল ভাষার সকল অব্যয় শব্দেরই অনেক সময়েই একাধিক অর্থ পাওয়া যায়।

এখানে 'পয়' শব্দের কি অর্থ, তাহা নির্ণয় কর্তব্য ছিল। নগেন্দ্রবাবু ও তাঁহার অন্ধ অনুকরণে বেণীপুরী মহাশয় ব্যাকরণের নিয়মবিরুদ্ধ দুরান্বয় করিয়া এই অন্তিম কলির যে অর্থ দিয়াছেন উহা কোনরূপেই সিদ্ধ হয় না। প্রামাণিক ও শুদ্ধ পাঠ প্রথমেই উদ্ধৃত হইয়াছে। উহার কি অর্থ হইতে পারে, এখন উহাই বিচার্য বটে। গ্রীয়ারসন মহোদয়ের শব্দকোষে 'পয়' বা 'পৈ' শব্দের সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে "Prep. on ; upon: in ; form (of time), Conj though, although : properly indecl. part of."

এখানে 'পয়' শব্দের though বা although অর্থ ধরিয়া উক্ত বাক্যের অর্থ হয়,—বিদ্যাপতি কহিতেছেন, হে যুবতিশ্রেষ্ঠ! যদি কেহ এই রসকে জানেন, (তবে,) রূপনারায়ণ (উপাধিবিশিষ্ট) রাজা শিবসিংহ ও লছিমা দেবী (উহার) প্রমাণ অর্থাৎ তাঁহারা উভয়ে ঐ রসতত্ত্বের নির্ণয়ে সমর্থ বটে। সংস্কৃত সাহিত্যে দেখা যায় যে, রাজকর্মচারীরা রাজার নিকটে কোন বিষয় নিবেদন করিলে, শেষে 'অত্র স্বামি-পাদাঃ প্রমাণম্'—এইরূপ বাক্যের উপসংহার করিতেন। ইহার তাৎপর্য এই যে, আমি যতদূর জানি মহারাজের নিকট নিবেদন করিলাম, ইহার প্রকৃত তত্ত্বের নির্ণয়ে মহারাজই সমর্থ।

রাজসভাসদ্ কবি বিদ্যাপতিও বহু পদেই নিজের অনুভব বর্ণিত করিয়া তাঁহার আশ্রয়দাতা রাজা শিবসিংহের ও তাঁহার প্রধান মহিষীর গুণজ্ঞতা ও রসজ্ঞতা ব্যক্ত করিয়া পদের উপসংহার করিয়াছেন। মৈথিল কোন কোন পুথিতে 'প্রমাণ' শব্দজাত 'পরমাণ' শব্দটী লিপিকরদিগের প্রমাদহেতু বিকৃত হইয়া 'বিরমাণ' বা 'রমাণ' রূপ ধারণ করায় নগেন্দ্রবাবু এবং তাঁহার অনুকরণে বেণীপুরী মহাশয় এরূপ স্থলে পাঠ ও অর্থের গোলযোগ করিয়া ফেলিয়াছেন। যদিও গ্রীয়ারসনে কুত্রাপি 'রমাণ' পাঠ নাই, তথাপি 'রমণ' শব্দ হইতে যে অপভ্রংশ 'রমাণ' না হইতে পারে, তাহা নহে। আমাদিগের ইহাই বক্তব্য এখানে এবং এরূপ আরও অনেক স্থলে 'রমাণ' প্রামাণিক পাঠ নহে। এই যে সকল পদে লিপিকরদিগের প্রমাদবশতঃ 'পরমাণ' পাঠ 'বিরমাণ' 'রমাণ' পাঠে পরিণত হইয়াই অর্থের দুর্বোধ্যতার কারণ হইয়াছে, বলা আবশ্যক যে, কাব্যবিশারদ মহাশয় ও তাঁহার অনুকরণে ব্রজনন্দনবাবু এখানে 'পরমাণে' পাঠ গ্রহণ করিয়াও ঐ আপাতদুর্বোধ্য শব্দটার অর্থ করার কোন প্রয়াস করেন

নাই। কাব্যবিশারদ মহাশয় "মাধব কি কহব সুন্দরী রূপে" ইত্যাদি পদের ভণিতার "লছিমা দেবি পরমাণে" বাক্যের টীকায় লিখিয়াছেন—"পরমাণে—প্রমাণে, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বা সম্মুখে।" সঙ্গত হউক আর অসঙ্গত হউক প্রত্যক্ষাদি ন্যায়ানুসারী প্রমাণ বলিয়া প্রত্যক্ষ অর্থে প্রমাণ শব্দের প্রয়োগ বাঙ্গালা ভাষায় মধ্যে মধ্যে দেখা যায়। "ত্বরা করি যাহ বীর রাম সন্নিধান। এই কথা কহ গিয়া তাঁহার প্রমাণ" ইত্যাদি স্থল ইহার দৃষ্টান্ত। বলা বাহুল্য যে, সঙ্গত ভাবে "প্রমাণ" শব্দের "প্রত্যক্ষ" অর্থ যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও আলোচ্য স্থলে "প্রত্যক্ষে" বা "সম্মুখে" অর্থ সংলগ্ন হয় না। সুতরাং এখানে 'পরমাণ' শব্দের পূর্ব ব্যাখ্যাত অর্থই যে ঠিক, তাহাতেও সন্দেহ নাই। "কহ গিয়া তাঁহার প্রমাণ" বাক্যেও সেই মূল অর্থই অন্তর্নিহিত আছে। অর্থাৎ —রামের সন্নিধানে যাইয়া এই কথা বল, তিনিই তোমার কথার তত্ত্ব নির্ণয়ে সমর্থ। নগেন্দ্রবাবুর সংস্করণের ১৫০, ১৭১, ২০৬ ও ২৪৮ সংখ্যক পদেও 'পরমাণ' শব্দটা কোথাও লিপিকরের ভুলে আর কোথাও বা গ্রীয়ারসন্ সাহেবের অন্ধ অনুকরণের ফলে—'বিরমাণ' রূপ ধারণ করিয়া নগেন্দ্রবাবুর দ্বারা "রমণ", "বল্লভ" ব্যাখ্যাত হইয়াছে। গ্রীয়ারসন্ কিন্তু বিদেশী হইলেও অতদূর যাইতে সাহস করেন নাই। তিনি শব্দকোষে সন্দেহসূচক চিহ্ন দিয়া লিখিয়াছেন— "বিরমাণ, a queen (?)।"

(২৪ সংখ্যক পদ)

নগেন্দ্রবাবুর সংস্করণের ২৪ সংখ্যক পদটী এইরূপ যথা—

(সখীতে সখীতে কথা)

ধনি মুখ মণ্ডল চান্দ বিরাজিত
লোচন খঞ্জন ভাঁতি।
মদন চাপ জিনি ভৌঁহ লগ যুগ
দশনহি মোতিম পাঁতি॥ ২।
সখি হের রমণমোহিনি রাই।
কত কত বিদগধ হেরিতেহি মুরছিত
মদন পরাভব পাই॥ ৪।
কনক বিরোচি মনিহার বিলম্বিত
অধরহি বিম্ব অকারা।

নব উরজ পর মোতি বিরোচিত
সুমেরু সুরসরি ধারা॥ ৬।
(কীর্তনানন্দ।)

নগেন্দ্রবাবু টীকায় লিখিয়াছেন—

২। লগ—লাগে, অনুমান হয়।
৩। রমণমোহিনি—বল্লভ মোহিনী।
৪। বিরোচি—বিরচিত, খচিত।
৫। অকারা—আকার।
৬। নব পয়োধরের উপর মুক্তা (মালা) শোভিত (যেন) সুমেরুতে গঙ্গাধারা।

নগেন্দ্রবাবু মুর্শিদাবাদের সুপ্রসিদ্ধ স্বর্গীয় বৈকুণ্ঠনাথ সেন মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত 'কীর্তনানন্দে'র যে হস্তলিখিত পুথি হইতে এই ভণিতাহীন পদটী উদ্ধৃত করিয়াছেন, ঠিক সেই পুথিখানিই পরে লালগোলার রণরাজা বাহাদুরের সম্পূর্ণ অর্থব্যয়ে মুর্শিদাবাদ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। যদিও উপযুক্ত সংশোধনের ত্রুটিতে মুদ্রিত গ্রন্থে অত্যধিক ভ্রম-প্রমাদ রহিয়া গিয়াছে, তথাপি বলা আবশ্যক যে এই পদের অর্থহীন, 'লগ যুগ' স্থলে উহাতে 'লতা যুগ' শুদ্ধ পাঠই মুদ্রিত হইয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুথিশালার ২০১ সংখ্যক পুথি ও উহার 'পদরত্নাকর' পুথিতেও আমরা 'লতা যুগ' পাঠই পাইয়াছি। যদি নগেন্দ্রবাবু 'লগ—লাগে, অনুমান হয়' এইরূপ টীকা না করিতেন, তাহা হইলে ইহা ছাপাখানার ভুল মনে করিয়াই আমরা হয়ত ইহাকে উপেক্ষা করিয়া যাইতাম ; কিন্তু নগেন্দ্রবাবুর স্বীকৃত পাঠ, তাঁহার টীকায়ই উহা জানা যাইতেছে। নগেন্দ্রবাবু পুথির ও মুদ্রিত গ্রন্থের অনেক পাঠ শুদ্ধ করিয়া লইয়াছেন ; এরূপ অবস্থায় এখানে পুথির শুদ্ধ পাঠ অশুদ্ধ করিলেন কেন, প্রথমে উহার কারণ বুঝিতে আমাদের মনে খট্‌কা লাগিয়াছিল ; কিন্তু পরে বুঝিলাম যে তিনি বুঝিয়া শুনিয়া 'লতা' শব্দকে 'লগ' করেন নাই। প্রাচীন পুথির পুটুলি ও মাত্রাচিহ্নহীন কিঞ্চিৎ বিকৃত রূপ 'তা' অক্ষরটীকে তিনি ভুলে 'গ' অক্ষর মনে করিয়াই 'লতা' শব্দের স্থলে 'লগ' পাঠোদ্ধার করিয়া, অগত্যা কষ্টকল্পনার বলে 'লগ' শব্দের ঐরূপ একটা অদ্ভুত অর্থ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বিদ্যাপতির পাঠকদিগের অবগতির জন্য আমরা দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য যে বিদ্যাপতির কোন পদেই 'লগ' শব্দের 'অনুমান হয়'

অর্থ পাওয়া যায় নাই। তর্কস্থলে যদি 'লগ' শব্দের এরূপ অর্থ স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও 'লগ' ক্রিয়াপদটা মধ্যে রাখিয়া, "ভেঁাহ" (ভুরু) শব্দের সহিত 'যুগ' (যুগল) শব্দের যে কি প্রকারে সমাস অন্বয় হইতে পারে, তাহা আমাদিগের বুদ্ধির অগম্য বটে। ইহা ব্যতীত 'লগ' পাঠ হইলে 'মদন চাপ' ইত্যাদি পংক্তির এক মাত্রা কম পড়ে। 'লতা' পাঠে ছন্দ, অর্থ অন্বয় সমস্তই রক্ষিত হয়। সুতরাং 'লগ' যে পাঠোদ্ধারের ভুল,—তাহাতে সন্দেহ নাই। নগেন্দ্রবাবু প্রায় সকল পদেরই প্রায় সকল সহজ ও কঠিন শব্দের ও বাক্যের অর্থ লিখিতে ত্রুটি করেন নাই; কিন্তু, তিনি এখানে 'ভেঁাহ লগ যুগ'—এই একান্ত দুর্বোধ্য বাক্যের অর্থ না দিয়া, শুধু 'লগ' শব্দের একটা কাল্পনিক অর্থ দিয়া ক্ষান্ত হওয়ায়, ইহাই মনে হয় যে, এরূপ অর্থ করিলে ভেঁাহ শব্দের সহিত যুগ শব্দের যে যোড়া মিলে না তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াও গত্যন্তরের অভাবে আসল কঠিন ও দুর্বোধ্য কথাটাই চাপা দিয়া গিয়াছেন!

এখন আর কয়েকটি পাঠ ও অর্থের বিচার করা যাউক। 'সখি হের রমণ মনমোহিনী রাই' বাক্যের স্থলে পূর্বোক্ত ২০১ সংখ্যক পুথির পাঠ—'সখি বড়-মোহিনী রাই।' 'পদরত্নাকর' পুথির পাঠ—'সখি হে কিয়ে মনমোহিনী রাই।' আমাদের বিবেচনায় 'কীর্তনানন্দে'র ছন্দোদুষ্ট পাঠ অপেক্ষা এই উভয় পাঠই অধিক সঙ্গত। নগেন্দ্রবাবুর 'বিরোচিত' শব্দের স্থলে ২০১ সংখ্যক পুথি ও 'পদরত্নাকর' পুথিতে 'রচিত' পাঠ আছে। 'বিরচিত' শব্দের অপভ্রংশ হিন্দী বা মৈথিল ভাষায় 'বিরোচি' শব্দের আর প্রয়োগ পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না, বিশেষতঃ 'রচিত' পাঠের পরিবর্তে 'বিরোচি' পাঠ গ্রহণ করিলে ছন্দোপতন অনিবার্য হইয়া পড়ে, সুতরাং উক্ত ত্রিবিধ কারণেই আমরা 'রচিত' পাঠ প্রামাণিক ও সঙ্গত মনে করি।

নগেন্দ্রবাবুর ধৃত 'নব উরজ' ইত্যাদি পংক্তির পাঠও ছন্দোভঙ্গদুষ্ট বটে। ঐ পক্তির স্থলে ২০১ সং পুথির পাঠ—

নব উরজ পরি মোতি বিরাজিত

'পদরত্নাকরে'র পাঠ—

নব উর উপর মোতি বিরাজিত।

উভয় পাঠই ছন্দোদুষ্ট, কিন্তু উভয়ের তুলনা দ্বারা প্রকৃত শুদ্ধ পাঠ পাওয়া যাইতেছে—

নব উরজ উপর মোতি বিরাজিত ।

বলা বাহুল্য যে, নগেন্দ্রবাবুর ধৃত 'কীর্তনানন্দে'র "বিরোচিত" পাঠ এখানেও শুদ্ধ বা সংলগ্ন নহে।

নগেন্দ্রবাবু কাল্পনিক ও ছন্দোদুষ্ট 'সুরসরি' পাঠ গ্রহণ করিলেও 'কীর্তনানন্দ' গ্রন্থে এবং ২০১ সংখ্যক ও 'পদরত্নাকর' পুথিতে 'সুরেশ্বরি' পাঠ আছে। 'সুর-সরিৎ' শব্দের অর্থও 'সুরেশ্বরী' শব্দের ন্যায় গঙ্গা বটে। যথা—

দেবি সুরেশ্বরি ভগপতি গঙ্গে ।
ত্রিভুবন তারিণী তরল তরঙ্গে ॥
(গঙ্গাষ্টক)

'সুরসরিৎ' শব্দের অপভ্রংশ 'সুরসরি' সিদ্ধ হইলেও এখানে 'সুরসরি' পাঠ গ্রহণ করিলে অগত্যা সুমেরু শব্দের 'সে' অক্ষরটাকে গুরুরূপে উচ্চারিত না করিলে ছন্দোভঙ্গ ঘটে। মৈথিল ভাষায় একারযুক্ত বর্ণ বিকল্পে গুরু গণ্য হইলেও বিদ্যাপতির পদে সুমেরু শব্দের 'সে' অক্ষর প্রায় সর্বত্র লঘুরূপেই উচ্চারিত হইয়াছে দেখা যায়। সুতরাং এখানে উহার ব্যাতিক্রম করা সঙ্গত মনে হয় না। যখন সকল পুথিতেই 'সুরেশ্বরি' পাঠ আছে, তখন 'সুরেসরি' পাঠের কল্পনা অপ্রামাণিক ও অসঙ্গত। এই পদের সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কথা এই যে, নগেন্দ্রবাবু শুধু রচনার সাদৃশ্য দর্শনে বঙ্গীয় পুথির অনেক ভণিতাহীন পদ বিদ্যাপতির রচিত বলিয়া নিজের সংস্করণে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, এইরূপ অনুমানে পদ নির্বাচন করিতে যাইয়া তিনি অনেক সময়েই গুরুতর ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। আমরা যথাস্থলে সেই সকল পদের কৃতিত্বের আলোচনা করিব। এখানে কিন্তু অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়িতে যাইয়াও নগেন্দ্রবাবু লক্ষ্যভেদে কৃতকার্য হইয়াছেন, কেননা যদিও তাঁহার আলোচিত 'কীর্তনানন্দ' পুথি বা আমাদিগের আলোচিত সাহিত্য পরিষদের ২০১ সংখ্যক পুথিতে এই পদের ভণিতার কলিটি পাওয়া যায় না, কিন্তু সাহিত্য পরিষদের 'পদরত্নাকর' পুথির ষষ্ঠ তরঙ্গের ১২ সংখ্যক 'ধনি মুখ মণ্ডল' ইত্যাদি পূর্বালোচিত পদের শেষে আমরা বিদ্যাপতির ভণিতাটী পাইয়াছি ; যথা —

অলখিতে সত্বর অধরে ঝাঁপল
বঙ্কিম নয়নে নেহারী।
বিদ্যাপতি কহ সহচরীগণ সহ
পেখলুঁ অপরুব নারি॥

প্রাচীন কোন পদকর্তাই ভণিতাহীন পদ রচনা করেন নাই, বিশেষতঃ নগেন্দ্র-বাবুর সংস্করণে যেভাবে পদটা শেষ হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্টতঃ বর্ণনার ত্রুটি থাকিয়া যায়। 'পদরত্নাকর' পুথির এই অন্তিম কলির দ্বারা অসম্পূর্ণ পদটীর সুন্দর ও স্বাভাবিক পরিসমাপ্তি হইয়াছে; সুতরাং আমরা এই ভণিতার কলিটী প্রামাণিক বলিয়াই বিবেচনা করি। এই কলির বর্ণনাদ্বারা ইহাও বুঝা যাইতেছে যে, এই পদটী সখীতে সখীতে কথা নহে, ইহা শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগের একটা পদ বটে। নগেন্দ্রবাবু না জানিয়া ইহাকে "বয়ঃসন্ধি" অধ্যায়ে স্থান দিয়াছেন। এই অন্তিম কলির বর্ণনাদ্বারা আরও বুঝা যাইতেছে যে, পূর্বালোচিত নগেন্দ্রবাবুর 'সখি হের রমণ মোহিনি রাই' পাঠ এইরূপ স্থলে শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে কোনমতেই সঙ্গত হইতে পারে না। শ্রীরাধার অনুরাগের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়ার পূর্বে তাঁহার 'রমণ' অর্থাৎ 'বল্লভ' বলিয়া নিজেকে উল্লেখ করা শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে সম্ভবপর বা সঙ্গত হইতে পারে না; পক্ষান্তরে শ্রীরাধার রূপমুগ্ধ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে সখী অর্থাৎ নিজের আপ্তদূতীর নিকট 'সখি হে কিয়ে মনমোহিনি রাই' ইত্যাদি বাক্যে শ্রীরাধার সানুরাগ বর্ণনা যথেষ্ট স্বাভাবিক ও সুন্দর বটে। যাহা হউক, সযত্নে বহুসংখ্যক প্রাচীন পুথি মিলাইলে. কখন কখন এরূপ লুপ্ত রত্নোদ্ধারও করা যাইতে পারে, সুতরাং প্রাচীন পদাবলীর আলোচনায় একাধিক প্রাচীন পুথির তুলনা ব্যতীত কোন রূপেই ইষ্ট সিদ্ধির আশা করা যাইতে পারে না — এই অতি প্রয়োজনীয় তথ্যের প্রতি বিজ্ঞ পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আমরা এই পদের সম্বন্ধে আমাদিগের বক্তব্য শেষ করিব।

(২৬ সংখ্যক পদ)

নগেন্দ্রবাবুর 'জাইতি দেখলি পদ' ইত্যাদি ২৫ সংখ্যক পদটী সার গ্রীয়ারসন্ মহোদয়ের সংস্করণে ও ব্রজনন্দনবাবুর 'মৈথিল কোকিল বিদ্যাপতি'

গ্রন্থে আছে। নগেন্দ্রবাবু গ্রীয়ারসন্ সাহেবের পাঠ ও অর্থেরই অনুসরণ করিয়াছেন। এই পদের সম্বন্ধে আমাদিগের বিশেষ কিছু বক্তব্য নাই।

নগেন্দ্রবাবুর ২৬ সংখ্যক 'পথগতি নয়নে মিলল রাধা কান' ইত্যাদি পদটীতে কবিশেখরের ভণিতা আছে। কবিশেখর যে বিদ্যাপতির একটা উপনাম বা উপাধি ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। আবার প্রাচীন বাঙ্গালী পদকর্তা রায়শেখর যে তাঁহার অনেক বাঙ্গালা ও ব্রজবুলী পদে কবিশেখর নামে ভণিতা দিয়াছেন ইহাও সর্ববাদিসম্মত কথা বটে। বিদ্যাপতির মৈথিল ভাষা বাঙ্গালার ব্রজবুলীর প্রভাবে কিয়ৎ পরিমাণে বিকৃত হইয়া ব্রজবুলীর সহিত অধিকতর সাদৃশ্য প্রাপ্ত হওয়ায় এখন বিদ্যাপতির অধিকাংশ বঙ্গীয় পদের ভাষা দেখিয়া সেগুলিকে রায়শেখর গোবিন্দদাস প্রভৃতির ব্রজবুলী রচনা হইতে চিনিয়া লওয়া একান্ত অসাধ্য না হইলেও কঠিন মনে হয়। ফলতঃ নগেন্দ্রবাবু ও তাঁহার উপদেষ্টা মৈথিল পণ্ডিতগণ এজন্যই ভাষার সাদৃশ্যে ভ্রান্ত হইয়া, ভণিতা-হীন ও, কবিশেখর, চম্পতি, ভূপতি প্রভৃতির ভণিতাযুক্ত বহু সংখ্যক পদ বিদ্যাপতির রচিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করায় নগেন্দ্রবাবু ঐ সকল পদ তাঁহার সংস্করণে সন্নিবেশিত করিয়া, অযথাভাবে তাঁহার গ্রন্থের কলেবর বর্দ্ধিত করিয়াছেন। চম্পতি, ভূপতি সম্বন্ধে আমরা যথাস্থানে আলোচনা করিব। এখানে আমরা বাঙ্গালী কবি রায়শেখর ওরফে কবিশেখরের যে সকল পদ নগেন্দ্রবাবু কর্তৃক বিদ্যাপতির পদাবলীর মধ্যে অসঙ্গতরূপে সন্নিবেশিত হইয়াছে উহাদিগের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

নগেন্দ্রবাবুর আলোচ্য ২৬ সংখ্যক পদ ছাড়া, ১২৮, ১৭৮, ১৮৯, ২০৬, ২৪৯, ২৫২, ২৫৩, ২৫৫, ২৬৩, ২৬৪, ২৬৫, ২৭৫, ২৭৬, ২৯০, ২৯২, ৩০২, ৩১৬, ৪৩৬, ৫৪৫, ৫৪৬, ৫৪৭, ৫৫২, ৫৫৪, ৫৫৫, ৫৯৭, সংখ্যক পদগুলি যে বাঙ্গালী পদকর্তা কবিশেখর অর্থাৎ রায়শেখরের রচিত, উহার বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ও আভ্যন্তরীণ (internal) প্রমাণ আছে। আমরা নিম্নে সাধারণভাবে সেই প্রমাণগুলির উল্লেখ করিব, এই পদগুলির সম্বন্ধে অন্যান্য বিশেষ কথা যথাস্থলে আলোচিত হইবে।

১। উল্লিখিত পদগুলি রায়শেখরের রচিত অষ্টকালীয় লীলার বর্ণনাত্মক 'দণ্ডাত্মিকা' গ্রন্থে পাওয়া যায়। রায়শেখর কেবল স্বরচিত পদদ্বারাই ঐ গ্রন্থ সঙ্কলিত করিয়াছেন, ইহাই বৈষ্ণব সাহিত্যে প্রসিদ্ধ বটে। বস্তুতঃ 'দণ্ডাত্মিকা'

গ্রন্থে 'রায়শেখর' 'শেখর' 'কবিশেখর' 'কবিশেখর রায়' ইত্যাদি নামের ভণিতা ছাড়া অন্য কোন পদকর্তার ভণিতা পাওয়া যায় না। এই সকল পদের প্রায় পনের আনা পদ যে রায়শেখরের রচিত, সে বিষয়ে কোন মতভেদ নাই; এ অবস্থায় বাকি এক আনা পদ রায়শেখর কি জন্য যে নিজের নামে আত্মসাৎ করিবেন, তাহার কোন কারণ দেখা যায় না। সুতরাং বিরুদ্ধ প্রমাণাভাবে এই পদগুলিও রায়শেখরের রচিত বলিয়া গ্রহণ করা সঙ্গত।

২। উল্লিখিত পদগুলি 'দণ্ডাত্মিকা' গ্রন্থ হইতে 'পদকল্পতরু' প্রভৃতি অনেক প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন পদসংগ্রহে গৃহীত হইয়াছে; কিন্তু অপর পক্ষ এই পদগুলির মধ্যে কোন পদই মৈথিল 'রাগতরঙ্গিণী' কিংবা বিদ্যাপতির পদাবলীর তালপত্রের পুথিতে পাওয়া যায় নাই। এগুলি কবিশেখর উপাধিধারী বিদ্যাপতির রচিত হইলে উহার মধ্যে অন্ততঃ কোন কোন পদের মৈথিল রূপান্তর (version) মিথিলায় অবশ্যই পাওয়া যাইত।

৩। এই সকল পদের ব্রজবুলী ভাষার সহিত সাধারণতঃ বিদ্যাপতির মৈথিল ভাষার সাদৃশ্য থাকিলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা বিশেষজ্ঞ-দিগের পক্ষে একান্ত অসম্ভব নহে। নগেন্দ্রবাবু তাঁহার সংস্করণের ভূমিকায় বিশেষভাবে ২৩৫ ও ২৯০ পদ দুইটার রচনা বিদ্যাপতির ব্যতীত আর কাহারও বলিয়া মনে হয় না—এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু ভাষা সম্বন্ধে সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে ঐ পদদ্বয় ভাষাতত্ত্বের আভ্যন্তরীণ প্রমাণ অনুসারেও যে বাঙ্গালী কবির ব্রজবুলী রচনা বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিতে হয় তাহা আমরা অপ্রকাশিত 'পদরত্নাবলী' গ্রন্থের ভূমিকার ১৲—১৶ পৃষ্ঠায় সবিস্তারে প্রদর্শিত করিয়াছি; বিশেষ জিজ্ঞাসু পাঠকগণ অনুগ্রহ করিয়া পড়িয়া দেখিবেন। এখানে সে সকল কথার পুনরুক্তি করিয়া প্রবন্ধ বাড়াইব না। এই ভাষা বিচারের প্রধান বক্তব্য কথা এই যে, বিদ্যাপতির রচনা বাঙ্গালায় আসিয়া স্বাভাবিক নিয়মে বিকৃতি প্রাপ্ত হইলেও উহাতে অপভ্রংশ মৈথিল শব্দের সংখ্যা ও মৈথিল রীতিসিদ্ধ প্রয়োগ অনেক অধিক পাওয়া যায়, কিন্তু রায়-শেখর, গোবিন্দদাস প্রভৃতির ব্রজবুলী রচনায় সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগই অধিক দৃষ্ট হয়। ইহা ছাড়া বাঙ্গালা ব্রজবুলী রচনায় অনেক সময়েই ছন্দের এরূপ অনেক ত্রুটি দেখা যায়, যাহা বিদ্যাপতির মৈথিল মাত্রা ছন্দের রচনায়

একান্ত দুর্লভ বটে। দৃষ্টান্তস্থলে আলোচ্য ২৬ সংখ্যক পদটাই দেখুন। উহার প্রথম কলিটা এইরূপ, যথা—

পথ গতি পেখল মো রাধা।
দুহু মনে মনসিজ পুরল সন্ধান॥

এখানে দুই-দুই চারিমাত্রার রাধা শব্দটি ছন্দের অনুরোধে দুই মাত্রার শব্দরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। বাঙ্গালায় সাধারণতঃ 'রাধা' শব্দটী এরূপ লঘু বর্ণদ্বয় রূপেই উচ্চারিত হয়। সুতরাং এরূপ প্রয়োগ বাঙ্গালী কবির পক্ষেই কেবল স্বাভাবিক বটে। মৈথিল বিদ্যাপতির মাত্রা-ছন্দের পদে এরূপ প্রয়োগ সম্ভবপর নহে। দৃষ্টান্তস্থলে নগেন্দ্রবাবুর ৫৩ সংখ্যক পদের প্রথম কলিটা দেখুন—

পথ গতি পেখল মো রাধা।
তখনুক-ভাব পরাণ পৈ পীড়লি
রহল কুমুদনিধি সাধা॥ ২।

এই কলির প্রথম ও তৃতীয় পংক্তির নির্দিষ্ট ১২ মাত্রা পূরণ করার জন্য 'রাধা' ও উহার মিল (rhyme) 'সাধা' শব্দ দুইটী প্রত্যেকটী দুই-দুই চারি মাত্রাত্মক রূপে না পড়িলে চলে না।

উল্লিখিত পদগুলির প্রায় সবগুলি হইতেই বাঙ্গালী পদকর্তার পক্ষে স্বাভাবিক এইরূপ ছন্দের ত্রুটি প্রদর্শিত করা যাইতে পারে।

৪। বাঙ্গালী পদকর্তা রায়শেখর শ্রীমহাপ্রভুর গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তিনি সখীর অনুগা অভিমানে তাঁহার পদাবলীতে সেই অনুগার সমুচিত যে সকল সেবাকার্যের পরিচয় দিয়াছেন, বিদ্যাপতির পদে কুত্রাপি সেইরূপ সমুচিত সেবাকার্যের পরিচয় পাওয়া যায় না। সুতরাং ভাষা ও ছন্দোগত প্রমাণের ন্যায় উল্লিখিত পদগুলির আধ্যাত্মিক ভাবগত চতুর্থ আভ্যন্তরীণ প্রমাণ দ্বারাও সেগুলি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজভুক্ত বাঙ্গালী পদকর্তার রচনা বলিয়াই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। পাঠকদিগের কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্যে আমরা উল্লিখিত পদাবলী হইতে সখীসুলভ সেবাকার্যের কয়েকটা দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত করিলাম ঃ

শেখর পন্থ পর মিলল যাই।
আনল নাগর ভেটল রাই॥
(২৩৬ সং পদ)

যতনহি নিঃসরু নগর দুরন্তা।
শেখর অভরণ ভেল বহুন্তা॥
(৩৩৫ সং পদ)

শেখর বুঝি তব করি কত অনুভব।
দুহু সঙ্গ ভঙ্গ করায়॥
(২৬৫ সং পদ)

৫। উল্লিখিত পদগুলির মধ্যে দুইটী পদে স্পষ্টতঃ 'রায়' উপাধির উল্লেখ আছে। 'কবিশেখর' বা উহার সংক্ষেপ শুধু 'শেখর' বিদ্যাপতির উপনাম বলিয়া তাঁহার ভণিতায় ব্যবহৃত হইতে পারিলেও মৈথিল বিদ্যাপতি ঠাকুরের যে 'রায়' উপাধি ছিল, ইহা কেহই বলেন না। সুতরাং 'কবিশেখর' বা 'শেখর' শব্দের সহিত 'রায়' শব্দ সংযুক্ত পাইলে, ঐ ভণিতা যে রায়শেখর ব্যতীত 'কবিশেখর' বিদ্যাপতির কোনমতেই হইতে পারে না, ইহা বলা বাহুল্য। দুঃখের বিষয় যে, বিদ্যাপতির নূতন পদ সংগ্রহের জন্যে অত্যধিক আগ্রহান্বিত হওয়ায় নগেন্দ্রবাবুর সংগৃহীত 'নিন্দে নিন্দায়লি বালা' ইত্যাদি ৫৯৭ সংখ্যক পদের

কহ কবি শেখর রায়।
ধরম সরম লাগি ও রস নিভায়॥

ভণিতার এক কোণায় ক্ষুদ্র কিন্তু মিলের জন্য অপরিহার্য 'রায়ের' শব্দটা যে লুকাইয়া ছিল, নগেন্দ্রবাবু ব্যস্ততাহেতু তাহা লক্ষ্য করেন নাই। যাহা হউক, অতঃপর বিদ্যাপতি বৎসল কেহ যদি 'রায়' শব্দটাকেও মৈথিল কবি বিদ্যাপতির একটা অজ্ঞাতপূর্ব উপাধি বলিয়া প্রচারিত না করেন, তাহা হইলেই বাঙ্গালী রায়শেখরের সৌভাগ্য বলিতে হইবে।

নগেন্দ্রবাবু তাঁহার ভূমিকায় 'গগনে অব ঘন' ইত্যাদি যে ২৯০ সংখ্যক পদটীর রচনাদর্শনে উহা বিদ্যাপতির খাঁটি পদ বলিয়া মন্তব্য লিখিয়াছেন, উহার ভণিতার কলির প্রামাণিক ও শুদ্ধ পাঠ এইরূপ, যথা—

তুরিতে চল অব কিয়ে বিচারহ
জীবন মঝু অগুসার।
রায় শেখর বচনে অভিসর
কিয়ে সে বিঘিন বিথার॥

'পদকল্পতরু'র চারিখানা প্রাচীন হস্তলিখিত পুথি 'পদরসসার' পুথি ও সাহিত্য পরিষদের ১৯৪ সংখ্যক 'দণ্ডাত্মিকা' পুথিতে এইরূপই পাঠ আছে: কিন্তু নগেন্দ্রবাবু 'রায়শেখর' স্থলে 'কবিশেখর' পাঠ গ্রহণ করিয়া পদটী তাঁহার বিদ্যাপতির সংস্করণে সন্নিবেশিত করিয়াছে। নগেন্দ্রবাবু নিজে ইচ্ছা করিয়াই এরূপ মারাত্মক পাঠ পরিবর্তন করিয়াছেন— প্রকৃত বিষয় না জানিয়া তাঁহার উপর এমন একটা গুরুতর দোষারোপ করা আমরা সঙ্গত বিবেচনা করি না। তবে আমরা একথা না বলিয়া পারি না যে, নগেন্দ্রবাবু যদি কোন পুথিতে রায়শেখর স্থলে কবিশেখর পাঠ পাইয়াও থাকেন, তাহা হইলেও এ পাঠ 'পদকল্পতরু'র সকলগুলি মুদ্রিত সংস্করণের বিরুদ্ধে এবং স্পষ্টতঃ ছন্দোদুষ্ট বলিয়া উহা অগ্রাহ্য করিয়া 'পদকল্পতরু'র 'রায়শেখর' পাঠই শুদ্ধ মনে করিয়া পদটী পরিত্যাগ করা উচিত ছিল। এই পদের ধ্রুবপদ ব্যতীত প্রত্যেক কলিতে নিম্নরূপ মাত্রাবিভাগ দেখা যায়, যথা:—

৩+৪ ৩+৪

৩+৪+৪

"কবিশেখর" পাঠ গ্রহণ করিলে ৭ মাত্রা স্থলে ৬ মাত্রা হওয়ায় ছন্দো-পতন যে অনিবার্য হইয়া পড়ে, যাঁহাদিগের মাত্রা-ছন্দের সামান্য জ্ঞান আছে, তাঁহারাও উহা বুঝিতে পারিবেন। এ অবস্থায় নগেন্দ্রবাবুর মত একজন প্রবীণ সম্পাদক যে কেন সে বিষয়টা লক্ষ্য করেন নাই, আমরা বুঝিতে পারি না। বাঙ্গালায় একটা প্রবাদ আছে— 'গরজ বড় বালাই'। নগেন্দ্রবাবুর দৃঢ় বিশ্বাস যে, এরূপ উৎকৃষ্ট রচনা বিদ্যাপতির ছাড়া রায়শেখর প্রভৃতির মত কোন বাঙ্গালী কবির হইতে পারে না। যদি সেই বিশ্বাসের বলেই তিনি রায়শেখরকে কবিশেখর বানাইয়া থাকেন তাহা হইলে সেরূপ করা যে তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট অবিবেচনার কার্য ও সম্পাদকীয় কর্তব্যের গুরুতর ত্রুটি হইয়াছে, ইহা আমরা দুঃখের সহিত না বলিয়া পারিতেছি না। এই প্রসঙ্গে ইহাও বক্তব্য যে, বেণীপুরী মহাশয় তাঁহার হিন্দী সংস্করণে প্রায় সর্বত্র নগেন্দ্রবাবুর পাঠ ও টীকা গ্রহণ করিয়া থাকিলেও এখানে 'কবিশেখর' পাঠে স্পষ্টতঃ ছন্দোভঙ্গ ঘটিয়া থাকে, ইহা লক্ষ্য করিয়াই নগেন্দ্রবাবুর 'কবিশেখর' স্থলে 'কবীশেখর' পাঠ কল্পনা করিয়া ছন্দ বজায় রাখিয়াছে। ছন্দের জন্য কবির উপর এরূপ জবরদস্তি আর কুত্রাপি দেখা যায় নাই। বেণীপুরী মহাশয়কে বিশেষ দোষ দেওয়া

যায় না। তিনি 'পদকল্পতরু' প্রভৃতি বঙ্গীয় গ্রন্থগুলি বিশেষভাবে আলোচনা করেন নাই। বিদ্যাপতির বঙ্গীয় পদের জন্য তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে নগেন্দ্রবাবুর বৃহৎ ও পূর্ণাঙ্গ সংস্করণের উপরই অগত্যা নির্ভর করিতে হইয়াছে। তবে সেখানে তিনি বুঝিয়াছেন যে, নগেন্দ্রবাবুর পাঠে ছন্দোভঙ্গ ঘটে এবং এক আধটা ইকার বা উকার পরিবর্তন করিলেই সহজে ছন্দ রক্ষা করা যাইতে পারে, সেখানে তিনি 'কবি'কে 'কবী' করিয়া আর কিছু না হউক অধিকতর ছন্দোজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, 'পদকল্পতরু' প্রভৃতির প্রামাণিক পাঠ পাইলে তাঁহাকে 'কবীশেখর'এর মত একটা অদ্ভুত ও অজ্ঞাতপূর্ব শব্দের সৃষ্টি করিতে হইত না।

৬। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যে যেমন 'জটিলা' 'জরতী' 'ললিতা' প্রভৃতির কোন উল্লেখ পাওয় যায় না, তাঁহার সমসাময়িক বিদ্যাপতির মৈথিল পদাবলীতেও সেইরূপ বটে। 'কবি শেখর' ও 'শেখর' ভণিতা-যুক্ত উল্লিখিত পদগুলির মধ্যে কোন কোন পদে 'জরতি', শ্রীরাধার শাশুড়ী 'জটিলা' ও 'ললিতা' সখীর উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং এই আভ্যন্তরীণ প্রমাণ দ্বারাও বুঝা যায় যে, ঐ পদগুলি বিদ্যাপতির রচিত নহে।

(২৭ সংখ্যক পদ)

নগেন্দ্রবাবুর "ভল ভেল দম্পতি" ইত্যাদি ২৭ সংখ্যক পদটীর মৈথিল ও বঙ্গীয় পাঠে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। নগেন্দ্রবাবু মৈথিল তালপত্রের পুথি হইতে যে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহা প্রায় গ্রীয়ারসন্ সাহেবের পাঠের অনুরূপ। কাব্যবিশারদ মহাশয় শ্রীরাধার বয়ঃসন্ধি বিষয়ক ৮ সংখ্যক পদে যে বঙ্গীয় পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন, ব্রজনন্দনবাবু তাঁহার 'মৈথিল-কোকিল বিদ্যাপতি' গ্রন্থে প্রায় উহাই গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা পাঠবিচারে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে উক্ত উভয় পাঠই টীকাসহ নিম্নে উদ্ধৃত করিব।

নগেন্দ্রবাবুর ধৃত পাঠ, যথা—

(দূতীর উক্তি)

ভল ভেল দম্পতি শৈশব গেল।
চরণ চপলতা লোচনে লেল॥ ২।

দুহুক নয়ন তর দূতক কাজ।
ভূষণ ভএ পরিণত ভেল লাজ ॥ ৪।
আবে অনুখন দেঅ আঁচর হাথ।
বাজ সখী সঞে নত কএ মাথ ॥ ৬।
হমে অবধারল সুন সুন কাহ্ন।
নাগর করথু অপন অবধান ॥ ৮।
ভঁউহ ধনুষি গুণ কাজর রেখ।
মারতি রহত পোখ অবসেখ ॥ ১০।
রসময় বিদ্যাপতি কবি গাব।
রাজা শিবসিংহ বুঝ রস ভাব ॥

নগেন্দ্রবাবুর টীকা, যথা—

পর্বতীয় বরাড়ী বা চৌপই ছন্দ।

১। ভল—ভাল। দম্পতি—নায়ক ও নায়িকা।

১—২। (নায়িকার) শৈশব গেল, দম্পতির (পক্ষে) ভাল হইল; চরণের চপলতা লোচন হইল।

৪। ভ এ—হইয়া।

৩—৪। দুইজনের নয়ন দূতের কাজ করে (দূত মুখে কথা না পাঠাইয়া চক্ষে চক্ষে কথা হয়)। লজ্জা ভূষণ হইয়া (স্বরূপে) পরিণত হইল।

৬। বাজ—বাচ, কথা কয়। কএ—করিয়া।

৫—৬। এখন সর্বদা অঞ্চলে হাত দেয়, মস্তক নত করিয়া সখীর সঙ্গে কথা কয়।

৭। অবধারল—স্থির করিয়াছি, যথার্থ কহিতেছি।

৮। নাগর—রসিক, চতুর।

৭—৮। কানাই শুন শুন আমি যথার্থ কহিতেছি (যে) চতুর পুরুষ আপনার (প্রতি) মনোযোগ করুক (আত্মরক্ষায় যত্নবান হউক)।

৯। ভঁউহ—ভ্রূ। ধনুষ — ধনুক।

১০। পোখ— পংখ, বাণের পক্ষ যুক্তস্থান, শেষাংশ। অবসেখ— অবশেষ।

৯—১০। ভ্রূ ধনুক, কজ্জল রেখা গুণ, পুংখ (মাত্র) অবশিষ্ট (রাখিয়া) কটাক্ষ (বাণ) মারিবে। (কেবল পুংখ বাহিরে থাকিবে, অবশিষ্ট নয়ন বাণ মর্মে প্রবেশ করিবে)।

১১ — ১২। রসময় বিদ্যাপতি কবি গায়, রাজা শিবসিংহ রস ভাব বুঝেন।

বঙ্গদেশের পাঠে কিছু প্রভেদ আছে। বঙ্গীয় পাঠ, যথা—

আওল যৌবন শৈশব গেল।
চরণ চপলতা লোচন নেল॥ ২।
করু দুহু লোচন দুতক কাজ।
হাস গোপত ভেল উপজল লাজ॥ ৪।
অব অনুখন দেই আঁচরে হাত।
সগর বচন কহু নত করু মাথ॥ ৬।
কটিক গৌরব পাওল নিতম্ব।
চলইতে সহচরি-কর অবলম্ব॥ ৮।
হাম অবধারলু শুন বর কান।
শুনই অব তুহু করহ বিধান॥ ১০।
বিদ্যাপতি কবি ইহ রস জানে।
রাজা শিবসিংহ লছিমা পরমাণে॥ ১২।

কাব্যবিশারদের টীকা, যথা—

৩। চক্ষুদ্বয় দূতের কার্য্য করিতে লাগিল।

৪। গোপত — গুপ্ত। হাস্যরসের সঙ্কোচ ও লজ্জার উদ্রেক হইল।

৬। সগর — সকল। মস্তক অবনত করিয়া সকল কথা বলে।

৭। কটিক গৌরব — কটিদেশের গুরুত্ব বা স্থূলত্ব।

৮। চলিবার সময়ে সহচরীর কর অবলম্বন করে বা হাত ধরে।

৯। অবধারলু — অবধারণ বা নির্ণয় করিলাম।

১০। এখন তুমি শুনিয়া বিধান কর। যাহা কর্তব্য বোধ হয় কর।

আমরা এখন পাঠ ও অর্থ বিচারে প্রবৃত্ত হইব।

প্রথমেই বক্তব্য যে, ইহা শ্রীকৃষ্ণের আপ্তদূতীর উক্তি বয়ঃসন্ধির পদ। যৌবনের আগমনে নায়িকার শৈশব দূর হইল— ইহাই দূতীর প্রথম ও প্রধান বক্তব্য। সুতরাং 'ভল ভেল দম্পতি' পাঠ হইতে 'আওল যৌবন' পাঠই সমীচীন মনে হয়। নগেন্দ্রবাবু কথাটাকে উল্টাইয়া লইয়া এবং 'নায়িকার'

ও 'পক্ষে' শব্দ দুইটি উহ্য করিয়া অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু 'দম্পতি' শব্দের দ্বারা 'দম্পতির' (পক্ষে) অর্থ ব্যাকরণ অনুসারে সিদ্ধ হয় না। 'ভল ভেল' ইত্যাদি পাঠের একমাত্র ব্যাকরণসঙ্গত অর্থ— ভাল হইল; দম্পতির 'শৈশব' গেল। 'শৈশব' শব্দের সহিত ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস করিলে 'দম্পতি' শব্দের ষষ্ঠী বিভক্তির লোপ করা যাইতে পারে; তদ্ভিন্ন এরূপ বিভক্তি লোপ করার ও দম্পতির (পক্ষে) অর্থ করার উপায় নাই। গ্রীয়ারসন সাহেব ইহা বুঝিতে পারিয়াই পংক্তিটীর অনুবাদ করিয়াছেন— Happy are the consorts, now that the childhood had fled. পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, নগেন্দ্রবাবু তাঁহার পূর্ববর্তী সুপ্রসিদ্ধ সম্পাদক গ্রীয়ারসনের উক্ত সহজ অর্থ ত্যাগ করিয়া কেন এরূপ অশুদ্ধ ও অসঙ্গত অন্বয় করিতে গেলেন! ইহার উত্তর ইহাই মনে হয় যে, 'চরণ চপলতা লোচন লেল' ইত্যাদি পরবর্তী যৌবনের অনুভাবগুলি স্পষ্টতঃ নায়িকার সম্বন্ধেই প্রযোজ্য বটে। সুতরাং নগেন্দ্রবাবু এখানে দম্পতির শৈশব দূর হইল— এরূপ উক্তি অসংলগ্ন মনে করিয়াই অগত্যা পূর্বোক্তরূপ অর্থ করার প্রয়াস করিয়াছেন। 'আওল যৌবন' পাঠে এরূপ কোন অসঙ্গতি ঘটে না; সুতরাং আমরা মৈথিল তালপত্রের পুথির পাঠ হইতে এখানে বঙ্গীয় পুথির পাঠই প্রামাণিক ও সমীচীন মনে করি।

নগেন্দ্রবাবুর ধৃত 'ভূষণ ভএ' স্থলে গ্রীয়ারসনের পাঠ 'ভূষণ ভয়'। তিনি 'ভয়' শব্দের অনুবাদ করিয়াছেন "fear" অর্থাৎ তাঁহার মতে ভূষণ ভয় ইত্যাদি পংক্তির অর্থ— The fear and bashfulness of the damsel and a new ornament to her beauty. বলা বাহুল্য যে, ক্লিষ্ট দূরান্বয় ব্যতীত এরূপ অর্থ করা যায় না। সুতরাং আমরা নগেন্দ্রবাবুর 'ভএ' (অর্থাৎ 'হইয়া') পাঠ ও অর্থ তদপেক্ষা সঙ্গত মনে করি। লজ্জা বালিকার পক্ষে স্বাভাবিক নহে, যুবতীর পক্ষেই উহা স্বাভাবিক ও সুন্দর। নগেন্দ্রবাবুর ধৃত পাঠ সঙ্গত হইলেও বঙ্গীয় পুথির 'হাস গোপত ভেল উপজল লাজ' এই ধ্বনিপূর্ণ বাক্যটী উৎকৃষ্টতর পাঠ বলিয়া মনে করি।

নগেন্দ্রবাবু "এখন সর্বদা অঞ্চলে হাত দেয়" বাক্যটীর তাৎপর্য খুলিয়া বলেন নাই। বলা উচিত ছিল। কেননা, গ্রীয়ারসন্ সাহেব 'বাজ' স্থলে 'কাজ' পাঠ ধরিয়া ঐ শ্লোকের অনুবাদে একটা হাস্যজনক মারাত্মক ভুল করিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি অনুবাদ করিয়াছেন— He continually layeth

his hand upon the cloth which hideth her bosom and at the action and in the presence of her brides-maids, she hangeth her head in shame.

বলা বাহুল্য যে, নায়ক-নায়িকার মিলনের পূর্বে আপ্তদূতীর উক্তিতে এরূপ অর্থ সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক ও রসবিরুদ্ধ বটে। গ্রীয়ারসন্ ইহাকে সম্ভোগের পদ মনে করিয়াই ঐরূপ অর্থ করিয়াছেন। এই শ্লোকের তাৎপর্য এই যে, 'জ্ঞাত যৌবনা' 'মুগ্ধা' * নায়িকারা স্বভাবতঃ অন্যের নিকটে যৌবন গোপনের চেষ্টা করিয়া থাকেন। বুঝি, বুকের আঁচলখানা একটু সরিয়া গেল—এই ভয়ে তাঁহারা সর্বদা বুকের আঁচলে হাত দিয়া পরীক্ষা করেন। সূক্ষ্মদর্শী কবি স্বভাবোক্তি অলঙ্কারের সাহায্যে এখানে নায়িকার লজ্জাসূচক সেই অঞ্চল স্পর্শ ও সখীর সঙ্গে অবনত মস্তকে সম্ভাষণের সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।

বঙ্গীয় পুথির 'কটিকে গৌরব' ইত্যাদি শ্লোক মৈথিল পুথিতে নাই। কাব্যবিশারদ মহাশয়ের ধৃত পাঠে 'কটিকে' শব্দের 'কে' বিভক্তি মৈথিল ভাষায় অপ্রচলিত বটে। উহাতে 'কটি' শব্দের ষষ্ঠী বিভক্তিতে 'কটিক' রূপই দৃষ্ট হয়। 'কটিক' পাঠ ধরিলে ছন্দোপতন অনিবার্য হইয়া পড়ে। এজন্য ব্রজনন্দনবাবু 'কটিকে' ইত্যাদি পংক্তির 'কটি-গৌরব অব পাওল নিতম্ব' পাঠ কল্পনা করিয়া ছন্দ রক্ষা করিয়াছেন। আমরাও ঐরূপ পাঠই সমীচীন মনে করি। কাব্যবিশারদ মহাশয় বা ব্রজনন্দনবাবু কেহই আলোচ্য শ্লোকটার অপূর্ব অলঙ্কার ও উহার দ্বারা ব্যঞ্জিত বস্তুধ্বনির চমৎকারিত্ব লক্ষ্য করেন নাই; সুতরাং আমরা একটু বিস্তৃতভাবে উহার আলোচনা করিব। স্বভাবতঃ বালিকাদিগের কটি কিঞ্চিৎ স্থূল ও নিতম্ব কৃশ হইয়া থাকে; কিন্তু যৌবনের উদয়ে উহার ব্যতিক্রম ঘটে। তখন বক্ষ ও নিতম্ব স্ফীত হওয়ায় মধ্যবর্তী কটিদেশ কৃশ বলিয়াই প্রতীত হয়। ইহাকেই কবি কটি ও নিতম্বের পরস্পর অবস্থা বিনিময় বলিয়া স্থানান্তরে বর্ণিত করিয়াছেন, যথা—

কটিক গৌরব পাওল নিতম্ব।
ইনকে ক্ষীণ উনহি অবলম্ব॥

('পদকল্পতরু' ১০৬ সং পদ—বিদ্যাপতি)

* জ্ঞাতযৌবনা ও মুগ্ধা নায়িকার লক্ষণ ও উদাহরণ মৎসম্পাদিত 'রসমঞ্জরী' গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

এখানে একের কৃশতা অপরে প্রাপ্ত হইল—স্পষ্টাক্ষরে উক্ত না হইলেও তাৎপর্যার্থ দ্বারা প্রতীত হয় যে, নিতম্বের কৃশতা কটি প্রাপ্ত হইল অর্থাৎ কটি ও নিতম্বের মধ্যে অবস্থার বিনিময় ঘটিল। কবি এখানে অতিশয়োক্তি-মূলক প্রতীয়মান উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের সাহায্যে বুঝাইতে চাহেন যে, নায়িকা নিতম্বের গুরুভারে নিজে চলিতে অক্ষম হওয়ায়ই যেন সখীকে অবলম্বন করিয়া চলেন। সখীকে অবলম্বন করার কারণ স্বতন্ত্র অর্থাৎ নায়িকার একান্ত সখী-প্রীতি হইলেও কবি এখানে নিতম্বের গুরুভারই সেই কারণ বলিয়া বর্ণিত করায় অতিশয়োক্তি অলঙ্কার ঘটিয়াছে; উহাই 'কাব্যলিঙ্গ' অলঙ্কারের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রয়োজন বটে। এই সকল অলঙ্কারের দ্বারা প্রধান বিষয় নায়িকার নিতম্বের গুরুত্বরূপ বস্তু ধ্বনি ব্যঞ্জিত হইয়া আলোচ্য শ্লোকটীকে আলঙ্কারিক-দিগের মতে শ্রেষ্ঠ কবিতার লক্ষণাক্রান্ত করিয়াছেন। অল্প কথায় এতগুলি বিচিত্র অলঙ্কার ও ধ্বনি সৃষ্টি করা বিদ্যাপতির ন্যায় মহাকবির পক্ষেই সম্ভবপর বটে। সুতরাং যদিও মৈথিল পুথিতে এই অপূর্ব শ্লোকটি পরিত্যক্ত হইয়া থাকে কিন্তু বঙ্গীয় পুথির প্রমাণে আমরা এই শ্লোকটীকে বিদ্যাপতির খাঁটি রচনা বলিয়া গ্রহণ না করিয়া পারি না।

মৈথিল পুথির 'হমে অবধারল' ইত্যাদি শ্লোকের 'নাগর করলু আপন অবধান'—এই দ্বিতীয় চরণ দূতীর রসিকতাসূচক উক্তি বটে। নায়কের আত্মরক্ষার প্রয়োজন বুঝাইবার জন্যই দূতী 'ভ"উহ ধনুষ' ইত্যাদি বাক্যের প্রয়োগ করিয়াছেন। উহার একমাত্র সঙ্গত অর্থ— "(নায়িকার) ভ্রূধনু কজ্জলের রেখা (উহার) গুণ (নায়িকা) মারাতে অর্থাৎ কটাক্ষ বাণ প্রহার করাতে (কেবল) বাণের গোড়ার পক্ষযুক্ত অংশ অবশিষ্ট রহিয়াছে; অর্থাৎ বাণ রসজ্ঞ দর্শকের চিত্তে সম্পূর্ণ বিঁধিয়া গিয়াছে। নয়নের পক্ষরূপ বাণের গোড়ার পাখগুলি কেবল অবশিষ্ট আছে। নগেন্দ্রবাবু এখানে বিস্তৃত টীকা লিখিতে যাইয়া সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় 'পোখ' বা 'পুংখ' শব্দের প্রতিপাদ্য কি তাহা বলেন নাই। ইহা ছাড়া তিনি 'মারতি' শব্দের 'মারিবে' ও 'রহত' শব্দের 'রহিবে' রূপ অসিদ্ধ ও অসঙ্গত অর্থ করিয়া সমস্ত বাক্যের অর্থেই গোলযোগ করিয়া ফেলিয়াছেন। 'পুংখ' শব্দের প্রতিপাদ্য যে কি, তাহা বুঝিতে পারিলে তিনি বর্তমানের অর্থ ভবিষ্যৎ বুঝিতেন না। নায়িকার ধনুর তুল্য ভ্রূ, ধনুর গুণের তুল্য নয়নের কাজলরেখা, তীক্ষ্ণ শরের তুল্য কটাক্ষও অন্তঃ-

প্রবিষ্ট; সুতরাং অদৃশ্য কটাক্ষ-শরের গোড়ার পুংখ অর্থাৎ পক্ষ-যুক্ত অংশ-তুল্য নয়নের পক্ষরাজি বর্ণিত করাই দূতীর উদ্দেশ্য বটে। তিনি সুন্দর 'রূপক' ও উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের সাহায্যে উহা বর্ণিত করিয়া, নায়ককে সাবধান করার ছলে পরম উপভোগ্য রসিকতার পরিচয় দিয়াছেন। এখানে ইহা বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, গ্রীয়ারসন সাহেব 'হমে অবধারল' ইত্যাদি শ্লোক এবং 'ভেঁাহ ধনুষি' ইত্যাদি শ্লোক উভয় শ্লোকের অনুবাদেই হাস্যজনক মারাত্মক ভুল করিয়া ফেলিয়াছেন, যথা —

4. Hear, hear, O Krishna, I have determined how I shall fight my fight. Do thou, my love, be careful of thyself.

5. My eye brows shall be my bow, strung with a line of collyrium; and the well-feathered darts which will strike thee, will be (the glances of) my eyes.

গ্রীয়ারসনের সংস্করণে 'মারতি রহত' ইত্যাদি পংক্তির স্থলে পাঠ আছে 'মার নয়ন পর পুংখ অবশেখ।' নগেন্দ্রবাবুর ধৃত পাঠ হইতে এই পাঠ অধিক সঙ্গত; কিন্তু গ্রীয়ারসন মহাশয় পদটা কাহার কোন্ সময়ের উক্তি বুঝিতে না পারিয়া অর্থের ঐরূপ গোলযোগ করিয়া ফেলিয়াছেন। এখানে ইহাও বলা আবশ্যক যে বঙ্গীয় ও মৈথিল পুথির নিজস্ব উভয় পাঠই সুন্দর ও বিদ্যাপতির উৎকৃষ্ট রচনার লক্ষণাক্রান্ত; বোধহয় ভুলে বঙ্গীয় পুথি হইতে একটী এবং মৈথিল পুথি হইতে আর একটী কলি বাদ পড়িয়া গিয়াছে।

নগেন্দ্রবাবু ভণিতাহীন অনেক পদ ও ভূপতি, চম্পতি, কবিশেখর, রায়শেখর প্রভৃতি বিভিন্ন কবির বহু পদ বিদ্যাপতির রচিত বিবেচনায় নিজের সংস্করণে উদ্ধৃত করিয়াছেন; এরূপ অবস্থায় তিনি 'খেলত ন খেলত লোক দেখি লাজ' ইত্যাদি বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত বয়ঃসন্ধির পদটী যে কি জন্য উদ্ধৃত করেন নাই, তাহা বুঝা যায় না। ইহা 'পদকল্পতরু'র ৮০ সংখ্যক বা ১ম শাখার ৪র্থ পল্লবের ১৪ সংখ্যক পদ বটে। ইহা কাব্যবিশারদ মহাশয়ের সংস্করণেও আছে। সুতরাং অনাবশ্যক বোধে এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইল না। কৌতূহলী পাঠক উক্ত গ্রন্থ দেখিবেন।

(২৮ সংখ্যক পদ)

নগেন্দ্রবাবু বয়ঃসন্ধি ২—২৭ সংখ্যক পদের পরেই 'মাধবের অনুরাগ' শীর্ষক ২৮—৫৫ সংখ্যক পদগুলি সন্নিবেশিত করিয়া তারপরে 'এ সখি কি পেখল এক অপরূপ' ইত্যাদি পদ 'রাধার অনুরাগ' শীর্ষকে উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমরা 'বিদ্যাপতি-বিচারে'র প্রথমেই বলিয়াছি যে, নগেন্দ্রবাবু ও তাঁহার পূর্ববর্তী সম্পাদকগণ প্রায় সকলেই এ বিষয়ে ভুল করিয়াছেন। রসশাস্ত্রের সুনির্দিষ্ট ও স্বাভাবিক পর্যায় অনুসারে নায়িকার পূর্বরাগই প্রথমে বর্ণনীয় বটে। উহার পরে নায়কের পূর্বরাগ বর্ণিত করিয়া কবিরা নায়ক কিংবা নায়িকার পক্ষ হইতে আপ্ত অর্থাৎ বিশ্বস্ত দূতীর প্রেরণ এবং সেই দূতীর দ্বারা নায়িকার বয়ঃসন্ধি সুলভ রূপ-বর্ণনার অবতারণা করিয়া থাকেন। সেই স্বাভাবিক ও সুন্দর রসপর্যায়ের ব্যতিক্রম করায়, এই সমস্ত পদগুলির পৌর্বাপর্য বিনষ্ট হইয়া পাঠকের নিতান্ত বৈরস্য-জনক হইয়াছে। সে যাহা হউক, আমরা কাব্যের আরম্ভ শীর্ষক সন্দর্ভে আলোচনা করায়, এখানে উহার পুনরুক্তি না করিয়া, নগেন্দ্রবাবুর উদ্ধৃত 'মাধবের অনুরাগ' শীর্ষক পদাবলীর পাঠ ও অর্থ সম্বন্ধে ক্রমে আলোচনা করিব।

প্রথমেই বক্তব্য এই যে নগেন্দ্রবাবু নায়িকার পূর্বরাগের আগে নায়কের পূর্বরাগ বিষয়ক পদাবলী সন্নিবেশিত করিয়া রসশাস্ত্রের নিয়ম ভঙ্গ করিলেও তাঁহার পক্ষে এই পদগুলিকে 'মাধবের পূর্বরাগ' না বলিয়া 'মাধবের অনুরাগ' নাম দেওয়া সঙ্গত হয় নাই। পূর্বরাগ ও অনুরাগ—এই বিষয় দুইটির মধ্যে গুরুতর পার্থক্য রহিয়াছে। 'পূর্বরাগ' শব্দের দ্বারা নায়ক-নায়িকার সম্মিলনের পূর্ববর্তী প্রেম ও 'অনুরাগ' শব্দদ্বারা তাঁহাদিগের সম্মিলনের পরবর্তী প্রেমই সূচিত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে, প্রেমের এই দুইটি অবস্থায় অনুভব ও আস্বাদনের যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষিত হয়। বস্তুতঃ নায়কনায়িকার পরস্পর রাগোদ্ভবের পরে আপ্তদূতীর সাহায্যে তাহাদিগের সম্মিলন ও সম্ভোগ সংঘটিত হইলে প্রেমের স্বাভাবিক শক্তিদ্বারা যখন উভয়ের হৃদয় একীকৃত হইয়া দুইটী বিভিন্ন দেহে একটী অভিন্ন প্রাণ হইয়া পড়ে এবং প্রণয়িযুগল সর্বদা অনুভূত হইলেও একজন আর একজনের নিকট প্রতি পলে নূতন বলিয়া প্রতীত হয়েন,— সেই 'নিতুই নবীন' প্রেমোচ্ছ্বাসই রসশাস্ত্রে 'অনুরাগ' নামে কথিত হইয়াছে। পূর্বরাগ যে প্রেম কল্পলতিকার সুশোভন ও সুগন্ধপূর্ণ পুষ্পমঞ্জরী,— 'অনুরাগ' উহারই

সুমধুর অমৃতময় পরিপুষ্ট ফল ; সুতরাং কার্য ও কারণরূপে উভয়ে অবিচ্ছেদ্যভাবে পরস্পরসম্বন্ধ হইলেও, উভয়ের অনুভব এবং আস্বাদনের মধ্যে যে প্রভূত পার্থক্য রহিয়াছে, ইহা রসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই বিলক্ষণ বুঝিতে পারিবেন।

নগেন্দ্রবাবুর ২৮ সংখ্যক 'ফূজলি কবরি অবনত আনন' ইত্যাদি পদের সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু বক্তব্য নাই। তবে 'ফূজলি কবরি' ইত্যাদি চরণের 'কবরি' পাঠে ছন্দোপতন ঘটিয়াছে, সুতরাং 'কবরি' স্থলে 'কবরী' শুদ্ধ পাঠ হইবে।

(২৯ সংখ্যক পদ)

নগেন্দ্রবাবুর ২৯ সংখ্যক পদের প্রথম কলিটী এইরূপ উদ্ধৃত হইয়াছে, যথা—

(মাধবের উক্তি)

চিকুর নিকর তম সম
পুন্থ আনন পুনিম সসী।
নঅন পঙ্কজ কে পতিআওব
এক ঠাম রহু বসী॥ ২।

যে জন্যই হউক, নগেন্দ্রবাবু এই পদের ছন্দের মাত্রা নির্দেশ করেন নাই। কেবল উহা নহে, উদ্ধৃত কলিটী যেভাবে মুদ্রিত হইয়াছে, উহা দ্বারা মনে হয় যে, তিনি প্রথম চরণদ্বয়ের মাত্রা বিভাগ ঠিক বুঝিতে পারেন নাই। পদটী বাঙ্গালার লঘুত্রিপদী ছন্দে রচিত বটে। ইহার প্রত্যেক অর্দ্ধ কলিতে ৬+৬+৮=২০ মাত্রা প্রযুক্ত হইয়াছে, সুতরাং প্রথম ও দ্বিতীয় চরণ দ্বারা যে অর্দ্ধ কলি গঠিত হইয়াছে, উহাও ঠিক দ্বিতীয় অর্দ্ধকলির মতই হইবে, যথা—

চিকুর নিকর তম সম পুন্থ
আনন পুনম সসী।

বলা বাহুল্য যে বাঙ্গালার লঘুত্রিপদী ছন্দটী অক্ষরবৃত্ত, উহা মাত্রাবৃত্ত নহে ; সুতরাং এই ছন্দে অক্ষরের লঘু-গুরু ধর্তব্য নহে। এখানে বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয় যে, বিদ্যাপতি প্রায়শঃ মাত্রাবৃত্ত ছন্দে পদ রচনা করিয়া থাকিলেও তাঁহার কতকগুলি পদে ঠিক বাঙ্গালার একাবলী লঘুত্রিপদী দীর্ঘত্রিপদী অক্ষরবৃত্ত ছন্দের ব্যবহার দেখা যায়। এইরূপ পদ নেপালের পুথি ও মৈথিল তালপত্রের পুথিতেও পাওয়া গিয়াছে।

সুতরাং এগুলিকে বাঙ্গালী পুথি লেখকদিগের দ্বারা প্রবর্তিত বিদ্যাপতির ছন্দের বিকৃতি বলিয়া মনে করার কোনই কারণ নাই। ইহা দ্বারা এই প্রয়োজনীয়-তত্বটী জানা যাইতেছে যে. বিদ্যাপতির প্রাচীন মৈথিলী ভাষার সহিত যেমন আধুনিক মৈথিলী হইতে প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার বেশী ঘনিষ্ঠতা ছিল, বিদ্যাপতির কোন কোন পদে অক্ষরের লঘুগুরু মাত্রার প্রতি সম্পূর্ণ বা আংশিক অনাদরের দ্বারাও প্রাচীন মৈথিলী কবিতার ছন্দের সহিত বাঙ্গালা ছন্দের সেইরূপ ঘনিষ্ঠতাই প্রমাণিত হইতেছে। আধুনিক মৈথিলী ভাষার উপর হিন্দী ভাষার অধিক প্রভাব হেতু — বাঙ্গালার সহিত ভাষা ও ছন্দ বিষয়ে উহার অধিক পার্থক্য দেখা যাইতেছে। সুতরাং রীতিমত ভাষাতত্ত্বের আলোচনা না করিয়া, যে সকল আধুনিক পণ্ডিত কেবল আধুনিক হিন্দী ও মৈথিল ভাষার পাণ্ডিত্যের জোরে বিদ্যাপতির পদে ভাষা ও ছন্দের যাথার্থ নির্ণয়ের জন্য প্রয়াস পাইয়াছেন, তাঁহাদিগের চেষ্টা যে অনেক স্থলেই ব্যর্থ হইয়াছে, ইহা মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নহে। বিগত চল্লিশ বৎসর ধরিয়া আমরা বিদ্যাপতির পদাবলীর পুনঃ পুনঃ অধ্যয়ন ও অনুশীলন দ্বারা বুঝিতে পারিয়াছি যে, বিদ্যাপতির প্রাচীন পদাবলীর প্রকৃত পাঠ ও অর্থের নির্ণয়ের জন্য কেবল আধুনিক মৈথিল ও হিন্দী ভাষার জ্ঞানই যথেষ্ট নহে। উহার জন্য সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ প্রভৃতি ভাষারও বিশেষ জ্ঞান ও সর্বোপরি তুলনাত্মক ভাষাতত্ত্বের (Comparative Philology) সাহায্যে গভীরভাবে পুনঃ পুনঃ বিদ্যাপতির পদাবলীর অধ্যয়ন ও আলোচনা প্রয়োজন। পূর্ববর্তী সম্পাদকদিগের উদ্যম বিশেষ প্রশংসনীয় হইলেও নানা প্রতিকূল কারণবশতঃ তাঁহারা বর্ণিত সাধনগুলি সদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই। এজন্যই বিদ্যাপতির পদাবলীর প্রকৃত পাঠ ও অর্থের নির্ণয়ে প্রায় পদে পদেই নানা ভ্রম প্রমাদ দৃষ্ট হইতেছে। বিদ্যাপতির যে পদাবলীর প্রথম ও প্রধান সংরক্ষক বলিয়া বাঙ্গালীরা এক সময়ে অনন্যসাধারণ কীর্তি অর্জন করিয়াছেন, কালধর্মে সেই পদাবলী বিকৃত হইয়া পড়ায় এখনও উহার সংশোধন ও সংস্করণের অসাধারণ গৌরব হইতে আমাদিগের স্বদেশী ভ্রাতৃগণ বঞ্চিত হইবেন না এবং আমাদিগের ভরসাস্থল উচ্চ শিক্ষিত যুবকবৃন্দ এখন হইতে এই কষ্টসাধ্য অথচ যশস্কর ও আনন্দজনক সাহিত্যিক কার্যে সর্বান্তঃকরণে ব্রতী হইবেন,— আমরা ইহাই একান্ত কামনা করি।

(৩০ সংখ্যক পদ)

নগেন্দ্রবাবুর ৩০ সংখ্যক শ্রীকৃষ্ণের উক্তি পদটি মৈথিল তালপত্রের পুথি হইতে গৃহীত হইয়াছে। ঐ পদের ৩য় কলিটী এইরূপ, যথা —

সাঁচ কহঞো মোঞে সাখি অনঙ্গ
চান্দক মণ্ডল যমুনা তরঙ্গ ॥ ৬।

নগেন্দ্রবাবু উহার অর্থ লিখিয়াছেন —

৫—৬। সত্য কহিতেছি আমি, অনঙ্গ সাক্ষী, চন্দ্র মণ্ডলে যমুনা তরঙ্গ (ত্রিবলী) (দেখিলাম)।

এইরূপ অর্থ কোনমতেই সংলগ্ন হইতে পারে না। যদি এখানে কৃষ্ণ-রোমাবলীযুক্ত ত্রিবলীকে যমুনা তরঙ্গ বলা যায়, তাহা হইলে 'চান্দক মণ্ডল' বা চন্দ্রমণ্ডল শব্দদ্বারা এখানে কি বুঝিতে হইবে। নগেন্দ্রবাবু নিরুপায় হইয়াই বোধহয় এখানে 'চন্দ্র মণ্ডল' শব্দের প্রতিপাদ্য কি, তাহা স্পষ্ট লিখেন নাই। ত্রিবলী নায়িকার উদরেই লক্ষিত হইয়া থাকে; সুতরাং ত্রিবলীকে যমুনা তরঙ্গ বলিয়া বর্ণিত করিলে অগত্যা নায়িকার কৃশ উদরকেই চন্দ্রমণ্ডল বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। ইহা যেমন অস্বাভাবিক, তেমনি 'কবি-সময়-বিরুদ্ধ' বটে। সুতরাং নগেন্দ্রবাবুর প্রতিপাদিত এই অর্থ পরিত্যাগ করিয়া 'চান্দক মণ্ডল যমুনা তরঙ্গ' বাক্যের সঙ্গত অর্থ খুঁজিতে হইবে। আমাদের মনে হয় যে, এখানে 'চন্দ্রমণ্ডল' শব্দদ্বারা শ্রীরাধার মুখমণ্ডল ও 'যমুনা তরঙ্গ' শব্দদ্বারা তাঁহার বিলাস বিভ্রম সূচক মন্দ মন্দ ভঙ্গীই সূচিত হইয়াছে। মহাকবি কালিদাস 'মেঘদূতে'র বিরহী যক্ষের মুখে গাহিয়াছেন —

উৎপশ্যামি প্রতনুষু নদী বীচিষু ভ্রু-বিলাসং

অর্থাৎ

ঈষৎ তরঙ্গ ভঙ্গে ভুরু ভঙ্গী করি দরশন

কালিদাসের বর্ণনায় আমরা তরঙ্গিণীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গভঙ্গে নায়িকার বিলাস-বিভ্রম সূচক ভ্রূভঙ্গী দেখিতে পাই; কিন্তু উভয়ের মধ্যে এমন একটা বর্ণের পার্থক্য থাকিয়া যায়, যাহাতে সৌসাদৃশ্যের যথেষ্ট ব্যাঘাত জন্মাইয়া থাকে।

বিদ্যাপতি "যমুনা-তরঙ্গ' বলিয়া বিশেষণ দিয়া সেই বৈষম্যটা সম্পূর্ণ দূর করিয়া দিয়াছেন।

আমাদিগের প্রদর্শিত এই অর্থই যে নির্দোষ ও সমীচীন, গোবিন্দ-দাসের নিম্নোদ্ধৃত পদাংশ দৃষ্টি করিলে সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। গোবিন্দদাস তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ 'যাহাঁ যাহাঁ নিকসয়ে তনু তনু জোতি' ইত্যাদি 'পদকল্পতরু'র ৮৬ সংখ্যক পদে গাহিয়াছেন —

যাহাঁ যাহাঁ ভঙ্গুর ভাঙ্গু বিলোল।
তাহাঁ তাহাঁ উছলই কালিন্দি হিলোল॥

অর্থাৎ যেখানে যেখানে শ্রীরাধার ভঙ্গশীল চঞ্চল ভ্রূযুগলের বিলাস, সেখানে সেখানেই যমুনার তরঙ্গলীলা উচ্ছলিত হয়।

বিদ্যাপতির আলোচ্য পদের ৪র্থ ও ৫ম কলিটী এইরূপ, যথা—

কোমল কনককেআ মুতি পাত।
মসি লএ মদনে লিখল নিজ বাত॥ ৮।
পঢ়হি ন পারিয় আখর পাতি।
হেরইতে পুলকিত হো তনু কাতি॥ ১০।

নগেন্দ্রবাবু উহার অর্থ লিখিয়াছেন—

৭। কনককেআ—কনকীয়া, কনকনির্মিতা। মুতি—মূর্তি। পাত—পত্র। ৮। বাত—কথা। ৭—৮। কোমল স্বর্ণগঠিতা মূর্তিরূপ পত্রে মদন মসি লইয়া (রোমাবলী দ্বারা) আপনার কথা লিখিল। ৯। পাতি—পংক্তি। ১০। পুলকিত—রোমাঞ্চিত। কাতি—কান্তি। ৯—১০। অক্ষর-পংক্তি পড়িতে পারি না, দেখিয়া দেহকান্তি রোমাঞ্চিত হয়।

দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, নগেন্দ্রবাবুর প্রতিপাদিত এই অর্থও আমরা সঙ্গত মনে করি না। সংস্কৃত 'কনক' শব্দের পরে ঈয় প্রত্যয় থাকিলে কনকীয় (স্ত্রীলিঙ্গে—কনকীয়া) পদ সিদ্ধ হইতে পারে; কিন্তু তদ্দ্বারা কনকেআ হইবে কি প্রকারে। সংস্কৃত কনকীয়া অপভ্রংশে ও লিপিকরদিগের দোষে কনকেআ রূপে পরিণত হইলেও হইতে পারে; কিন্তু তাহাতে শব্দের মধ্যে একটা অতিরিক্ত 'ক' আসিবে কোথা হইতে। এই অতিরিক্ত 'ক' অক্ষর যে লিপিকরদিগের প্রমাদ-জনিত নহে, আলোচ্য পংক্তির শুদ্ধ ছন্দ এবং নগেন্দ্রবাবুর ১৮৬ সংখ্যক 'আজ

দেখিলিসি কালি দেখিলিসি' ইত্যাদি পদের "সুন্দরি কনককেআ মুতি গৌরী" বাক্যই উহার অকাট্য প্রমাণ বটে। এই উভয় স্থলেই 'কনককেআ' শব্দের পরিবর্তে 'কনকীয়া' 'কনকেআ' পাঠ কল্পনা করিলে ছন্দোপতন অনিবার্য হইয়া পড়ে। অপভ্রংশ ভাষা দূরে থাকুক খাঁটি সংস্কৃত ভাষাতেও 'কনকীয়া' শব্দের প্রয়োগ বড় দেখা যায় না, তারপরে হিন্দী, মৈথিল, বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষার এরূপ বিশেষণ শব্দে স্ত্রীলিঙ্গসূচক আ বিভক্তির প্রয়োগও নিতান্ত বিরল বটে। সর্বোপরি 'কনকেআ' (কনকীয়া) পাঠে ছন্দোপতন অনিবার্য। এই সকল কারণে আমরা নগেন্দ্রবাবুর পূর্বোক্ত ব্যুৎপত্তি ও অর্থ সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। আমাদিগের মতে 'কনককেআ' একটা শব্দ নহে; 'কনক' ও 'কেআ' (কেয়া)— দুইটি শব্দ। সংস্কৃত 'কেতক' শব্দের অপভ্রংশে 'কেআ' বা 'কেয়া' শব্দ উদ্ভূত হইয়াছে। 'কেয়া' শব্দে কেতকী বা কেয়া ফুলের গুল্ম অথবা উহার পুষ্প বুঝাইয়া থাকে। এখানে পরে 'পাত' বা পত্রের উল্লেখ থাকায় 'কনককেআ' শব্দের দ্বারা স্বর্ণবর্ণ পুষ্পবিশিষ্ট একজাতীয় কেয়াগাছ বুঝিতে হইবে। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি যে, কেতকীবহুল উড়িষ্যা প্রদেশে এক প্রকার কেয়াগাছ হয়, যাহার পত্র ও পুষ্পগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, কিন্তু মঞ্জরীর কোমল গর্ভপত্র ও পুষ্পের বর্ণ পীত হইয়া থাকে। বৈষ্ণব পদাবলীতে এই জাতীয় কেতকীই নামে উল্লিখিত হইয়াছে। বিদ্যাপতির উদ্ধৃত পংক্তিগুলির অর্থ—(নায়িকার যৌবনরাজ্যের অধিপতি) মদন (নায়িকার দেহ-রূপ) কোমল স্বর্ণকেতকীর মূর্তি পত্রে অর্থাৎ উহার নধর গর্ভপত্রের উপরে (রোমাবলী-রূপ) মসী লইয়া অর্থাৎ কালির দ্বারা নিজের কথা (অর্থাৎ মদনের অভীষ্ট জগৎজয়ের গূঢ় মন্ত্র) লিখিয়াছেন। (মদনের সেই জগৎজয় সাধক গূঢ় মন্ত্রের) অক্ষরপংক্তি পড়া যায় না; কিন্তু (সেই মন্ত্রশক্তির অচিন্তনীয় মাহাত্ম্যহেতু) উহা দেখিলেই তনুকান্তি রোমাঞ্চিত হয় অর্থাৎ মদনের মন্ত্রে যে কাজ করিয়াছে, উহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ দর্শনকারীর দেহে সাত্বিকভাবজনিত রোমাঞ্চের উদ্‌গম হইয়া থাকে। 'কোমল কনক কেয়া' ইত্যাদি কলির প্রতীয়মান উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার ও 'পঢ়ই ন পারিয়' ইত্যাদি কলির প্রসিদ্ধ কারণের অভাবেও 'কার্য্যোৎপত্তিরূপ বিভাবনা' অলঙ্কার দ্বারা এখানে শ্রীরাধাই যে বিশ্ববিজয়ী কন্দর্পরাজের মোহনমন্ত্র স্বরূপ এই রূপকধ্বনি ও তদ্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসূচক সাত্বিকভাবের উদ্‌গমরূপ বস্তুধ্বনি ব্যঞ্জিত হইতেছে। নগেন্দ্রবাবু তাঁহার টীকায় প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয়

অনেক শব্দ ও বাক্যের অর্থ লিখিয়াছেন কিন্তু উদ্ধৃত কলিদ্বয়ে যে অপূর্ব অলঙ্কার ও ধ্বনির চমৎকারিত্ব রহিয়াছে, সে সম্বন্ধে নীরব রহিয়াছেন। বিদ্যাপতির ন্যায় মহাকবির কবিতা বুঝিবার জন্য কেবল শব্দার্থের জ্ঞানই যথেষ্ট নহে। তাঁহার প্রায় প্রত্যেক পদে কবিকল্পনার কিরূপ পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে, উহা অন্ততঃ সংক্ষেপে বিবৃত না করিলে সম্পাদকের একটা প্রধান কর্তব্যই অসম্পন্ন থাকিয়া যায়। কোন কোন পাঠক সন্দেহ করিতে পারেন যে, স্বর্ণকেতকীর কোমল পত্র অর্থাৎ গর্ভপত্রের সহিত নায়িকার দেহের তুলনা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে। উত্তরে বক্তব্য এই যে, প্রাচীন সংস্কৃতের কবিগণ হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তী বৈষ্ণব কবিগণ পর্যন্ত নায়ক-নায়িকার দেহের গৌরবর্ণের উপমা দিতে যাইয়া কেতকী-গর্ভপত্রের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। আমরা নিম্নে উহার দুই চারটী উদাহরণ উদ্ধৃত করিলাম।

(১) ম্লপয়তি পরিপাণ্ডু ক্ষামমস্যাঃ শরীরং।
শরদিজ ইব ঘর্ম্মঃ কেতকী—গর্ভ-পত্রম্॥
(ভবভূতির 'উত্তর-রাম-চরিত',)

অর্থাৎ—(বিরহ তাপ) এই সীতার পাণ্ডুবর্ণ কৃশ দেহকে সেইরূপ পীড়িত করিতেছে, যেমন শরৎকালীন রৌদ্র কেতকীর গর্ভপত্রকে পীড়িত করে।

বলা বাহুল্য যে, কান্তির সাদৃশ্য না থাকিলে এখানে ভবভূতি কোনমতেই সীতার দেহের উপমাস্থলে কেতকী গর্ভপত্রের দৃষ্টান্ত দিতে পারিতেন না।

(২) মেঘের বিজুরী নহে রূপের উপাম।
তুলনা নহিল রূপে চম্পকের দাম॥
তুলনা নহিল স্বর্ণ কেতকীর দল।
তুলনা নহিল গোরোচনা নিরমল॥
(বাসুঘোষ—'পদকল্পতরু' ১১৩৭ সং পদ)

(৩) আজানুলম্বিত সুবাহু যুগল
বরণ কাঞ্চন জিনিয়া।
কিয়ে সে কেতকী কনক অম্বুজ
কিয়ে বা চম্পক মণিয়া॥
(বাসুঘোষ—'পদকল্পতরু' ২১৫৩ সংখ্যক পদ।)

(৪) কনক-কেতকি-চম্পা-তড়িত-বরণী।
ইন্দিবর-নিলমণি-জলদ-বসনী॥
(সালবেগ— 'পদকল্পতরু' ২৪৭২ সং পদ।)

(৩২ সংখ্যক পদ)

নগেন্দ্রবাবুর ৩২ সংখ্যক—

সসন পরস খসু অম্বর রে
দেখল ধনি দেহ।
নব জলধর তরে সঞ্চর রে
জনি বীজুরি রেহ॥ ২।

ইত্যাদি পদ গ্রীয়ারসন্ সাহেবের সংগ্রহে নাই; কিন্তু 'মৈথিল-কোকিল বিদ্যাপতি' গ্রন্থে ও বেণীপুরী মহাশয়ের সংস্করণে আছে। সর্বত্রই পাঠ একরূপ। কিন্তু নগেন্দ্রবাবুর টীকায় পদের ছন্দোনির্ণয়ে ও একটী পরবর্তী কলির অর্থনির্ণয়ে মারাত্মক ভুল আছে।

নগেন্দ্রবাবু এই পদের ছন্দের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন— "মাধবীর বরাড়ী ছন্দ। ২০, ২১, ২২ অথবা ২৩ মাত্রা। অর্দ্ধপদের * অবসান ১১, ১২, অথবা ১৩ অক্ষরে।" মাধবীর বরাড়ী নামে কোন ছন্দ নাই। বরাড়ী একটা প্রসিদ্ধ রাগিণী। 'মালব'ও তাহাই বটে। 'মাধবীর বরাড়ী' বোধ হয় 'মালবীয় বরাড়ী' হইবে। সে যাহা হউক, নগেন্দ্রবাবুর মাত্রাবিবরণ ও অক্ষর বিবরণ সম্পূর্ণ ভুল। ছন্দোবিৎ পাঠক লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, এই পদের প্রত্যেক অর্দ্ধ কলিতে —'রে' এই পাদপূরক শব্দ সহ— ১৪+৯=২৩টী মাত্রা আছে; কোথাও কম বা বেশী নাই। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে অক্ষরের সংখ্যা ধর্তব্য নহে; সুতরাং নগেন্দ্রবাবু কেন যে অর্দ্ধপাদের অক্ষর সংখ্যা— তাও আবার ভুল সংখ্যা—দিয়াছেন, বুঝা যায় না। মাত্রাগণনায় ছন্দোজ্ঞান আবশ্যক, কিন্তু অক্ষর গণিতে সকলেই পারেন। পাঠক এই পদের ৮টী অর্দ্ধপাদে যথাক্রমে ১২, ১২, ১১, ১১, ১১, ১২, ১০, ১০টী অক্ষর পাইবেন; সুতরাং অক্ষরবিবরণেও ভুল হইয়াছে। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, মাত্রাছন্দে অক্ষরসংখ্যা ধর্তব্য নহে। অক্ষরসংখ্যা অসমান হইলেও এই পদের প্রত্যেক পাদ বা অর্দ্ধ কলিতে মাত্রার হিসাবে ১৪+৯=২৩ টী মাত্রা ঠিক আছে।

* 'অর্দ্ধপদ' শব্দটা বোধহয় ছাপার ভুল; 'অর্দ্ধপাদ'ই নগেন্দ্রবাবুর বক্তব্য বটে।

এখন একটা মারাত্মক অর্থের ভুল দেখুন। এই পদের তৃতীয় কলি এইরূপ, যথা—

তা পুন অপরূব দেখল রে
কুচ জুগ অরবিন্দ।
বিগসিত নাহি কিছু কারণ রে
সোঝা মুখ চন্দ॥ ৬॥

নগেন্দ্রবাবু অর্থ লিখিয়াছেন,

> সোঝা—সোজা, সম্মুখে। ৫—৬। তাহার পর অপরূপ কুচকমল দেখিলাম, কিছু কারণে সম্মুখে তাহার মুখচন্দ্র বিকসিত হয় নাই (পবনে বস্ত্র স্রস্ত হওয়াতে সুন্দরী অঞ্চলের দ্বারা মুখ ঢাকিয়াছিল)।

মুখচন্দ্র বিকসিত না হওয়ার যে লজ্জারূপ কারণ তজ্জন্য সুন্দরীর বসনাঞ্চল দ্বারা বদন আচ্ছাদনরূপ লজ্জাসূচক কার্যটা নগেন্দ্রবাবু অনুমান করিয়া লইয়াছেন, উহা কি এরূপ দুর্বোধ্য যে কবি স্বয়ং উহা বুঝিতে না পারিয়া নিজের অজ্ঞতাসূচক কিছু কারণে বাক্যের দ্বারা সেই কারণটা অব্যক্ত রাখিয়াছেন। কিংবা কবি সেই দুরূহ কারণটা অব্যক্ত রাখিয়া একটা হেঁয়ালীর সৃষ্টি করিয়া উহার দ্বারা পদের পাঠক ও শ্রোতার বুদ্ধির পরীক্ষা লওয়ার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। যদি উহাই কারণ অনুল্লেখের প্রকৃত উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে এস্থলে নিতান্ত দুঃখের সহিতই বলিতে হইতেছে যে, এই বুদ্ধির পরীক্ষায় নানা ভাষায় সুপণ্ডিত বিদ্যাপতির প্রসিদ্ধ সম্পাদক নগেন্দ্রবাবুও উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। তাহার উদ্ধৃত ব্যাখ্যায় নিম্নলিখিত মারাত্মক অর্থের অসঙ্গতি হইয়া পড়িয়াছে।

১। সংস্কৃত ও ভাষা-কাব্যের প্রত্যেক অভিজ্ঞ কবিই কুচযুগের সহিত পদ্মকলির উপমা দিয়া গিয়াছেন শুধু পদ্মের সহিত উপমা দেন নাই। কেননা পদ্মকলির সহিত তরুণীর কুচযুগের যে সৌসাদৃশ্য—প্রস্ফুটিত পদ্মে তাহা দেখা যায় না। তাই মহাকবি কালিদাস লিখিয়াছেন—

দিনেষু গচ্ছৎসু নিতান্তপীবরং
তদীয় শানীলমুখং স্তনদ্বয়ং।
তিরশ্চকার ভ্রময়াভিলীনয়োঃ
সুজাতয়োঃ পঙ্কজকোশয়োঃ শ্রিয়ং॥

('রঘুবংশ' ৩য় সর্গ)

মহাকবি বিদ্যাপতি এই কবিপ্রসিদ্ধি উত্তমরূপেই জানিতেন, তাই স্থানান্তরে 'কবরী ভয়ে চামার গিরি কন্দর' ইত্যাদি (নগেন্দ্রবাবুর সংস্করণের ১১৮ সংখ্যক) পদের কুচের সহিত কমলের উৎপ্রেক্ষা করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন—"কুচ ভয় কমল কোরক জলে মুহি রহু" এ অবস্থায় এখানে বিদ্যাপতি "কুচ জুগ অরবিন্দ" বলিয়া অলঙ্কারের দোষ ঘটাইবেন কেন ?

২। নগেন্দ্রবাবুর প্রতিপাদিত অর্থে 'সোঝা' বা 'সম্মুখে' শব্দটার কোনই সার্থকতা থাকে না। 'সম্মুখে' বলিলে জিজ্ঞাস্য হয়—কাহার সম্মুখে ? নগেন্দ্রবাবু উহা বুঝিতে না পারিয়া, তাঁহার টীকায় 'সম্মুখে' শব্দটা নিতান্তই অসংলগ্ন-ভাবে বসাইয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ প্রথম দুই পংক্তিতে কুচযুগ রূপ অরবিন্দ বা পদ্ম বর্ণিত হওয়ায় পরবর্তী পংক্তির 'সোঝা' অর্থাৎ সম্মুখে শব্দের অন্বয় উহার সহিতই করা আবশ্যক। সেরূপ করিলে, নগেন্দ্রবাবুর মতে এই বাক্যের অর্থ বুঝিতে হইবে যে, পদ্মের সম্মুখে কোন কারণে সুন্দরীর মুখ চন্দ্র বিকসিত হইল না। সেই কোন কারণটা যদি নগেন্দ্রবাবুর অনুমিত লজ্জাই প্রকৃত কারণ হয়, তাহা হইলে, অর্থ বুঝা যাইবে যে লজ্জায় কুচরূপ পদ্মের সম্মুখে সুন্দরীর মুখচন্দ্র বিকশিত হইল না। এরূপ অর্থের সঙ্গতি কোথায় ?

বস্তুতঃ কিন্তু পূর্বোদ্ধৃত "তা পুন অপরুব" ইত্যাদি অতুলনীয় কলিতে মহাকবি বিদ্যাপতি যে অপূর্ব উদাহরণ দেখাইয়াছেন উহার ত্রিসীমায়ও অলঙ্কার দোষ বা অর্থের অসঙ্গতি আসিতে পারে না। নগেন্দ্রবাবু কলিটার প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিতে না পারিয়া অসদর্থ করিতে যাইয়াই এ সকল অসঙ্গতি ঘটাইয়াছেন। এই অপূর্ব কলির অন্বয় ও অর্থ নিম্নে লিখিত হইল :—

'বিগসিত (বিকসিত) নহি (হয় নাই)' — বাক্যের কর্তৃপদ নগেন্দ্রবাবুর অনুমিত 'মুখচন্দ' নহে, উহার কর্তৃপদ 'কুচজুগ' (যুগ) 'অরবিন্দ'। সম্পূর্ণ বাক্যের অর্থ —তাহাতে আবার অপূর্ব কুচযুগরূপ অরবিন্দ (পদ্ম) দেখিলাম ; (ঐ পদ্ম) কিছুমাত্র বিকশিত হয় নাই ; অর্থাৎ সম্পূর্ণ- কলির আকারেই রহিয়াছে। (ধ্বনিগম্য অর্থ— চিরকালই উহা কলির আকারে এবং সেজন্যই সাধারণ পদ্মকলি অপেক্ষা উহার শ্রেষ্ঠতা অর্থাৎ 'অপূর্বতা')। (কি প্রকারে ইহা সম্ভব হইতে পারে,— কবি তাহা অব্যক্ত রাখিয়া, তৃতীয় ও চতুর্থ পংক্তিতে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন) কারণ সম্মুখে — (অর্থাৎ কুচপদ্মের সম্মুখে) নায়িকার

মুখচন্দ্র। চন্দ্রের কিরণে পদ্ম বিকসিত হয় না— মুদ্রিত হইয়া কলির আকারে থাকে, ইহা সর্বজনবিদিত বটে; সুতরাং এখানেও সেজন্যই মুখচন্দ্রের সম্মুখে কুচপদ্ম বিকসিত হইতে পারে না, অর্থাৎ কলির আকারেই আছে (ধ্বনিগম্য অর্থ চিরযৌবনা নায়িকার কুচপদ্ম চিরকাল কলির আকারেই থাকিবে এবং সেইজন্যই পার্থিব কমলসমূহ হইতে উহার চিরন্তন অপূর্বতা)। এখানে বলা আবশ্যক যে, 'মৈথিল-কোকিল-বিদ্যাপতি'র সম্পাদকের ব্যাখ্যা ঠিক হইয়াছে, কিন্তু বেণীপুরী মহাশয় নগেন্দ্রবাবুর ভুলেরই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন।

সহৃদয় পাঠক ভাবিয়া দেখুন, এইরূপ অন্বয় ও অর্থ করিলে, উহাতে পূর্বকথিত অসঙ্গতির অশিক্ষা সম্পূর্ণ বিদূরিত হইয়া বাক্যের অর্থের কিরূপ অপূর্ব চমৎকারিত্ব ঘটিয়া থাকে। রসগ্রাহিতাপূর্ণ টীকায় কাব্যের চমৎকারিত্ব যেরূপ খুলিয়া থাকে, দুর্ব্যাখ্যা দ্বারা উহার যারপর নাই লাঞ্ছনাও ঘটিতে পারে— ইহা তাহার একটা উদাহরণ বটে। আমরা নগেন্দ্রবাবুর বিদ্যাবুদ্ধির নিন্দা করিতেছি না। বিদ্যাপতি পদাবলীর সম্পাদন করিতে যাইয়া তিনি যে মোটের উপর পূর্ববর্তী সম্পাদকদিগের অপেক্ষা অধিক অধ্যবসায় গবেষণা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন, ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। তথাপি বিদ্যাপতির কবিতার ভাষা ও ভাবের দুরূহতার জন্য সে সম্বন্ধে যে আরও অনেক গবেষণা ও আলোচনা একান্ত প্রয়োজন রহিয়াছে, ইহা বুঝাইবার জন্যই আমাদিগকে এইরূপ অপ্রিয় সত্যের প্রচার করিতে হইয়াছে। এভাবে আলোচনা করিলে 'বিদ্যাপতি-বিচার' কত বৎসরে শেষ হইবে বলা যায় না। অথচ আরও সংক্ষেপে করিতে গেলে নীরস বিচারাত্মক প্রবন্ধ আরও নীরস হইয়া পাঠকের অধিক অপ্রীতিকর হইতে পারে— সে আশঙ্কাও না আছে এমন নহে। অতএব সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য এই ত্রিলাপ সঙ্কটে অনিচ্ছায় প্রবিষ্ট এই কৃপার্হ লেখকের প্রতি কৃপা করিয়াই হউক, কিংবা বৈষ্ণব পদকর্তাদিগের গুরুতুল্য মহাকবি বিদ্যাপতির প্রতি সমুচিত সম্মান প্রদর্শনের জন্যই হউক, আশা করি সহৃদয় পাঠকগণ প্রবন্ধটি ধৈর্য ধরিয়া মনোযোগপূর্বক পাঠ করিবেন।

(৩৩ সংখ্যক পদ)

নগেন্দ্রবাবুর ৩৩ সংখ্যক 'জাইতে মিললি কলাবতি রামা' ইত্যাদি ভণিতাহীন পদটি 'কীর্তনানন্দ' পুথি হইতে গৃহীত হইয়াছে। নগেন্দ্রবাবুর সংস্করণে এই পদের ২য় কলিটি এইরূপ, যথা—

ধইরজে বুঝল চাতুরি নারী।
অনুভব কএ গেল কুটিল নিহারী॥

নগেন্দ্রবাবু 'অনুভব কএ' ইত্যাদি পংক্তির টীকা করিয়াছেন— 'কুটিল দৃষ্টিপাত করিয়া আমাকে প্রেমবিকার অনুভব করাইয়া গেল।'

এই ভণিতাহীন পদে মাত্র তিনটি কলি আছে। কলিগুলির ভাষা কিংবা ভাবে এরূপ কোন বিশেষত্ব নাই, যাহাতে এই পদটাকে বিদ্যাপতির নিঃসন্দিগ্ধ রচনা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। পক্ষান্তরে ইহা যে বিদ্যাপতির রচিত একটা অসম্পূর্ণ পদ না হইতে পারে, এমনও কিছু দেখা যায় না। সুতরাং আমরা পদের কৃতিত্ব সম্বন্ধে কোন কথা না বলিয়া শুধু উদ্ধৃত কলির পাঠ ও অর্থের অসঙ্গতির সম্বন্ধেই দুই চারিটি কথা বলিব।

বহরমপুর হইতে শ্রীযুক্ত বনোয়ারীলাল গোস্বামী মহাশয়ের দ্বারা প্রকাশিত 'কীর্তনানন্দ' গ্রন্থে 'অনুভব কএ গেল' ইত্যাদি পংক্তির পাঠ আছে—

অনুভৈ কৈ গেয় কুটিল নিহারি।

নগেন্দ্রবাবুর অবলম্বিত 'কীর্তনানন্দ' পুথিখানিই গোস্বামী মহাশয়ের মুদ্রিত গ্রন্থেরও একমাত্র আদর্শ বটে। এ অবস্থায় একই পুথি হইতে দুইজনে দুই রকম পাঠ কিরূপে গ্রহণ করিলেন, তাহা চিন্তনীয় বটে। আমাদিগের বিশ্বাস যে, নগেন্দ্রবাবু তাঁহার স্বাভাবিক সংশোধন প্রবণতাহেতু এখানেও 'কীর্তনানন্দ' পুথির মূল পাঠ উক্তরূপে পরিবর্তিত করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। যাহা হউক, উহার প্রকৃত পাঠ ও অর্থ কি হইবে বিচার করা যাউক। 'অনুভব' শব্দের 'ব' অক্ষর অন্ত্যস্থ 'ব' বলিয়া উহার মৈথিল উচ্চারণ অনেকটা 'ও' অক্ষরের ন্যায়। সুতরাং 'অনুভব' শব্দটাকে পুথির লেখকগণ 'অনুভও' 'অনুভৌ' কিংবা ভুলে 'অনুভৈ' লিখা বিচিত্র নহে। 'কৈ' ও 'কএ' শব্দ দুইটির মধ্যেও বিশেষ পার্থক্য নাই। পুথির 'গেয়' শব্দটা হিন্দী ও মৈথিল 'গেও' শব্দেরই অশুদ্ধ রূপান্তর বটে। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, অনুভব কএ গেল' বাক্যের অর্থ 'অনুভব করিয়া গেল' ব্যতীত 'অনুভব করাইয়া গেল' হইতে পারে কি? সংস্কৃত 'কৃত্বা' শব্দের অপভ্রংশে 'করিঅ' 'করি' 'কই' 'কৈ' ইত্যাদি রূপগুলি উদ্ভূত হইয়াছে। উহা হইতে 'করিয়া' অর্থ ব্যতীত 'করাইয়া' অর্থ পাওয়া যাইবে কি প্রকারে? সংস্কৃত যেমন ক্বচিৎ কোথাও 'ণিজন্ত' অর্থ অন্তর্ভূত বা উহ্য থাকে, হিন্দী, মৈথিল বা বাংলা ভাষায় সেরূপ দেখা যায় না। সুতরাং নগেন্দ্রবাবু কষ্ট করিয়া 'আমাকে প্রেমবিকার' এই

কর্মকারকের পদ দুইটি উহ্য করিয়া ও 'কএ' শব্দের অসিদ্ধ ও অপ্রচলিত 'করাইয়া' অর্থ গ্রহণ করিয়া যে অর্থ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, উহা সঙ্গত হয় নাই। আমাদের বিবেচনায় উদ্ধৃত পংক্তিদ্বয়ের প্রকৃত পাঠ হইবে —

ধৈরজে বুঝল চাতুরী নারি।
অনুভও কৈ গেও কুটিল নিহারী॥

অর্থাৎ— (নায়িকার) ধৈর্য অর্থাৎ চপলতার অভাব হইতে বুঝিলাম যে সে চতুরা নায়িকা বটে। (অচতুরা নায়িকারা নানারূপ চপলতার কার্য দ্বারা চরিত্রের লঘুতা প্রকটিত করিয়া গুণগ্রাহী নায়কদিগের নিকট বস্তুতঃ প্রেমের অযোগ্যা বলিয়াই প্রতিভাত হইয়া থাকে। চপলতা প্রকাশ করা হইবে না, অথচ মনের অনুরাগ প্রকাশ করিতে হইবে,—নচেৎ মনের ভাব মনে চাপিয়া রাখিয়া গেলে নায়িকার অরসজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতাই প্রকাশ পায়। এরূপ স্থলে চতুরা নায়িকারা তাহাদের স্বাভাবিক কুটিল কটাক্ষ ও অন্যান্য হাবভাব দ্বারাই অনুরাগ প্রকাশ করিয়া থাকে। তাই কবি বলিতেছেন:) নায়িকার কুটিল অর্থাৎ বক্রদৃষ্টি তাহার অনুভব অর্থাৎ মানসিক অনুরাগ কহিয়া গেল অর্থাৎ প্রকাশ করিল।

সংস্কৃত 'কথয়িত্বা' শব্দের অপভ্রংশে 'কহইঅ' 'কহিঅ' 'কহি' 'কই' 'কৈ' ইত্যাদি পদ উদ্ভূত হইয়াছে, সুতরাং 'কৈ' শব্দের 'কহিয়া' অর্থ গ্রহণ করিয়া এরূপ অনায়াসেই করা যাইতে পারে। নগেন্দ্রবাবু 'ধইরজে বুঝল' ইত্যাদি বিশেষ প্রয়োজনীয় ও অর্থপূর্ণ পংক্তিটীর কোন অর্থ লিখেন নাই। বলা বাহুল্য যে, ঐ পংক্তির উক্ত একমাত্র অর্থের সহিত নগেন্দ্রবাবুর ব্যাখ্যাত 'আমাকে প্রেম-বিকার অনুভব করাইয়া গেল'— অর্থের সহিত কোন যোগসূত্র পাওয়া যায় না; এবং একই কলির দুইটি পংক্তির অর্থ পরস্পর বিরুদ্ধ না হইলেও অসংলগ্ন বিধায় তাৎপর্যশূন্য হইয়া পড়ে। আমরা যেরূপ অর্থ করিতেছি, তাহাতে শব্দার্থের বা তাৎপর্যের কোন অসংলগ্ন বা অসঙ্গতি দেখা যায় না।

বিদ্যাপতির পদে কোন কোন স্থলে 'গেল' শব্দের অর্থে 'গেও' প্রয়োগ দৃষ্ট হইয়া থাকে। কাব্যবিশারদ মহাশয়ের সংস্করণের 'অলখিতে হামে হেরি' ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগের (১৪) সংখ্যক পদে আছে—

অরি লুকায়লি আধ উদাস;
কুচকুম্ভ কহি গেও আপন কি আশ॥

এখানেও নগেন্দ্রবাবু 'গেও' শব্দের পরিবর্তে 'গেল' পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। আধুনিক মৈথিল ভাষায় 'গেল' অর্থে 'গেও' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় না বলিয়াই নগেন্দ্রবাবু পাঠ পরিবর্তন করিয়াছেন কি? বিদ্যাপতির প্রায় সাড়ে পাঁচ শত বৎসরের প্রাচীন মৈথিল ভাষায় যে 'গেল' অর্থে 'গেও' শব্দের ব্যবহার ছিল না, এরূপ মনে করার কি কারণ আছে? সংস্কৃতের 'ক্ত' প্রত্যয়ান্ত 'গত' শব্দের অপভ্রংশে 'গঅ' 'গও' ব্রজভাষায় 'গেও' (আধুনিক হিন্দীর 'গয়া') ইত্যাদি রূপগুলি উদ্ভূত হইয়াছে; 'গেল' অপেক্ষা 'গেও' রূপটাই আমাদিগের নিকট অধিক মৌলিক ও প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। সুতরাং আধুনিক মৈথিল প্রয়োগের আদর্শ দেখিয়া প্রাচীন প্রয়োগগুলিকে অশুদ্ধ বিবেচনায় এভাবে পরিবর্তন করিলে ভাষাতত্ত্বের আলোচনার সুগম পথকেও যে অগম্য বা দুর্গম করিয়া তোলা হইবে, প্রাচীন সাহিত্যের সম্পাদকদিগের এই কথাটা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা আবশ্যক।

নগেন্দ্রবাবু অসঙ্গতরূপে পুথির প্রাচীন পাঠ বদ্‌লাইতে যাইয়া ভাষা তত্ত্বালোচকদিগের পথ কণ্টকাকীর্ণ করিয়াছেন, কিন্তু অপ্রণিধানে পুথিলেখকদিগের অনেক সুস্পষ্ট ভুলও সংশোধন ব্যতীত গ্রহণ করিয়া সংশোধকের কর্তব্যে ত্রুটী প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার 'ধইরজে বুঝল চাতুরি নারি' পংক্তির 'বুঝল' শব্দটা লিপিকরদিগের ভুল। প্রকৃত পাঠ হইবে 'বূঝল'। 'বূঝল' পাঠ লইয়া কোন ছন্দোবিৎ শত চেষ্টায়ও ঐ পংক্তির চৌপাই ছন্দের— ৪ + ৪ + ৪ + ৪ = ১৬ মাত্রা মিলাইতে পারিবেন না। বিদ্যাপতির বঙ্গীয় সম্পাদকগণের সংস্করণে এরূপ ছন্দের মাত্রার ভুল অনেক আছে; কিন্তু নগেন্দ্রবাবু এ বিষয়ে খুব সতর্ক এবং অধিকন্তু তিনি মৈথিল পণ্ডিতদিগেরও যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার সংশোধনে এরূপ ভুল থাকা অসঙ্গত বলিয়াই আমরা এইকথা বলিলাম। কেননা, তিনি বিদ্যাপতির পদাবলীর শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ বলিয়া তাঁহার অপ্রণিধান জনিত ভুলগুলিও পরবর্তী সম্পাদকদিগের দ্বারা অবিচারে গৃহীত হইবার আশঙ্কা আছে।

(৩৪ সংখ্যক পদ)

নগেন্দ্রবাবু মৈথিল 'রাগতরঙ্গিণী' পুথি হইতে এই পদের যে একটি রূপান্তর উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহার প্রথম কলিটি এইরূপ, যথা —

আনন লোলএ বচন বোলএ হসি।
অমিঅ বরিস জনি সরদ পুনিম সসী ।

কাব্যবিশারদ মহাশয়ের সংস্করণে এই পদের যে বঙ্গীয় রূপান্তরটী উদ্ধৃত হইয়াছে, উহাতে এই কলিটির নিম্নরূপ পাঠ আছে, যথা —

নন্থুঞা বদনী ধনী বচন কহসি হসি।
অমিয়া বরিখে জনু শরদ পুনিম শশী ॥

অন্যান্য কলিতেও এরূপ পাঠান্তর আরও পাওয়া যায়; কিন্তু এ সকল পাঠান্তর বিশেষ প্রয়োজনীয় নহে বলিয়া আমরা এখানে সেগুলির সম্বন্ধে কোন আলোচনা করিব না। পুথির 'বচন কহসি হসি' বাক্য হইতে বুঝা যায় যে, এ কলিটি শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি। কিন্তু পরবর্তী কলিগুলিতে দেখা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ আপ্তদূতীর নিকট পথে গমনশীলা শ্রীরাধার রূপ বর্ণন করিতেছেন; সুতরাং 'কহসি' (বলিতেছ) পাঠ স্পষ্টতঃ অসঙ্গত প্রতীত হয়। বোধহয় 'কহই' (বলিতেছে) প্রকৃত পাঠ ছিল; কিন্তু 'হসি' শব্দের সহিত অনুপ্রাস মিলাইবার উদ্দেশ্যে অজ্ঞলিপিকরগণ কর্তৃক অসংলগ্ন কিন্তু অনুপ্রাসযুক্ত শ্রুতিমধুর 'কহসি হসি' পাঠ কল্পিত হইয়াছে। সে যাহা হউক, কাব্যবিশারদ মহাশয় প্রথম পংক্তির টীকায় লিখিয়াছেন—"নন্থুঞা বদনী—ননী মুখী। 'নন্থুঞা' এই শব্দের নন্থুয়া প্রভৃতি বিবিধ আকার দৃষ্ট হয়। ইহার অর্থ নবনীত বা ননী। হসি—হাসি, হাসিয়া। কহসি—কহিতেছ, এখানে কহিতেছে।" বস্তুতঃ এখানে কহসি শব্দের কহিতেছ অর্থ অসঙ্গত বলিয়াই কাব্যবিশারদ মহাশয় উহার কহিতেছে অর্থ কল্পনা করিয়াছেন, কিন্তু 'কহসি' শব্দের ঐরূপ অর্থ মৈথিল ব্যাকরণ কিংবা প্রয়োগদ্বারা সমর্থিত হয় না। সুতরাং অগত্যা শ্রুতিমধুর অনুপ্রাসের আশা পরিত্যাগ করিয়াই 'কহসি' স্থলে 'কহই' পাঠ গ্রহণ করা আবশ্যক। ইহা ব্যতীত কাব্যবিশারদ মহাশয় 'নন্থুঞা' শব্দের যে 'নবনীত' বা 'ননী' অর্থ লিখিয়াছেন, উহাও যথার্থ নহে। সংস্কৃত 'নবনীত' শব্দের অপভ্রংশে 'ননীয়আ' 'ননী'রূপ হইতে পারে, কিন্তু উহা হইতে 'নন্থুঞা' বা 'নন্থুআ' হইতে পারে কি? হইতে পারিলেও 'ননীমুখী' বিশেষণটা একটু অদ্ভুত বলিয়া মনে হয় না কি? সুমধুরভাষিনী নায়িকার বাক্য মধু ও অমৃতের সহিত উপমিত হইয়া থাকে; কিন্তু তা বলিয়া মধু বা অমৃতের সহিত মুখের উপমা দেওয়া যায় না। সুতরাং ননীর সহিত মুখের উপমা কিরূপে সঙ্গত হইবে? বস্তুতঃ মৈথিল বা হিন্দী ভাষায় 'নবনীত' অর্থে

'ননী' 'ননীআ' বা 'নন্নুআ' শব্দের ব্যবহার দেখা যায় না। সার গ্রীয়ারসন মহোদয়ের মৈথিল শব্দকোষে 'নন্নুঅ' ও 'নন্নুআঁ' শব্দের অর্থ "a boy, a child, young" লিখিত হইয়াছে। আমরা স্থানান্তরে বিদ্যাপতির পদেও 'নন্নুয়া' শব্দের প্রয়োগ পাইয়াছি, যথা—

নন্নুয়া নয়নি নলিনি জনি অনুপম
বঙ্ক নিহারই থোরা।
(নগেন্দ্রবাবুর ৫৩ সং পদ)

নগেন্দ্রবাবু এখানে 'নন্নুয়া' শব্দের অর্থ "সুন্দর" লিখিয়াছেন। বস্তুতঃ ইহার অর্থ হইতেই কোমল বা সুন্দর অর্থ হইয়াছে।

এই 'নন্নুঞা' শব্দের পরিবর্তে কোন স্থলে 'নন্নুমি' রূপান্তরও দৃষ্ট হয়, যথা—

অল্পে কাজরে নয়ন আঁজল
নন্নুমি দেখিয়া আঁখি।
(নগেন্দ্রবাবুর ৫৪ সং পদ)

নগেন্দ্রবাবু এখানে 'নন্নুমি' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—"কোমল, সুন্দর।"

উদ্ধৃত প্রয়োগগুলির দ্বারা 'নন্নুঞা বদনী' শব্দের কোমল বদনা অল্পই সমর্থিত হইয়া থাকে। সুতরাং আমরা কোন প্রকারেই কাব্যবিশারদ মহাশয়ের টীকার সমর্থন করিতে পারিতেছি না। এখানে প্রসঙ্গক্রমে ইহাও বলা আবশ্যক যে, নগেন্দ্রবাবুর ধৃত 'রাগতরঙ্গিনী' পুথির "আনন লোলএ বচন বোলহ হসি" পাঠটিও আমাদিগের বিবেচনায় শুদ্ধ ও সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। নগেন্দ্রবাবু ঐ পাঠ গ্রহণ করিয়া উহার অর্থ লিখিয়াছেন "লোলএ—আন্দোলিত হয়। ১-২। মুখ নাড়িয়া হাসিয়া কথা কয়।" বস্তুতঃ 'নন্নুঞা বদনী ধনি' স্থলে 'আনন লোলএ' পাঠ গ্রহণ করিলে উহার ঠিক অর্থ হইবে—মুখ নড়ে, হাসিয়া—কথা কয়। অর্থাৎ হাসিয়া কথা বলিতে মুখ নড়ে। এরূপ অর্থের বিশেষ সার্থকতা দেখা যায় না, 'অমিয় বরিস জনি সরদ পুনিম সসি'—এই উপমার সহিত এখানে মুখের চাঞ্চল্যও খাপ খায় না। সুতরাং নগেন্দ্রবাবু বঙ্গীয় পুথির পাঠ গ্রহণ করিয়া ভাল করেন নাই,—ইহা সত্যের অনুরোধে আমরা না বলিয়া

পারি না। মৈথিল পুথির পাঠ যে সর্বত্র শুদ্ধ নহে, ইহা তাহার অন্যতম দৃষ্টান্ত বটে।

(৩৫ সংখ্যক পদ)

নগেন্দ্রবাবুর ৩৫ সংখ্যক পদটি 'কীর্তনানন্দ' পুথি হইতে গৃহীত হইয়াছে। আমরা ভণিতাহীন এই সম্পূর্ণ পদটি বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া নগেন্দ্রবাবুর টীকাসহ এখানে উদ্ধৃত করিব ঃ

(মাধবের উক্তি)

অপরুব পেখল সোই।
কনক লতাঞে উয়ল কিয়ে হিমকর
ঐসন লাগল মোই॥ ২।
কুটল কেশ চঞ্চল অতি লোচন
নাসা আঁতর ভীন।
রাগ অধর দশন মণি ভেটল
দুহু কুচ দুহু কঠিন॥ ৪।
ত্রিবলিক মাঝে তনু নিবি বান্ধল
নাভি সরোবর গোই।
ভারি জঘন সম্বল রহু দুবরি
পরদুখে দুখি নই কোই॥ ৬॥

১। সোই— তাহাকে। ৩। আঁতর— অন্তর, দূর। ভান— ভিন্ন। ৪। লোহিত অধর দশন মণির সহিত মিলিত। ৫। গোই— গোপন করিয়া। ৬। তন্বীর গুরুভার যখন সম্বল রহিল, পরদুঃখে কেহ দুঃখিত হয় না।

নগেন্দ্রবাবুর এই টীকাদ্বারা পদের তাৎপর্য বোধগম্য হইল কি? নগেন্দ্রবাবু অনেক অনাবশ্যক স্থলেও বিস্তৃত টীকা সংযোজিত করিয়াছেন; কিন্তু দুরূহ বলিয়াই বোধহয় এখানে তিনি পদের তাৎপর্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব রহিয়াছেন এবং কোন কোন শব্দের অর্থও ভুল বুঝিয়াছেন। বস্তুতঃ এই পদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় কলির তাৎপর্য খুব দুরূহ,—উহা না বুঝিলে অন্তিম চরণ-দ্বয়ের তাৎপর্য বুঝা যাইবে না। আমরা যতটুকু বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে ২য় ও ৩য় কলির অর্থ এইরূপ, যথা—(নায়িকার) কেশ কুটিল

(এক অর্থে কুঞ্চিত, অন্য অর্থে কুটিল স্বভাব); তাঁহার লোচন অতিশয় চঞ্চল (এক অর্থে অস্থির গতি, অন্য অর্থে চঞ্চল-স্বভাব) তাঁহার নাসিকা অন্তরে (এক অর্থে মধ্যে ভীন অর্থাৎ ভিন্ন কিনা ছিদ্র যুক্ত; অন্য অর্থে হৃদয়ে ভিন্ন ভাবধারী), সেই প্রকার রাগী * (এক অর্থে রক্তিমাযুক্ত, অন্য অর্থে—অনুরাগযুক্ত) অধর দশনরূপ মণিসমূহের সহিত সম্মিলিত হইল অর্থাৎ দশন-রাজির সহিত অধরের স্বাভাবিক আসক্তি থাকায় অধর দশনরাজির সম্মিলন সুখে মত্ত হইয়া রহিল। (নায়িকার) দুইটী কুচ—দুইটীই কঠিন (ধ্বনি-গম্য অর্থ—কঠিনচিত্ত লোকে পরের দুঃখ বুঝে না; সুতরাং নায়িকার কঠিন কুচদ্বয় তাঁহার দুঃখে কেন সাহায্য করিবে?)। তৃতীয় কলির সম্মিলিত তাৎপর্য এই যে, নায়িকার কেশ, লোচন, নাসিকা, অধর, দশন ও কুচযুগ বর্ণিত কুটিলতা, চঞ্চলতা প্রভৃতি স্বভাবদোষ (রূপবর্ণনার হিসাবে কিন্তু অসাধারণ গুণ) বশতঃ সুকুমারী অথচ বিশাল-নিতম্বা নায়িকার গমনের কোন প্রকার সাহায্য করিল না। (নায়িকার বাকি অঙ্গগুলির মধ্যে) মধ্যদেশ অর্থাৎ কটি (স্বভাবতঃ ক্ষীণ এবং 'ক্ষীণা জনা নিষ্করুণা ভবন্তি' এই নীতিবাক্য অনুসারে) (রসিক দর্শকের পরমানন্দজনক) নাভি সরোবরকে গোপন করিয়া, ত্রিবলীকে ও নীবি অর্থাৎ কটির বস্ত্রগ্রন্থিকে বাঁধিয়া রাখিল; ('ত্রিবলি' ও 'নীবি' শব্দদ্বয়ের শ্লিষ্ট অর্থ ধরিয়া ধ্বনিগম্য অন্য অর্থ এই যে, নায়িকার কটি নিজে সঙ্কীর্ণ বলিয়া অন্যের উদারতা সহ্য করিতে পারে না; তাই সে দাতৃশ্রেষ্ঠ বলিরাজকে ত্রিবলিচ্ছলে তিন স্থানে পুঁজি ‡ বাঁধিয়াছে। অর্থাৎ কটি দাতৃশ্রেষ্ঠ বলিকে আয়ত্ত করিয়া 'পরের ধনে পোদ্দারী' করিতে চাহে। ফলিতার্থে সঙ্কীর্ণ কটির দ্বারা নায়িকার সাহায্যের কোন প্রত্যাশা নাই; সে নিজেরই স্বার্থসিদ্ধির জন্যে বর্ণিতরূপ স্বকার্যে ব্যস্ত; এমনকি, সে দর্শকগণকে নাভি-সরোবরের শোভা দর্শনদ্বারা একটু আনন্দলাভ করিতে দিতেও অনিচ্ছুক, তাই ঢাকিয়া রাখিয়াছে)। দুবরি অর্থাৎ দুর্বলা কি না সুকুমারী নায়িকার ভারী (একঅর্থে গুরুভারবিশিষ্ট, অন্য অর্থে ভার-বহনশীল অর্থাৎ সহিষ্ণু) জঘন শুধু সম্বল রহিল অর্থাৎ সে নায়িকার দুঃসময়ে তাহাকে সাহায্য দানে পরাংমুখ হইল না। (ধ্বনিগম্য অর্থ—ধৈর্যশীল সহিষ্ণু মহান্ ব্যক্তিই পরের ক্লেশের

* 'রাগ' পাঠ স্পষ্টতঃ ছন্দোদুষ্ট, প্রকৃত পাঠ 'রাগী' হইবে।

‡ 'নীবি' শব্দে বণিকদিগের মূলধন বা পুঁজিও বুঝাইয়া থাকে।

অংশ স্বীকার করিয়া থাকেন) তদ্ব্যতীত কেহই পরের দুঃখে দুঃখিত হয় না। নায়িকার জঘন নিজের মহত্ত্ব গুণ হেতু নিজে চলিতে ক্লেশ অনুভব করা সত্ত্বেও নায়িকার গমনে যথাসাধ্য সাহায্য দান করিল। অর্থাৎ নায়িকা তাঁহার সুবিশাল জঘনের সাহায্যে মন্থর গতিতে গমন করিতে লাগিলেন। ('জঘন' শব্দে সাধারণতঃ নিতম্বের সম্মুখ ভাগই বুঝা যায়; কিন্তু সংস্কৃত কাব্যে নিতম্ব-অর্থেও উহার প্রয়োগ বিরল নহে। এখানে নিতম্ব ও উহার সম্মুখ ভাগ উভয়ই বুঝিতে হইবে)।

এই পদের ভণিতা পাওয়া যায় নাই; কিন্তু ক্ষুদ্র পদটীতে কবি যেরূপ কবিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, উহা সর্বদা বিদ্যাপতির ন্যায় মহাকবির পক্ষেই সম্ভবপর বটে; সুতরাং ভণিতা না থাকিলেও আমরা ইহা বিদ্যাপতির রচিত বলিয়াই অনুমান করি। শব্দগুলির শ্লিষ্ট অর্থ এবং সম্পূর্ণ বাক্যগুলির তাৎপর্য বুঝিতে না পারিয়াই নগেন্দ্রবাবু কেবল কয়েকটী শব্দের যথাশ্রুত তাহাতেও আবার ভুল অর্থ লিখিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন।

(৩৬ সংখ্যক পদ)

নগেন্দ্রবাবুর ৩৬ সংখ্যক "সজনি অপরূপ পেখল রাম" ইত্যাদি পদ অতি প্রসিদ্ধ। 'পদকল্পতরু' গ্রন্থেও এই পদটী উদ্ধৃত হইয়াছে। নগেন্দ্রবাবু স্পষ্টতই ইহা 'পদকল্পতরু' হইতে গ্রহণ করিয়াও অযথোচিতরূপে স্থানে স্থানে পদের পাঠ পরিবর্তন করিয়াছেন; কিন্তু সর্বত্র ছন্দ ও অর্থ বজায় রাখিতে পারেন নাই। আমরা তাঁহার সংস্করণ হইতে ছন্দোদোষের দৃষ্টান্ত দিতেছি:—

(ক) "সজনি অপরূপ পেখল রামা।" 'পদকল্পতরু'তে 'সজনি' সংবোধন নাই। 'সজনি' পাঠে ছন্দোপতন অনিবার্য। শুদ্ধ চতুর্মাত্রাত্মক 'সজনী' হইবে। তদ্রূপ 'অপরূপ' পাঠেও ছন্দোভঙ্গ ঘটিয়াছে; 'অপূর্ব' শব্দের অপভ্রংশ ও 'অপূরব' বা 'অপরুপ' শুদ্ধ পাঠ হইবে।

(খ) "গিরিবর গরুঅ পয়োধর পরশিত গীমে গজমোতিম হারা।" 'গীমে' পাঠে ছন্দোভঙ্গ অনিবার্য। মৈথিল উচ্চারণের নিয়মানুসারে 'মে' অক্ষর লঘু পড়িলেও ছন্দ রক্ষা পায় না; সুতরাং ব্রজনন্দনবাবুর হিন্দী সংস্করণের 'গীম' পাঠও সমর্থনযোগ্য নহে। এখানে 'গীমে' স্থানে শুদ্ধ পাঠ হইবে

'গিম'। সার গ্রীয়ারসন্ মহোদয়ের শব্দকোষে শুধু 'গৃম' শব্দই গ্রীবা অর্থে দৃষ্ট হয়। 'গৃম' শব্দেও 'গৃ' লঘু অক্ষর বটে; সুতরাং মৌলিক 'গ্রীবা' শব্দের অনুরোধে অপভ্রংশ 'গিম' শব্দের 'গি' অক্ষর দীর্ঘ করিয়া মৈথিল উচ্চারণের ব্যত্যয় দ্বারা ছন্দোভঙ্গ করা যুক্তিসঙ্গত নহে।

ছন্দোভঙ্গের কথা যাউক, এই পদের—"পয়সি পয়াগে জাগ শত জাগউ, সেই পাত্র বহুভাগী" পংক্তিদ্বয়ের অর্থ করিতে যাইয়া কাব্যবিশারদ মহাশয়ের অনুসরণে নগেন্দ্রবাবু যে একটা বড় ভুল করিয়াছেন, আমরা সে সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিব। কাব্যবিশারদ মহাশয় ঐ পংক্তিদ্বয়ের অর্থ লিখিয়াছেন "পয়সি— জলে। এখানে জলসমীপে অর্থাৎ নদীতীরে। জাগ—যাগ, যজ্ঞ। জাগই—এখানে জাগরণ করিয়া নহে; জাগাইয়া, উদ্বোধিত করিয়া ক্রিয়াটী এই স্থলে ণিজন্তার্থ বোধক। ঞি করিলে মৈথিল ব্যাকরণানুসারে জগাই হওয়া উচিত ছিল।" কিন্তু মৈথিল ক্রিয়াদিতে অনেক স্থলে স্বার্থে ঞি যুক্ত হয় ও অনেক স্থলে ণিজন্তার্থক হইয়াও ঞি বিযুক্ত থাকে। নগেন্দ্রবাবু স্পষ্টতঃ কাব্যবিশারদ মহাশয়ের ব্যাখ্যা স্বীকার করিয়াই লিখিয়াছেন— 'যে প্রয়াগতীর্থে (সেই জলে) শত যজ্ঞ উদ্‌যাপন করে, সেই বহু ভাগ্যবান পুরুষ (এই রমণীকে) পায়।' ইত্যাদি।

এইরূপ অর্থ সম্বন্ধে প্রধান আপত্তি এই যে, বর্ণিত রূপ অন্তর্ভুক্ত বা উহা ণিজন্তার্থক ক্রিয়াপদের প্রয়োগ সংস্কৃত সাহিত্যে ক্বচিৎ দুই একটা দৃষ্ট হইলেও হিন্দী, মৈথিল প্রভৃতি ভাষা সাহিত্যে এরূপ প্রয়োগ দৃষ্ট হয় না। তদ্ব্যতীত 'জাগই' শব্দের জাগায় অর্থ অসঙ্গত। কষ্ট কল্পনার সাহায্যে স্বীকার করিয়া লইলেও, উহা হইতে 'উদ্‌যাপন করে' এই অর্থ আসিতে পারে না। 'জাগায়' শব্দের 'উদ্বোধিত করে' অর্থ প্রসিদ্ধ হইলেও, শত যজ্ঞকে উদ্বোধিত করে এইরূপ বাক্য ও অর্থ রীতিবিরুদ্ধ বটে। নগেন্দ্রবাবু ইহা বুঝিয়াই 'উদ্‌যাপন করে' অর্থ লিখিয়াছেন, কিন্তু 'জাগায়' শব্দের ঐ অর্থ যে আরও অধিক অসিদ্ধ, উহা বিস্মৃত হইয়াছেন। বিদ্যাপতির কোন সম্পাদকই এখানে সঙ্গত অর্থ লাগাইতে পারেন নাই; কিন্তু আমাদের বিবেচনা হয় যে, হিন্দী ও মৈথিল বানান অনুসারে এখানে 'যাগ' ও 'যাগই' স্থলে 'জাগ' ও 'জাগই' লিখিত হওয়ায়ই এই সোজা কিন্তু আপাতদুরূহ পাঠ ও অর্থ বিভ্রাটের সৃষ্টি হইয়াছে। সংস্কৃতে 'যাগং যজতে' এবং ইংরাজীতে To dream a dream

ইত্যাদির ন্যায় প্রয়োগ বিরল নহে। এখানেও খুব সম্ভবতঃ 'শত যাগের যজন করে' অর্থে 'যাগশত যাগই' বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে। 'য' স্থলে 'জ' হিন্দী মৈথিলের লেখার কায়দা মাত্র।

রাধামোহন ঠাকুর 'পদামৃতসমুদ্রে'র সংস্কৃত টিপ্পনীতে 'পয়সি পয়াগে' ইত্যাদি বাক্যের তাৎপর্য লিখিয়াছেন—'পূর্বজন্মনি প্রয়াগতীর্থে গঙ্গা যমুনা সঙ্গমক্ষেত্র কৃতশতযজ্ঞেন মহাভাগেন লভ্যা সা সুন্দরী নতু অন্যৈরিতি সংক্ষেপং নায়কেনোক্তম।' টিপ্পনীর "কৃতশতযজ্ঞেন" বিশেষণ দ্বারা প্রতীত হয় যে, রাধামোহন ঠাকুর 'জাগই' পদের দ্বারা 'উদ্বোধিত' বা 'উদযাপিত' অর্থ না বুঝিয়া যজ্ঞ করা অর্থই বুঝিয়াছেন, সেজন্যই কর্মপদে 'জাগ জাগই' শব্দের শত শব্দ থাকায় তাৎপর্য প্রকাশের জন্য শুধু "কৃত" শব্দের প্রয়োগই যথেষ্ট মনে করিয়াছেন।

সাহিত্য পরিষদের ২০১ সংখ্যক পুথিতে "পয়সি পয়াগে" ইত্যাদি ভণিতার কলির পূর্বে নিম্নলিখিত অতিরিক্ত কলিটি দেখা যায়, যথা—

প্রথম বয়স ধনি মুনি-মন-মোহিনী
গজবর জিনি গতি মন্দা।
সিন্দুর তিলক ভালু তড়িত লতা তনু
উয়ল পুনমিক চন্দা॥

এই পদের প্রথম কলিতে "উয়ল হরিণহীন হিমধামা" বাক্যের দ্বারা নায়িকার নিষ্কলঙ্ক মুখচন্দ্রের বর্ণনা করিয়া, কবি যে আবার সেই মুখের সহিত স্ফুট কলঙ্ক পূর্ণিমার চন্দ্রের উপমা দিয়া উভয় উক্তির অসামঞ্জস্য ঘটাইবেন, ইহা সম্ভবপর মনে হয় না, সুতরাং আমরা এই কলিটীকে এখানে প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই বিবেচনা করি।

(৩৭ সংখ্যক পদ)

নগেন্দ্রবাবুর "কামিনী করএ সনানে" ইত্যাদি ৩৭ সংখ্যক পদটী মৈথিল তালপত্রের পুথি হইতে গৃহীত হইয়াছে। সার গ্রীয়ারসন্ মহোদয় তাঁহার Maithil Chrestomathy গ্রন্থে এই পদের যে আর একটা মৈথিল রূপান্তর দিয়াছেন, উহার এবং 'পদকল্পতরু' প্রভৃতি গ্রন্থে প্রাপ্ত ঐ পদের বঙ্গীয় রূপান্তরের সহিত নগেন্দ্রবাবুর উদ্ধৃত পদের যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়।

নগেন্দ্রবাবু টীকায় লিখিয়াছেন, "সর্বাপেক্ষা প্রাচীন পাঠ এই প্রথম প্রকাশিত হইল ;··· এই সঙ্কলনে তালপত্রের পুথির পাঠ ধৃত হইয়াছে ; কারণ উক্ত পুস্তক সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও প্রামাণ্য।"

বস্তুতঃ নগেন্দ্রবাবুর গৃহীত তালপত্রের পুথির পাঠই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও প্রামাণ্য কি না, তাহা নির্ণয় করিতে হইলে শুধু প্রাপ্ত পুথিগুলির প্রাচীনতার উপর একমাত্র নির্ভর না করিয়া সূক্ষ্ম ভাষাতত্ত্বের বিচার ও বিভিন্ন রূপান্তর-গুলির পাঠের ঔচিত্য ও অনৌচিত্যের বিচার দ্বারাই সে গুলির শুদ্ধতা বা প্রামাণিকতা স্থির করা আবশ্যক। সেইরূপ করিতে হইলে, শুধু এই একটি মাত্র পদের পাঠান্তরের বিচারেই একটা বড় প্রবন্ধ হইতে পারে। বলা বাহুল্য যে, এখানে সেইরূপ আলোচনার সম্পূর্ণ স্থানাভাব। আমরা এখানে শুধু এই মাত্র বলা আবশ্যক মনে করি যে, নগেন্দ্রবাবুর সমাদৃত তালপত্রের পুথির পাঠ সর্বত্রই অধিক প্রাচীন বা প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। ভবিষ্যতে যাহারা বিদ্যাপতির পদাবলীর একটী শুদ্ধ ও প্রামাণিক সংস্করণ সঙ্কলিত করিতে যাইবেন, তাঁহাদিগকে এরূপ স্থলে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভাবে পূর্বোক্ত বিভিন্ন রূপান্তরগুলির সূক্ষ্ম আলোচনা দ্বারাই প্রামাণিক পাঠ স্থির করিতে হইবে। নগেন্দ্রবাবুর ধৃত তালপত্রের পুথিতে এই পদের অন্ততঃ দুইটি কলির যে বিকৃত পাঠ আছে এবং নগেন্দ্রবাবু উহার যে অসদর্থ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, আমরা এখানে উহার দুইটি মাত্র উদাহরণ দেখাইয়া ক্ষান্ত হইব।

(১) নগেন্দ্রবাবুর ধৃত ৩য় কলিটী এইরূপ, যথা —

কুচ জুগ চারু চকেবা।
নিঅ কুল মিলত আনি কোনে দেবা॥ ৬।

নগেন্দ্রবাবু টীকায় লিখিয়াছেন —

৫। চকেবা—চক্রবাক্। ৬। নিঅ—নিজ। মিলত—মিলিত করিয়া। দেবা—দিবে, দিয়াছে। ৫—৬। চারু চক্রবাক কুচ যুগল নিজ কুলে আনিয়া কে মিলাইয়া দিয়াছে।

এইরূপ পাঠ ও অর্থ কোনমতেই সঙ্গত মনে হয় না. বিধাতার সনাতন বিধান অনুসারে চক্রবাক দম্পতি রাত্রিকালে পরস্পর বিযুক্ত থাকিয়া দিবার

নদীর একই কূলে আসিয়া পরস্পর সম্মিলিত হয়, ইহা চিরন্তন কবিপ্রসিদ্ধি বটে। সুতরাং দিবা নায়িকার কুচযুগল রূপ চক্রবাক দম্পতি একত্র সম্মিলিত হওয়ার কারণ সর্বজনপ্রসিদ্ধ বলিয়া মহাকবি বিদ্যাপতির পক্ষে নিজকূলে আনিয়া কে মিলাইয়া দিয়াছে— এভাবে মিলন-কর্তার সম্বন্ধে অজ্ঞতা প্রকাশ করা মোটেই সঙ্গত নহে এবং উহা দ্বারা উক্তির সৌন্দর্যও কিছুমাত্র বর্দ্ধিত হয় না। এতদ্ব্যতীত 'দেবা' শব্দের 'দিবে' অর্থ ছাড়া 'দিয়াছে' অর্থ কোন ব্যাকরণ দ্বারাই সিদ্ধ হয় না; 'দিবে' অর্থ স্বীকার করিলে উক্তিটীর কোন সঙ্গত অর্থই করা যাইতে পারে না। এজন্যই নগেন্দ্রবাবুকে হতাশ হইয়া একই বিশ্বাসে 'দিবে' ও 'দিয়াছে'—এই দুটী পরস্পরবিরুদ্ধ অর্থ লিখিতে হইয়াছে। সার গ্রীয়ারসন্ 'নিজ কুল' ইত্যাদি চরণের স্থলে 'নিজ কর কমল আনি তুঅ দেবা' ধরিয়া পংক্তিদ্বয়ের অনুবাদ করিয়াছেন—"Thy bosom is like two fair Chakwas. Cover them. O cover them with thy lotus hands". এইরূপ পাঠ ও অর্থের সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, সাহেব মহোদয় শ্রীকৃষ্ণের আপ্তদূতীর উক্তি কিংবা ইহাকে কিংবদন্তী অনুসারে সদ্যোস্নাতা কোন সাধারণ নায়িকা-বিষয়ক পদ বলিয়া স্বীকার করিলে, কবির উক্তিপদ না বুঝিয়া ইহাকে নায়িকার প্রতি নায়কের উক্তি মনে করায়, সম্পূর্ণ পদটার অর্থ বুঝিতে গোলযোগ করিয়াছেন। এজন্য তাঁহার এই পাঠ ও অর্থ বিদ্যাপতির কোন সম্পাদকই গ্রহণ করিতে পারেন নাই। সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক ও ঐতিহাসিক স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় মিথিলায় এই পদের আর একটা রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশিত করেন। উহাতে এই কলির নিম্নলিখিত পাঠ আছে —

কুচযুগ চারু চকেবা।
জনি বিহি আনি মিলাওল দেবা॥

এখানে 'জনি বিহি' ইত্যাদি পংক্তির অর্থ— 'যেন দেবতা বিধি আনিয়া মিলাইয়াছেন।'

এই কলির স্থলে বঙ্গীয় 'পদকল্পতরু' ইত্যাদি পুথির পাঠ—

কুচযুগ চারু চকেবা।
নিজ কুল আনি মিলায়ল দেবা॥

অর্থাৎ (নায়িকার) কুচযুগল সুন্দর চক্রবাক (দ্বয়); দেবতা অর্থাৎ বিধাতা (ঐ দুইটীকে) নিজের কূলে অর্থাৎ উভয়ের মনোনীত একই নদী তটে আনিয়া সম্মিলিত করিয়াছেন। (নায়িকার গলার শুভ্র মুক্তাহারই এখানে নদীরূপে ব্যঞ্জিত হইতেছে)।

একটু প্রণিধান করিলেই বুঝা যাইবে যে, এখানে বঙ্গীয় পুথির পাঠই স্বাভাবিক ও সুন্দর; সুতরাং বর্তমানে আমরা ঐ পাঠ দেড় শত কি দুই শত বৎসরের প্রাচীন কোন পুথিতে না পাইলেও ঐ পাঠই যে খুব প্রাচীন ও প্রামাণিক, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। রাজকৃষ্ণবাবুর প্রাপ্ত পাঠ তালপত্রের পুথির কিংবা গ্রীয়ারসন মহোদয়ের পাঠ হইতে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট হইলেও, ঐ 'নিজ কূল' শব্দদ্বয় পরিত্যক্ত হওয়ায়, অলঙ্কারের সৌন্দর্য অনেক পরিমাণে নষ্ট হইয়াছে। যাহা হউক রাজকৃষ্ণবাবুর আবিষ্কৃত মৈথিল পাঠের দ্বারা ইহা নিঃসন্দেহে বুঝা যাইতেছে যে, মহাকবি বিদ্যাপতি 'মিলাইয়া দিয়াছে' অর্থে 'কোনে দেবা' বাক্যটীর প্রয়োগ করেন নাই। তিনি 'দেবতা' অর্থেই 'দেবা' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। সুতরাং মিথিলায় প্রাপ্ত পাঠের দ্বারাই তালপত্রের পুথির উক্ত পাঠ ও নগেন্দ্রবাবুর কৃত ব্যাখ্যা খণ্ডিত হইয়াছে। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, 'কোনে দেবা' শব্দদ্বয়ের অর্থ 'কোন দেবতা' বলায়, চক্রবাক যুগলের এই বাঞ্ছিত সম্মেলন অরসিক নির্দয় বৃদ্ধ ব্রহ্মার কার্য নহে, ইহা কোন সুরসিক পরম কারুণিক দেবতার কার্য ইহাই ব্যঞ্জিত হইতেছে। কিন্তু এরূপ অর্থ করিতে হইলেও 'নিজ কুল মিলত আনি' অংশের পাঠ ঠিক রাখা যাইবে না। এরূপ অর্থ স্বীকার করিলে 'মিলত' স্থলে 'মিলায়ত' বা 'মিলায়ল' পাঠ কল্পনা করা একান্ত আবশ্যক; উহাতে ছন্দোপতন অনিবার্য।

(২) নগেন্দ্রবাবুর ধৃত তালপত্র পুথির ভণিতা এইরূপ, যথা—

ভনই বিদ্যাপতি গাবে।
গুণমতি ধনি পুনমত জনি পাবে॥ ১২।

নগেন্দ্রবাবু টীকায় লিখিয়াছেন,—

গাবে — গায়, গাহিয়া। ১২। গুণমতি — গুণবতী। পুনমত — পুণ্যবান। ১১ — ১২। বিদ্যাপতি গাহিয়া কহিতেছে, গুণবতী ধনী পুণ্যবান যেন প্রাপ্ত হয়।

এই ভণিতার স্থলে গ্রীয়ারসন মহোদয়ের ধৃত পাঠ—

ভনহি বিদ্যাপতি ভানে।
সুপুরুখ কবহু ন হোয়ত নদানে॥

অনুবাদ— "Bidyapati saith a good husband will never be a fool."

নগেন্দ্রবাবু 'ভনই' ইত্যাদি পাঠের সমার্থক 'ভনই' ও 'গাবে' শব্দ দ্বয়ের পুনরুক্তি দোষ এড়াইবার জন্য যে 'গাবে' শব্দের গাহিয়া অর্থ লিখিয়াছেন, উহা ব্যাকরণ অনুসারে সিদ্ধ হয় না। গ্রীয়ারসন সাহেবের ধৃত 'ভনহি' ও 'ভানে' শব্দে সেই দোষ আরও সুস্পষ্ট; সুতরাং এই দুইটা পাঠের কোনটাই প্রামাণিক বলা যাইতে পারে না। এতদপেক্ষা রাজকৃষ্ণবাবুর প্রাপ্ত

বিদ্যাপতি কবি গাবে।
বড় তপ গুণমতি পুনমত পাবে॥

পাঠ অধিকতর সঙ্গত সুতরাং প্রামাণিক মনে হয়। নায়িকার অপূর্ব রূপ-বর্ণনার পরে আপ্তদূতী কিংবা কবির উক্তিতে বড় তপস্যায় পুণ্যবান লোকে (এরূপ) গুণবতীকে প্রাপ্ত হয়—এইরূপ মন্তব্যই সময়োচিত ও সঙ্গত বটে। নগেন্দ্রবাবুর ব্যাখ্যাত 'গুণবতী ধনী পুণ্যবান যেন প্রাপ্ত হয়' এইরূপ মন্তব্য এখানে মোটেই স্বাভাবিক ও সঙ্গত নহে। নগেন্দ্রবাবুর ধৃত পাঠ ঠিক বলিয়া ধরিলেও এখানে 'গুণবতী ধনি' কর্মপদ ও 'পুনমত' (জন) কর্তৃপদ স্বীকার করিয়া অর্থ করিতে হইবে—"পুণ্যবান যেন গুণবতী ধনীকে প্রাপ্ত হয়"। বস্তুতঃ এখানে 'জনি' (যেন) শব্দ মোটেই সুপ্রযুক্ত নহে; 'জনি' স্থলে 'জন' পাঠ ধরিলেই সুন্দর অর্থ হয়। বঙ্গীয় 'পদকল্পতরু' পুথিতে পাঠ আছে—

কবি বিদ্যাপতি গাবয়ে।
গুণবতি নারি রসিক জন পাওয়ে॥

আমাদের অনুমান হয় যে, বিদ্যাপতির এই পদে সম্ভবতঃ 'গুণবতি ধনি পুনমত জন পাবে' মৌলিক পাঠ ছিল। লিপিকর অথবা পাঠসাধকদিগের প্রসাদে 'জন' 'জনি' পাঠে পরিণত হওয়ায়ই পাঠের অশুদ্ধি ঘটিয়াছে। যাহা হউক; নগেন্দ্রবাবু তালপত্রের পুথিতে যে 'ভনই বিদ্যাপতি গাবে' ইত্যাদি পাঠ পাইয়া উহাকেই প্রামাণিক ও শুদ্ধ বিবেচনায় গ্রহণ করিয়া উহার আবার বর্ণিত রূপ অসদর্থ করিয়াছেন, তাহা কোনমতেই সমীচীন বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না।

বিদ্যাপতির গ্রন্থপঞ্জী *

বাংলা, সংস্কৃত ও ইংরাজী

১। পুরুষ পরীক্ষা। নীতিমূলক কাহিনী। হরপ্রসাদ রায় কর্তৃক সংস্কৃত থেকে অনূদিত। পৃ ১৭৩। শ্রীরামপুর, ১৮১৫।

২। A View of the History, Literature, and Mythology of the Hindoos. W. Ward. 2 vols. Second edition; Serampore, 1818. [On page 579 'of translations from Sungskrita, and works written in the dialects of India', 'Bengali' is entered. 'The Krishnu-Keertun, by Govinda-Dasu and Vidya-putee'.]

৩। পুরুষ পরীক্ষা। পৃষ্ঠা ২৪২। লণ্ডন, ১৮২৬। জি হফটনের সংস্করণ।

৪। পুরুষ পরীক্ষা। পৃষ্ঠা ৩+১৮৬। কলিকাতা, ১৮৫০ ?

৫। "বঙ্গভাষার উৎপত্তি"। রাজেন্দ্রলাল মিত্র। বিবিধার্থ সংগ্রহ, পঞ্চম পর্ব। ১৮৭০ শকাব্দ (১৮৫৮ খৃ), পৃ ১২—১৩ :

"যে সকল বাঙ্গালি পুস্তক আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, তন্মধ্যে জীব গোস্বামীর 'করচা'ই সর্বপ্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। তাহা এক্ষণে ৩২৫ বৎসর পুরাতন। তাহার রচনাপ্রণালী চৈতন্যচরিতামৃতের সদৃশ। কথিত আছে ত্রিপুরা রাজাবলী নামক পুস্তক ইহা অপেক্ষা অনেক প্রাক্তন; কিন্তু যে পুস্তক এসিয়াটিক নাম্নী সভাতে আনীত হইয়াছিল, তাহার রচনাদৃষ্টে তাহাকে বিশেষ প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় না; অতএব জীবগোস্বামীর করচাকেই সর্বপ্রাকালীন বাঙ্গালি পুস্তক বলিতে হইবেক। পরন্তু তাহাকে বাঙ্গালি ভাষার সর্বপ্রাচীন রচনা বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে না, কারণ চৈতন্য দেবের আবির্ভাবের শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে কবি বিদ্যাপতি অনেক বাঙ্গালি পদ রচনা করিয়াছিলেন, তাহার কয়েকটি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে; ঐ পদই বঙ্গভাষার সর্বপ্রাক্তন আদর্শ বলিতে হইবেক।"

পাদটীকা—

"সদাশয় পাঠকদিগের সুগোচরার্থে বিদ্যাপতিকৃত একটি পদ "প্রাচীন পদাবলী" নামক গ্রন্থ হইতে এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল। বিদ্যাপতি রাজা শিবসিংহ লক্ষ্মীনারায়ণের কালে বর্ত্তমান ছিলেন।

---

* বিদ্যাপতির গ্রন্থাবলীর মুল ও অনুবাদের বিভিন্ন সংস্করণ এবং তাঁর সম্পর্কে বিভিন্ন আলোচনার এই তালিকাটি শ্রীযুক্ত মহাদেবপ্রসাদ সাহা 'সাহিত্য পত্রিকা'র জন্য সংকলন করেছেন।—সম্পাদক, সাহিত্য পত্রিকা।

সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সেই পিরিতে অনুরাগ বাখানিতে তিলে তিলে নূতন হোয়।
জনম অবধি হম রূপ নিহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনলু শ্রুতিপথে পরস না গেল।
কত মধু যামিনি রভসে গোয়াইনু না বুঝিনু কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়া জুড়ন না গেল।
যত রসিক জন রসে অনুমগন অনুভব কাহু ন পেখ।
বিদ্যাপতি কহ প্রাণ জুড়াইতে লাখে না মিলল এক।"

৬। পুরুষ পরীক্ষা। পৃ ৩+১৮৫। কলিকাতা, ১৮৬৫?

৭। পুরুষ পরীক্ষা। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার কর্তৃক বাঙলায় অনূদিত। দ্বিতীয় সংস্করণ; কলিকাতা, ১৮৬৬।

৮। কবি চরিত। হরিমোহন মুখোপাধ্যায়। কলিকাতা, ১৮৬৯।

৯। বঙ্গভাষার ইতিকথা। মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। পৃ ১০০। কলিকাতা, বিক্রম সংবৎ ১৯২৮ [১৮৭১]।

১০। বাঙ্গালা সাহিত্য সংগ্রহ। মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। কলিকাতা, ১৮৭২।

১১। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব। রামগতি ন্যায়রত্ন। পৃ ৩৭৩। কলিকাতা, বিক্রম সংবৎ, ১৯৩০ [১৮৭৩]।

১২। মহাজন পদাবলী। জগবন্ধু ভদ্র। কলিকাতা, ১৮৭৩।
৪৩—৪৮ নং পর্যন্ত বিদ্যাপতির বিক্ষিপ্ত পদ-নিচয়।

১৩। "The Early Vaishnava Poets of Bengal. I: Bidyapati." John Beames. Indian Antiquary, vol. II (1873), pp. 37ff.

১৪। প্রাচীন কাব্য-সংগ্রহ। বিভিন্ন মাসে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। অসম্পূর্ণ। ১ম-৩য় খণ্ড। চুঁচুড়া, ১৮৭৪-৭৬।

১৫। "বিদ্যাপতি ও জয়দেব"। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্গদর্শন, পৌষ, ১২৮০। [বঙ্কিম গ্রন্থাবলী, শতবার্ষিকী সংস্করণ, বিবিধ প্রবন্ধ, ৫৩-৫৭ পৃ দ্রষ্টব্য]

১৬। মহাজন পদাবলী সংগ্রহ। ১ম খণ্ড, ১ম ভাগ (বিদ্যাপতি)। পৃ ১৯১+(১৩৫—১৯৪)। চুঁচুড়া, ১২৮০ বাং।

১৭। "বিদ্যাপতি"। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। বঙ্গদর্শন, ১২৮২ বাং [১৮৭৫]।

১৮। "On the Age and Country of Bidyapati." John Beames. Indian Antiquary, vol. IV (1875) p. 299.
রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের লেখা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত প্রবন্ধটির সারসংক্ষেপ এর অন্তর্ভুক্ত।

১৯। বিদ্যাপতির পদাবলী। ভূমিকা ও টীকা সম্বলিত মূলপাঠ। সারদাচরণ মিত্র সম্পাদিত। দ্বিতীয় সংস্করণ; পৃ ৩৬+১৬৩। কলিকাতা, ১২৮৫ বাং [১৮৭৮]।

২০। বিদ্যাপতি পদাবলী। অক্ষয়চন্দ্র সরকার কর্তৃক টীকা ইত্যাদি সহ সম্পাদিত। দ্বিতীয় সংস্করণ; পৃ ২০০। চুঁচুড়া, ১৮৭৮।

২১। "An Introduction to the Maithili of North Bihar, Chrestomathy and Vocabulary." G. A. Grierson. JASB, vol. XLIX, XLI, pp. 34. Calcutta, 1880-82.
ব্যাকরণ এবং ইংরেজি অনুবাদসহ ৮২টি পদ।

২২। প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ। দুই খণ্ড। প্রথম খণ্ডে চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস ও বিদ্যাপতির কবিতা। অক্ষয়কুমার সরকার সম্পাদিত। কলিকাতা, ১২৯১-৯২ বাং [১৮৮৪-৮৫]।

২৩। "Vidyapati and his Contemporaries." G. A. Grierson. Indian Antiquary, vol. XIV (1885) pp. 182 ff.
অন্যান্য প্রসঙ্গ ছাড়াও সারদাচরণ মিত্র সম্পাদিত বিদ্যাপতির পদাবলী গ্রন্থের ভূমিকার ইংরেজি অনুবাদ এতে আছে।

২৪। পুরুষ পরীক্ষা। মৈথিলী অনুবাদ ও টীকাসহ মূলপাঠ। চন্দ্র ঝা। পৃ ২৬৫। দ্বারভাঙ্গা, ১৮১০ শক, ১২৯৬ বাং [১৮৮৮]।

২৫। The Modern Vernacular Literature of Hindustan. G. A. Grierson. Calcutta, 1889.
৯ এবং পরবর্তী পৃষ্ঠায় বিদ্যাপতির আলোচনা।

২৬। দুর্গাভক্তিরঙ্গিনী। বিভিন্ন সংস্কৃত গদ্য পদ্য থেকে বিদ্যাপতি কর্তৃক সংগৃহীত। দ্বারভাঙ্গা, ১৮২২ শক, ১৩০৮ বাং [১৮৯০]।
এই গ্রন্থের ৬ নং শ্লোকে আছে —
বিশেষাৎ হিতকাম্যয়া নৃপবরোহনুজ্ঞায় বিদ্যাপতিং শ্রীদুর্গোস্তব ...

২৭। The Poets of Bengal. Kaliprasanna Kavyavisharada. pp 32+215. Calcutta, 1894, 1900, 3rd edition. 1910.
বিভিন্ন প্রাচীন সূত্রে প্রাপ্ত পদাবলীর বিস্তৃত সংগ্রহ; টীকা ও ভূমিকা সম্বলিত।

২৮। বিদ্যাপতি ... পদাবলী। পঞ্চানন তর্করত্ন। পৃ ১৮৭+২৯। কলিকাতা, ১৩০১ বাং [১৮৯৫]।
কবির সংক্ষিপ্ত জীবনী ও টীকাভাষ্য সহ।

২৯। "A reduced Facsimile of the Grant of the Village of Bisapi by Sivasinha to Vidyapti." G. A. Grierson. Proceedings of the Asiatic Society of Bengal. August, 1895.

৩০। কবি বিদ্যাপতি [অন্যান্য বৈষ্ণব কবি সহ।] টীকাসহ আলোচনা। ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য। পৃ ১১+৫+১৪৬। কলিকাতা, ১৮৯৫।

৩১। শব্দের তালিকা। [প্রসঙ্গ-নির্দেশ ও সমার্থক আধুনিক বাঙলাসহ বিদ্যাপতির কবিতায় ব্যবহৃত কঠিন শব্দসমূহের বর্ণানুক্রমিক তালিকা।] কলিকাতা, ১৮৯৬। (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ২য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা এবং ৩য় বর্ষ ১ম ও ২য় সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত)।

৩২। শৈবসর্বস্ব। বিদ্যাপতি বিরচিত। ভাগ্যবান বিদ্যালঙ্কার কর্তৃক অনুবাদসহ মূলপাঠ। পৃ ২+৬+১৬২। কলিকাতা, ১৩০৪ বাং [১৮৯৭]।

৩৩। বিদ্যাপতি-পদাবলী। কালীপ্রসন্ন বিশারদ। দ্বিতীয় সংস্করণ; পৃ ৩+২৪৭। কলিকাতা, ১৮৯৮।

৩৫। "On the Genuineness of the Grant of Siva Sinha to Vidyapati Thakura." G. A. Grierson. Journal of the Asiatic Society of Bengal, LXVII, Pt. I (1899) p. 96.

৩৫। "On Some Mediaeval Kings of Mithila." G. A. Grierson. Indian Antiquary, Vol. XXVIII (1899) p. 57

৩৬। বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী। প্রথম খণ্ড। উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। কলিকাতা, ১৩০৫ বাং।

৩৭। নব আবিষ্কৃত বিদ্যাপতির পদাবলী। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত। পৃ ৮। কলিকাতা, ১৯০০।

এই কবিতাগুলির পাণ্ডুলিপি নেপালের কাঠমুণ্ডু থেকে আবিষ্কৃত হয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি সম্পাদিত প্রাচীন বাঙলা কবিতার সংকলন প্রাচীন বাঙলা গ্রন্থাবলীর [১৭ ভাগ। কলিকাতা, ১৯০০-১৯০৬] প্রথম অংশ।

৩৮। মহাজনী-পদাবলী [চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি]। অক্ষয়কুমার দে কর্তৃক জীবনী ও টীকাসহ সম্পাদিত। পৃ ৬+১৫২। কলিকাতা, ১৯০৩।

৪র্থ সংস্করণ, পৃ ৬+১৬০; ১৯০৫।

৫ম সংস্করণ, পৃ ৬+১৬০; ১৯০৭।

৭ম সংস্করণ, পৃ ৬+১৬০; কলিকাতা, ১৯১১।

৩৯। পুরুষ পরীক্ষা। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। কলিকাতা, ১৯০৪।

৪০। "Vidyapati Thakur" Nagendranath Gupta. JASB, vol. LXXIII, Part 1. Extra. pp 20 ff. 1904.

৪১। বৈষ্ণব-পদাবলী। দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত। কলিকাতা, ১৯০৫।

৪২। "Vidyapati Thakur." G. A. Grierson. JASB, New Series, Part I (1905), 228-229.

৪৩। বিদ্যাপতি ঠাকুরের পদাবলী। [ভূমিকা, কবিজীবনী ও টীকাসহ] নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত। সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাবলীর ২৪ নং গ্রন্থ। পৃ ৩+৪২+৫৫২। কলিকাতা, ১৯০৯।

৪৪। বিদ্যাপতি। ব্যাপক সংগ্রহ। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ। ৩য় সংস্করণ; পৃ ৪৮+২৬৯। কলিকাতা, ১৯১০।

৪৫। পুরুষ পরীক্ষা। স্কুলপাঠ্য সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। গঙ্গানাথ ঝা। এলাহাবাদ, ১৯১১।

৪৬। Bangiya Padavali. (Songs of the love of Radha and Krisna.) আনন্দ কুমারস্বামী এবং অরুণ সেন কর্তৃক ইংরেজীতে অনূদিত। ভারতীয় চিত্রশিল্পের নমুনা, টীকা ও ভূমিকা সম্বলিত। পৃ ১২+১৯২; ১১ প্লেট ছবি। লণ্ডন, ১৯১৫।

১৩৩টি পদের অনুবাদ; ৫টি পদের মূল পাঠ বইয়ের শেষের দিকে দেওয়া আছে।

৪৭। History of Tirhut, from the earliest times to the end of the Nineteenth Century. Shyam Narayan Singh. Calcutta, 1922.

১৮১ এবং পরবর্তী পৃষ্ঠায় বিদ্যাপতির আলোচনা।

৪৮। Vaishnava Lyrics. Done into English verse. Surendranath Kumar, Nandalal Datta, and John Alexander Chapman. Preface by J. C. Chapman. With glossary. pp x+52. Calcutta, 1923.

সতীশচন্দ্র রায়-সম্পাদিত 'পদকল্পতরু' এবং নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'বিদ্যাপতি ঠাকুরের পদাবলী' থেকে বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, চণ্ডীদাস, নরোত্তমদাস, জ্ঞানদাস, পরমানন্দ দাস, অনন্ত দাস, রাধারমণ, শিবরাম দাস প্রভৃতির ৪৮টি পদের ইংরেজী অনুবাদ। বিদ্যাপতির ২১টি পদের অনুবাদ রয়েছে। 'রাধা' শীর্ষক কবিতায় Chapman লিখেছেন—

O thou of the milky breasts, out of the mist
Of Indian nights thou surely leaned and Kissed
My mouth, or was this old, sweet, lyric book.
The *Padakaplataru* whose reading shook,
My body; so that quickly a passion grew
No words could still but thine, but one or two
Of thy words, Radha, could, if thou shouldest speak them,
Offering Kisses, and then I would let them keep thee.

৪৯। Kirtilata. Text with Bengali and English translations. Edited with an introduction. Haraprasad Shastri. pp 48+40+48+43. Calcutta, 1924.

৫০। বিদ্যাপতি। ভূমিকা ও টীকাসহ। অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ কর্তৃক সম্পাদিত। প্রথম খণ্ড। কলিকাতা, ১৯৩৪।

৫১। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও অন্যান্য বৈষ্ণব মহাজন গীতিকা। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। ১৯৩৫।

৫২। The Test of Man, being the Purusa Pariksha of Vidyapati Thakura. English translation with an introduction. G. A. Grierson. pp. XX+194. London, 1935.

৫৩। A History of Brajabuli Literature. Sukumer Sen. Calcutta, 1935.

৫৪। A History of Maithili Literature. Jayakanta Mishra. 2 vols. Allahabad, 1949.

[First comprehensive history of Maithili literature. Chap. V, pp 130—192 devoted to Vidyapati and Chap. VI, pp 139—224 to his contemporaries.]

৫৫। বিদ্যাপতি পদাবলী। অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ও খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত। খগেন্দ্রনাথ মিত্রের ভূমিকা; প্রথম সংস্করণে নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের জীবনীমূলক আলোচনা, বিদ্যাভূষণের নিবেদন, বাঙলায় অনুবাদ, টীকা, নির্ঘণ্ট ইত্যাদি। দ্বিতীয় সংস্করণ; পৃ ৭৯+৩৬০+২০৭+৬১+৫। কলিকাতা, ১৩৪৮ বাং [১৯৪২]।

৫৬। বিদ্যাপতির পদাবলী। ভূমিকা ও টীকাসহ। খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত। কলিকাতা, ১৩৫৯ বাং [১৯৫৩]।

৫৭। Vidyapati Get-Sangraha or The Songs of Vidyapati. সুভদ্র ঝা সম্পাদিত। পৃ ১৯৩+২৬৪+১৩। বেনারস, ১৯৫৪।
ইংরেজি তর্জমাসহ ২৬২টি পদ এবং বিদ্যাপতির ১১টি গান।

৫৮। বিদ্যাপতি শতক। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সম্পাদিত। টীকা টিপ্পনিসহ আলোচনা ও ভূমিকা। পৃ ৬২+১৪। ঢাকা, ১৯৫৪।

৫৯। Songs of Vidyapati. Aurobindo Ghosh. pp 87, 3 plates. Pondichery, 1956. [Translation of 41 Padas. Made from a very old Bengali version (sic.) which is given here in Nagari script.]

৬০। হরপ্রসাদ রচনাবলী। দ্বিতীয় খণ্ড। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত কলিকাতা, ১৯৬১।

বিদ্যাপতি সম্পর্কে নিবন্ধ; কীর্তিলতার মূলপাঠ ও বাঙলা তর্জমাসহ সংশোধিত সংস্করণ। পৃ ২০৫—২৯২।

৬১। প্রবাসীতে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুবাদসহ বিদ্যাপতির কতিপয় পদ।

৬২। বিদ্যাপতি গোষ্ঠি। সুকুমার সেন। পৃ ৯৬। কলিকাতা, [মৈথিল ভাষায় রচিত ৩০টি পদ, তার মধ্যে ৫—১৭ নং পদগুলি বিদ্যাপতির। বিদ্যাপতি-কৃত দুইটি অবহট্‌ঠ পদও বইয়ের শেষে সংগৃহীত।]

৬৩। বিদ্যাপতি। সংক্ষিপ্ত জীবনীসহ। পৃ ১৮৭+২৮। তারিখ নেই।

৬৪। বিদ্যাপতি। যতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়। পৃ ৫২। তারিখ নেই।

৬৫। Catalogue of Sanskrit Mss. in the India Office Library, Part IV. No. 2864. Edited by Eggling.

হিন্দী

১। পুরুষ পরীক্ষা। হিন্দুদের নীতিমূলক উপাখ্যান। মূল সংস্কৃত থেকে হিন্দুস্তানের উত্তর প্রদেশে কথিত ভাষায় অনূদিত। অনুবাদক: তারিণীচরণ মিত্র, প্রধান মুনশী, হিন্দুস্থানী বিভাগ, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ। কলিকাতা, ১৮১৫।

২। "মহামহোপাধ্যায় কবিবর বিদ্যাপতি ঠাকুর।" কমলানন্দ সিংহ। সরস্বতী (এলাহাবাদ), তৃতীয় খণ্ড (১৯০২), পৃ ৩২৯—৩৩৯। জনৈক মৈথিল পণ্ডিত রচিত, হিন্দী ভাষায় বিদ্যাপতি সম্পর্কিত সুলিখিত আলোচনা। বংশলতিকা এবং কবির মৈথিলী, অবহট্‌ঠ ও সংস্কৃত রচনাবলীর মূল্যায়ণ।

৩। মৈথিল-কোকিল বিদ্যাপতি। ব্রজনন্দন সহায় সম্পাদিত। টীকা, কবিজীবনী ও ভূমিকা সহ। ১ম, ৪র্থ, ৫ম অধ্যায়, পৃ ৪৬+২০২। পাটনা, ১৯১০।

৪। বিদ্যাপতি ঠাকুর কি পদাবলী। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত। পৃ ৪৭৫। এলাহাবাদ, ১৯১০।

৫। হিন্দী পুরুষ পরীক্ষা। [৪২টি গল্প।] মহেশ্বর প্রসাদ অনূদিত। সংশোধিত সংস্করণ; পৃ ১৩৮। এলাহাবাদ, ১৯১২।

৬। সরকারী বিদ্যালয়ের প্রবীণ সংস্কৃত শিক্ষক কর্তৃক অনূদিত হিন্দী পুরুষ পরীক্ষা। পৃ ১২৬। এলাহাবাদ, ১৯১৫।

৭। বিদ্যাপতি কি পদাবলী—সটীপ্পন, সচিত্র। ভূমিকা ও টীকা রচনা এবং সম্পাদনা: রামকৃষ্ণ শর্মা বেণীপুরী; সাধারণ সম্পাদক: রামলোচন শরণ বিহারী। পৃ ৪৫+৩৩৪; ৯টি চিত্র। [সুবোধ কাব্যমালা—২নং] লাহেরীয়া সরাই, ১৯২৬।

৮। ঐ, দ্বিতীয় সংস্করণ। কুমার গঙ্গানন্দ সিংহ কর্তৃক পরিমার্জিত। লাহেরীয়া সরাই, ১৯৮৮ বিক্রম সংবৎ [১৯৩১]।

১। কীর্তিলতা। আলোচনা, টীকা ও হিন্দী গদ্যানুবাদসহ বাবুরাম সাকসেনা কর্তৃক সম্পাদিত। পৃ ১৯৫+২৩। এলাহাবাদ, ১৯২৯।

১৩। হিন্দী গীতিকাব্য [মীরা, সুরদাস, কবীর ও বিদ্যাপতি]। ভূমিকাসহ রামকুমার বর্মা সম্পাদিত। পৃ ১৪০। এলাহাবাদ, ১৯৩২।

১১। মহাকবি বিদ্যাপতি। আলোচনা। শিবনন্দন ঠাকুর। পৃ ৮+২৪৯। পাটনা, ১৯৪১।

১২। বিশুদ্ধ বিদ্যাপতি পদ্যাবলী। শিবনন্দন ঠাকুর সম্পাদিত। দ্বারভাঙ্গা, ১৯৪১।

১৩। মৈথিলী-কোকিল বিদ্যাপতি: সংক্ষিপ্ত পদাবলী। শম্ভুপ্রসাদ বহুগুন। পৃঃ ৭১+৭৫। লক্ষ্ণৌ, ১৯৪৭।

১৪। হিন্দী কবি চর্চা। [চাঁদ বর্দৈ বিদ্যাপতি, কবীর, জায়সী, মীরা, সুরদাস এবং রসখানের কবিকর্মের ওপর আলোচনা।] চন্দ্রাবলী পাণ্ডে। পৃ ২৮৫। বেনারস, ১৯৪৮।

১৫। বিদ্যাপতি। আলোচনা। শিবপ্রসাদ সিংহ। বেনারস, ১৯৫০।

১৬। বিদ্যাপতি। আলোচনাসহ পদনিচয়। লালদেবেন্দ্র সিংহ ও সূর্যবলী সিংহ কর্তৃক সম্পাদিত। ভূমিকা: ভি, পি, মিশ্র। পৃ ৫+১৭৬। বেনারস,

১৭। ১৯৫০। বিদ্যাপতি পদামৃত। ওঙ্কারনাথ মিশ্র। পৃ ৮৪। এলাহাবাদ, ১৯৫১।

১৮। বিদ্যাপতি কি পদাবলী। বসন্তকুমার মাথুর কর্তৃক ভাষ্য লিখিত। পৃ ৪৬৭। দিল্লী, ১৯৫২।

১৯। কীর্তিলতা ঔর অবহট্‌ঠ ভাব। মূলপাঠ হিন্দী তর্জমা ও টীকা সহ শিবপ্রসাদ সিংহ কর্তৃক সম্পাদিত। বেনারস; ১৯৫৫।

২০। বিদ্যাপতি। কবি সমালোচনা। শিবপ্রসাদ সিংহ। বেনারস, ১৯৫৭।

২১। বিদ্যাপতি ঠাকুর। উমেশ মিশ্র।

২২। বিদ্যাপতি বা অমরকাব্য। গুণানন্দ জয়ল সম্পাদিত। কানপুর, তারিখবিহীন। পৃ ১০৮+১০২।

২৩। বিদ্যাপতি ঔর উনকি কবিতা। সতীশচন্দ্র রায়। ভারতপুর হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধ। হিন্দী সাহিত্য সম্মেলন কর্তৃক প্রকাশিত। এলাহাবাদ, তারিখবিহীন।

২৪। বিদ্যাপতি-পদ্যসংগ্রহ। সতীশচন্দ্র রায়। পৃ ৬২। এলাহাবাদ, তারিখবিহীন। পদকল্পতরু-সম্পাদক লিখিত অন্যতম শ্রেষ্ঠ হিন্দী প্রবন্ধ।

গুজরাটি

পুরুষ পরীক্ষা। বিদ্যাপতি-রচিত সংস্কৃত নীতিমূলক কাহিনী সংগ্রহ। কালিদাস গোবিন্দজী শাস্ত্রী কর্তৃক গুজরাটি ভাষায় অনূদিত। পৃ ৪+১০৮+১২৮। বোম্বাই, ১৮৮২।